ফোটা পদ্মের গভীরে

অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়

প্র ফু ল্ল গ্র ন্থা গা র
৫।১, রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট
কলিকাতা-৯

প্রথম প্রকাশ : বৈশাখ, ১৩৬২

প্রকাশক : প্রফুল্ল গ্রন্থাগারের পক্ষে শ্রীরথীন্দ্র নায়ক
১।১ রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট, কলি-৯

প্রচ্ছদপটশিল্পী : গৌতম রায়

মুদ্রাকর : নিউ রূপলেখা প্রেস ৬০, পটুয়াটোলা লেন,
কলি-৯ হইতে, শ্রীঅজিত কুমার সাউ কর্তৃক
মুদ্রিত

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়

বন্ধুবরেষু

এই লেখকের অন্যান্য বই :

নীলকণ্ঠ পাখির খোঁজে ১ম, ২য় খণ্ড

নগ্ন ঈশ্বর

টুকুনের অসুখ

সাদা জ্যোৎস্না

বিদেশিনী

সমুদ্র মানুষ

প্রেমে অপ্রেমে

তখন হেমন্তকাল

একালের বাংলা গল্প

একজন দৈত্য একটি লাল গোলাপ

বাস থেকে নেমেই সে কেমন চঞ্চল হয়ে উঠল।

বাসটা ধুলো উড়িয়ে চলে যাচ্ছে। ক'দিন রোদ ওঠায় রাস্তার কাদা শুকিয়ে গেছে। পাকা সড়কের দুপাশে সব সবুজ ঘাস মরে গেছে। বাস চলে গেলেই ধুলো। অন্য সময় হলে অজু নাকে রুমাল চাপা দিত। কিন্তু এখন ভিতরে এক আশ্চর্য কৌতূহল অথবা বলা যায় মায়া তাকে সব সময় কেমন মুগ্ধ করে রেখেছে। সে হাতে [illegible] এটাচিটা নিয়ে চুপচাপ হাঁটছে।

[illegible] এ-ভাবে তার নিজের দেশে ফিরে আসতে পারবে [illegible] ভাবেনি। ওর ভারি ভাল লাগছে হাঁটতে। সে [illegible] থেকে বাসে এখানে চলে এসেছে। ওর পকেটে চিঠিটা ঠিক [illegible] করা। চিঠিটা মঞ্জুর চিঠি। লিখেছে, এখনতো অও [illegible] তোমার কোন [illegible] হবে না। সোজা প্লেনে ঢাকায় [illegible] অথবা ট্রেনে নারাণগঞ্জ। সেখান থেকে হয়তো ভাবে [illegible] গতি কি! না, সে-সব একেবারে বদলে গেছে। আগে [illegible] আট-ন ঘণ্টা লাগত। এখন বাসে উঠলে [illegible]। দেখতে দেশটা আর তোমার সঙ্গে আগের মত [illegible] যেন লেখার কথা ছিল—তোমাদের মঞ্জু [illegible] আগের মতো [illegible]। এত বছর পরে কেউ আগের মতো থাকতে পারে না। অবশ্য সে এ-সব লেখেনি। দেশটা আগের মতো নেই বলতে সে বলতে চেয়েছে বুঝি—সব পাল্টে যায়। শরীর মন এবং যে সব ইচ্ছারা শরীরে খেলা করে বেড়ায় তারা পর্যন্ত।

সূর্য এখন আলিপুরার বটগাছটার মাথায়। আর চারপাশে ধানখেত। সড়কের দুধারে জল। দূরে দূরে সব গ্রাম। [illegible]

[illegible] চিনতে পারে না।

গ্রামে কোঠা [illegible] আবার

যেতে এ-সবই দেখছিল। জলের নিচে মাছ দেখলেই সে মনে করতে পারে—এ-সময় পুঁটি মাছেরা ঝাঁকে ঝাঁকে জলের নিচে ঘুরে বেড়ায়। রোদ উঠলে ওরা শ্যাওলা খায় জলের নিচে এবং নানাভাবে চিৎ হয়ে কাত হয়ে এক রূপোলি খেলা জলের নিচে আরম্ভ করে দিলে বড় মনোরম। সে আর মঞ্জু কতদিন কত বর্ষায়, কত বিকেলে হেঁটে কোথাও না কোথাও এ-সব মাছের খোঁজে থাকত। এ-সব মাছের খেলা দেখার জন্য চুপি চুপি বের হয়ে পড়ত।

রাস্তাটা বড় শিমুল গাছটার নিচে এসেই বাঁক নিয়েছে। এটা ছিল মজুমদার বাড়ি। ওদের বাড়ির ওপর দিয়ে রাস্তা চলে গেছে। ওদের বড় ঘরটা রাস্তার এ-পারে—ও-পারে রান্নার ঘর, ঘর থাকলে উঠোনের ওপর দিয়ে রাস্তা যেত। কেউ নেই বাড়ির, কেবল আছে সেই কদবেল গাছটা। যেটা থেকে একটা কদবেল চুরি করে নিলে মজুমদারের মা দিন রাত গাছটার নিচে বসে গালাগাল দিত। সর্বনাশ হবে। বংশ লোপ পাবে এমন কথা বলত। এখানে এসে দাঁড়াতেই অজুর সেই মুখ প্রথম ভেসে উঠল। যেন সেই আগের দিনগুলোর মতো মজুমদারের মা চুপচাপ গাছটার নিচে বসে আছে, হ্যারে অজু না? এলি! কতদিন তোরা এদিকে আসিস্‌নি।

অজু থামল। দু তিনজন মানুষ, বোধহয় ওরা পাট কেটে মাঠ থেকে উঠে এসেছে। পরনে গামছা। সারা শরীর সাদা হয়ে গেছে জলে থাকায়। কোথাও থেকে ঘাস কেটে এনেছে আঁটি আঁটি। ঘাসের আঁটি থেকে জল পড়ছে গড়িয়ে গড়িয়ে। সারা শরীর ভেজা। ওরা ওকে দেখে বলল, কর্তা কার খোঁজে আছেন?

অজু বলল, আমি সেনেদের বাড়ি যাব।

ওরা বলল, সোজা চইলা যান। অর্জুন গাছের নিচে বাড়িটা। লাল ইটের বাড়ি।

ওরা কিছুক্ষণ অজুর দিকে তাকিয়ে থাকল। চেনার চেষ্টা করছে। কিছু না জিজ্ঞাসা করে চিনতে পারে কিনা। আজকাল এটা হচ্ছে। গ্রামে আবার সব পুরোনো মানুষেরা ঘুরে যাচ্ছে।

দু চার দিন থাকছে। তারপর বিষয়-আশয়ের খবর নিয়ে অথবা বন্দোবস্ত দিয়ে চলে যাচ্ছে। ওরা দেখে দেখে যখন চিনতে পারল না, তখন যেন না বলে পারল না, সেনবাবু আপনের কি হয় ?

—আমি অঞ্জন। করুণা রায়ের সেজ ছেলে।

অঃ আপনে রায়েগ বাড়ির মানুষ। তা যান। কতদিন পর আইলেন। আপনেগ দ্যাখলে কত কথা মনে হয়! তারপর ওরা আর দাঁড়াল না। হন হন করে চলে যাচ্ছে। এ-ভাবে অজু যেতে যেতে দুটো একটা কথা, যা না বললে নয়, বলে যাচ্ছে। সে যেন সব পথ দেখতে দেখতে যাচ্ছে। সে দত্তরের বাড়ি উঠে যাবার মুখে দেখল রাস্তাটা ওদের বাড়ির ঠিক দক্ষিণ দিয়ে চলে গেছে। ওখানে ছিল একটা বড় খালের মতো, এবং কত ঝোপ আর বড় বড় কড়ুই গাছ! আর সব নানা রঙের পাখি। তিন রটে গাব গাছ। গাব গাছের নিচে সব সময় অন্ধকার থাকত। ানে একবার একটা ভূত দেখে শশী মালোর মেজবৌ ভয় য়েছিল। ভয় পেলে যা হয়, রাতে বিরাতে ওরা লণ্ঠন হাতে জতে বের হত, এবং অবাক হত, ওরা এসে দেখতে পেত, মেজবৌ গাছটার নিচে অজ্ঞান হয়ে পড়ে আছে।

এবং এ-ভাবে সারাটা আকাশ আর তার নিচের গাছপালা সবই কেমন অজুর কাছে নতুন। অনেক সময় সে ঠিক করতে পারছে না, এখানে কি ছিল। মাত্র বিশ বাইশ বছরে এমন হয়ে যায়!

একটা বড় রাস্তা গ্রামের ওপর দিয়ে চলে গেলে এমন নতুন হয়ে যায় সবকিছু, তার যেন কিছুতেই বিশ্বাস করতে ইচ্ছে হয় না। মেজ-বৌর মুখ অজ্ঞান হয়ে পড়ে আছে, গাব গাছের নিচে প্রতিমা নিরঞ্জনের মতো পড়ে আছে, তার এমনই কেবল বিশ্বাস করতে ইচ্ছে হয়।

অজু দেখল ওদের পুকুর পাড়ে এসেই বাঁক নিয়েছে রাস্তাটা। দত্তদের আম বাগানের ভিতর দিয়ে রাস্তাটা বড় মাঠের দিকে নেমে গেছে। এই বাগান পার হলেই সেনেদের ছাড়া বাড়ি। বড় অর্জুন গাছ। সে কেমন ভেতরে ভেতরে ভীষণ আবেগ প্রবণ হয়ে উঠছে।

এমন একটা নির্জন পৃথিবী এখনও কোথাও আছে সে যেন ভাবতে পারে না। বাড়িগুলো নানারকম আগাছায় ভরে আছে। আর বাড়িব চিহ্ন বলতে কিছু নেই। কোন বাড়ির উঠোনে বেগুনের চাষ। এবং ভুতুড়ে ব্যাপার যেন একটা। এমন একটা গ্রামে মঞ্জু এখনও বেঁচে আছে ভাবতেই ওব কেমন ভয় কবতে থাকল ভেতবে।

কাবণ সেতো এ-গ্রামে আসাব আগে ভাবতেই পারেনি—এ-ভাবে গ্রামেব দৃশ্য পাল্টে গেছে। সে বুঝি ভেবেছিল সে যাচ্ছে তেমনি সেই গ্রামে—সেখানে হলুদ বঙেব লটকন গাছটি না জানি এত দিনে কত বড় হয়েছে। অথচ অজু দেখল তাব প্রিয় লটকন গাছেব কোন চিহ্ন নেই। সে এখানে তাব আবেগ দমন করতে পাবল না। চোখ দুটো ছল ছল কবে উঠল। বড বড টিনেব ঘব ছিল, চাবপাশে চাবটা। ইদাবা ছিল। সেটা এখনও আছে। তবে জল ব্যবহাবেব অযোগ্য। আঁশফলেব গাছটা আবও বড হয়েছে। ঠাকুব ঘরেব পাশটায় বঙনেব ঝাড ছিল। একটাও নেই। ঠাকুর ঘবেব ডানদিকে জ্যাঠামশাই বাজ্যের সব জবা ফুলের গাছ লাগিয়েছিলেন। তাব কোন চিহ্ন সে খুঁজে পেল না।

আব চাবপাশটা খা খাঁ কবছে। সে কেমন শুকনো মুখে সব কিছু দেখতে থাকল। সে এখানে দাঁড়িয়ে থাকলেই যেন টেব পায় তাকে ঠাকুমা বড ঘর থেকে ডাকছে, অজু ভাই বৃষ্টিতে ভিজতে নেই। আয় চলে আয়। সে দেখতে পায় তাব ছোট ঠাকুবদা পুকুব পাড়ে থাবড়ে থাবড়ে মাটি ঠিক করছে। উঠোনেব সব মাটি বৃষ্টিতে ধুয়ে মুছে নিলে থাকে কি। মাটিব জন্য প্রাণেব কি ব্যাকুলতা। ছোট ছোট বাঁশ পেতে আপ্রাণ খোটা পুতে দিচ্ছেন তিনি। এ-সব ব্যাপাবে তাঁব ইচ্ছেব ওপর এতটুকু ভরসা নেই। অজু চুপচাপ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সব দেখতে পাচ্ছিল।

মাথার ওপব সেই আকাশ। দক্ষিণে সেই খালপাড়ে তেমনি তক্ষক কি কিছু একটা হবে ডেকে যাচ্ছে অনবরত। সে চোখ বুজলে, রাতের অন্ধকারে শুয়ে শুয়ে যেমন সব শব্দ শুনতে পেত,

এখনও যেন চোখ বুজলে তেমনি সব কীট-পতঙ্গের আওয়াজ শুনতে পাবে। যেমন বৃষ্টি হলে এক ভেজা সবুজের গন্ধ এসে নাকে লাগত এখনও মনে হয় তেমনি। বৃষ্টি হলেই গন্ধটা তার নাকে এসে লাগবে। এ-ভাবে কেমন এক দূরাগত স্মৃতি তাকে ক্রমে শিথিল করে ফেলছে।

অথচ আশ্চর্য নীরবতা। গাছগুলো কিছু কিছু কারা কেটে নিয়ে গেছে। বাড়িটা দেখা শোনা করার কেউ শেষ পর্যন্ত ছিল না বোধ হয়। নবীন মালোরাও শেষ পর্যন্ত চলে এসেছিল সীমানা পার হয়ে। এ-ভাবে এখানে একটা বাড়ি, কি জাঁকজমকই না ছিল বাড়িটার, এবং উঠানে মানুষের প্রায় মিছিল বলা চলে, সব স্মৃতিতে দেখতে পেল। এখন শুধু বড় বড় গাছ মাথার ওপর। লতাপাতায় গাছগুলো সব বনজঙ্গল হয়ে গেছে। তার নিচে অজু এক প্রাচীনতার ভেতর ফিরে এসে দুঃখী অজু হয়ে গেছে।

আর কিছুদূর হেঁটে গেলেই সেনেদের বাড়ি। মঞ্জু সেন। মঞ্জুর বয়স তখন তের চোদ্দ। সেও তেমনি বয়সের। এখন এমন একটা ছাড়াবাড়ির মতো রুক্ষ, দুঃখী মঞ্জুকে যদি সে দেখতে পায় তবে ভীষণ কষ্টের ভেতর পড়ে যাবে।

অজু আসলে আর এগুতে সাহস পাচ্ছে না। শুধু রোদের ছায়া ওর চারপাশে জাফরি কাটা আকাশের মতো। সে হেঁটে হেঁটে যাচ্ছে। গাছ লতা পাতা ওর শরীর থেকে সরে সরে যাচ্ছে। কেমন যেন সে কোনো প্রাচীন ধ্বংসাবশেষের ভেতর ঢুকে গিয়ে আর বের হবার পথ খুঁজে পাচ্ছে না। অথবা বের হতে চাইছে না। কারণ আর কিছু ইট কাঠ তুলে ফেললেই এর সুন্দরী কিশোরীর কঙ্কাল বের হয়ে আসবে। সে একটু এগোতে গিয়ে কেমন থমকে দাঁড়াল।

না, সে আর বেশি ভেতরে ঢুকতে সাহস পেল না। ওর ইচ্ছে ছিল রান্না ঘরটা পর্যন্ত সে যাবে। কিন্তু ঠিক উঠোনের ওপরই এত বন জঙ্গল যে আর ভেতরে যাওয়া কঠিন। রান্নাঘরের পাশে

বড় একটা জামরুল গাছ ছিল। গাছটা বেঁচে আছে না নেই দেখার বড় ইচ্ছে। অথচ সে যেতেও পারছে না। সেই যে থমকে দাঁড়িয়ে গেল আর নড়তে পারছে না। মনে হল কেউ যেন বন-জঙ্গলের গভীরে ছায়া ছায়া ভাবে ঘুরে বেড়াচ্ছে।

আসলে এটা মানুষের ছায়া না, অন্য কিছু সে বুঝতে পারছে না। এই নির্জন পরিত্যক্ত বাসভূমিতে সে একা। পাশাপাশি বাড়িগুলোতে কেউ আছে বলে মনে হচ্ছে না। কোন ঘর বাড়ি চোখে পড়ছে না। কেবল আগাছা আর জঙ্গল। অথচ এরই ভেতর সে দেখতে পেল মানুষের চলার পথ। কেউ যেন এ-সব পথে কোথাও যায় আসে। ভিতরে বন জঙ্গলের অনেক গভীরে সাদা মোমের মতো রঙ, কখনও দেখা যায়, আবার দেখা যায় না, গাছ পাতার আড়ালে ঢেকে যায়—যেন ওর সঙ্গে কেউ লুকোচুরি খেলে বেড়াচ্ছে। অনেকক্ষণ অপলক তাকিয়ে থাকলে যা হয়—একটা ঝিলিমিলি ভাব, যেন হাওয়ায় মিলে মিশে গেল। বন জঙ্গলের ভেতর আশ্চর্য সুন্দর এক যুবতীর ছবি হারিয়ে গেলে তার মনে হল সে মরীচিকা প্রায় কিছু দেখে ফেলেছে।

কারণ সে ভেবে ফেলেছে. রোদ বন জঙ্গলের ভেতর লুকোচুরি খেলে বেড়ালে এমন হতে পারে। সামান্য হাওয়ায় পাতা নড়ছে। রোদ পিছলে যাচ্ছে গাছের পাতা থেকে, যেন একটা সাদা খরগোস লাফিয়ে পড়ল মাটিতে। তারপর চোখের ওপর ঝিলিমিলি রোদ আশ্চর্য মায়াজালে ভরা। সে সারাটা পথ মঞ্জুর কথা ভেবেছে। মঞ্জু এখন উত্তর ত্রিশের যুবতী। সে মঞ্জুকে ফ্রক প্যাণ্ট পরতে দেখে গেছে। তার পর সে আর কিছু জানে না। এখন মঞ্জু বড় হয়ে গেছে। শাড়ি পরলে মঞ্জুকে কেমন দেখায় সে জানে না। সাদা অথবা হলুদ রঙের শাড়ি পরলে মঞ্জুকে এখন একটা মায়াবিনী ছবির মতো ভাবা যায়। যেন এ-সব সবুজ বন জঙ্গলের ভেতর এক সাদা মোমের মতো পবিত্র মেয়ে অদৃশ্য ছায়ায় ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছে।

অজু আর দাঁড়াল না। সে হাতের ব্যাগটা ফের হাতে তুলে নিল।

বরং সে ভাবল, এসব জায়গা সে মঞ্জুকে নিয়ে দেখতে আসবে। মঞ্জু যেহেতু এখানে এখনও রয়েছে সে সব খবরই ওকে দিতে পারবে। এবং জামরুল গাছটা এখনও বেঁচে আছে কিনা সে ঠিক ঠিক বলতে পারবে। কারণ শীতের সময়ে অথবা বসন্ত সমাগমে এখানে তেমন বন জঙ্গল থাকার কথা নয়। এখানে অনায়াসে মানুষেরা চলে আসতে পারে। এখনও যাওয়া যে না যায়, তা না, তবু সে শহরের মানুষ, সামান্য বন জঙ্গলেই সে কেমন ভয় পেয়ে যায়। সে বোধ হয় সেজন্যই এমন সব বনের ভিতর ঢুকে যেতে ভয় পায়।

আর আশ্চর্য সে এ-সব বনে জঙ্গলে শৈশবে ঘুরে বেড়াতে না পারলে তার ভীষণ খারাপ লাগত। জামরুলের গাছটায় সাদা ফল। গাছটার ডাল নুয়ে পড়ত। গাছটার নিচে খৈ-এর মতো ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকত জামরুলেরা। প্রায় তুষার পাতের মতো মনে হত। খণ্ড খণ্ড বরফের টুকরো গাছের নিচে সবুজ ঘাসে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকত। তখন ছিল তাদের কে কত তুলে নিবি আয়। ওরা কোচড় ভরে জামরুল তুলে আনত। সে-গাছটার জন্য অজুর ভীষণ মায়া ছিল।

মায়া ছিল তার সব কিছুর জন্য। চারপাশে তাকালেই সে তা টের পায়। টের পায় চুপচাপ হেঁটে গেলে, সে যেন আর হাঁটছে না। ছোট অজু এখন তার চারপাশে দৌড়াচ্ছে।

তার এ-ভাবে বেশ লাগছিল হেঁটে যেতে। ঐতো সেই ছাড়াবাড়ি। ওখানে সেনবাবুর সাদা রঙের ঘোড়াটা বাঁধা থাকত। আর কি বিস্ময় যে দেখল এখনও একটা সাদা রঙের ঘোড়া বাঁধা আছে। যেন সেই ঘোড়াটা!

সে বিশ্বাস করতে পারছে না। চারপাশের সব বাড়িগুলো যখন ছাড়াবাড়ি, তখন এখানে পুরানো দৃশ্য চোখে ভেসে ওঠায় সে ভীষণভাবে ঘাবড়ে গেল।

অজু এবার চোখ কচলাল। আসলে সাদা রঙের ঘোড়াটা তাকে ছেলেবেলার মতো এত বেশি সারাটা পথ তাড়না করেছে যে সে এখন সত্যি সত্যি তেমনি চোখের ভুলে একটা সাদা রঙের ঘোড়া দেখে ফেলেছে নাতো!

না, ঘোড়াটা চোখের ভুল নয়। বেশ পা ছুড়ছে, লেজ নাড়ছে। ঘাস খাচ্ছে। পা ছুড়লে, লেজ নাড়লে, ঘাস খেলে ঘোড়ার ছবি মিথ্যা হয় না। সে সত্যি সত্যি যখন বুঝতে পারল না ওটা সাদা রঙেরই ঘোড়া, এবং তেমনি সেই বড় অর্জুন গাছ, গাছের পাশে পাকা সড়ক, এখন বর্ষাকাল বলে বাড়িটার চারপাশে জল, শাপলা শালুকের ফুল, সবুজ লতাপাতায় ভরা, জল স্ফটিক জলের মতো। সে নিবিষ্ট মনে এসব দেখতে দেখতে একটা সাদা রঙের ঘোড়ার ছবি তার চোখ থেকে অদৃশ্য হয়ে গেল।

এখন চোখের সামনে সেই লাল ইটের বাড়ি। সামনে লন সবুজ ঘাসের। ডান পাশে ছোট্ট টিনকাঠের ঘর। ঘরের দেওয়ালে তেমনি পোষ্টবক্স, বাঁদিকে ডিসপেনসারি। সেনবাবুর কবিরাজির জন্য বড় বড় মানুষ সমান উঁচু মাটির জার। আশে-পাশে ডাই করা গুল্মলতা, অষুধ তৈরির জন্য উদখল—কি বিশালাকায় সব পাথরের উদখল বারান্দায়, ভেতরে কাঁচের আলমারি বড় বড়। ছোট ছোট শিশিতে নানারকমের লাল নীল রঙের বড়ি। একজন বৃদ্ধ মানুষ চশমা কানে বেঁধে জানালা দিয়ে ওকে দেখছে।

সব ঠিকঠাক আছে। এতগুলো বাড়িতে যখন পরিত্যক্ত ছবি—তখন এ বাড়ি হুবহু এখনও আগের মতো আছে দেখে অজুর মনে হল, মঞ্জু হয়তো এক্ষুনি দরজা খুলে ছুটে আসবে। আরে তুমি। এস এস। রাস্তায় কোন অসুবিধা হয়নিতো? কিন্তু সে দেখতে পাচ্ছে এক বৃদ্ধের মুখ। মুখে কঠিন রেখা। মুখ দেখলেই মনে হয় নানাভাবে কঠিন সংশয়ে ভুগছেন। বৃদ্ধের গলা খুব উঁচু। তিনি বললেন, কারে চান?

—মঞ্জুকে চাই।

—অঃ মঞ্জুরে চান। তা আসেন। ভিতরে বসেন। আমি ভিতরে খবরটা দিয়া আসি।

মানুষটা পরেছে খোপকাটা লুঙ্গি। পা খালি। একটা ছেঁড়া হাফসার্ট গায়ে। জামা ছেড়া পরলেও মানুষটা খুব পরিচ্ছন্ন থাকতে ভালবাসে।

অজু ভেতরে ঢুকে দেখল, একটা বড় তক্তপোষ। পাটি পাতা। পাশে ছোট একটা উদখল। এতক্ষণ মানুষটা এই উদখলে অষুধ ঘসে ঘসে মিহি করছিলেন। অজুকে দেখেই জানালায় যে উঁকি দিয়েছিলেন বোঝা যায়। যেন খুব সতর্ক নজর চারপাশে। ওর নজর এড়িয়ে কেউ ঢুকতে পারে এ-বাড়িতে এমন আশা করা ঠিক না। তারপরই মানুষ সমান উচু সেই মাটির বোয়েম। এ-সব বোয়েমে আগে অজু গাদা গাদা ভাস্কর লবণ রাখতে দেখেছে। সেন দাদাকে দেখলেই অজু বলত, আমারে ভাস্কর লবণ দিবেন। খুব খাইছি। প্যান্টটা কি উচা হ্যাখেন।

সেন দাদা এক পুরিয়া ভাস্কর লবণ দিতেন। সেন দাদা না থাকলে স্বর্ণ থাকত। যেন এই ডিসপেনসারি বিশেষ করে ভাস্কর লবণের জারগুলি ছিল ওদের জন্য। সে তখন ছোট ডিসপেনসারিতে ঢুকে দেখেছে কেউ নেই। এত উঁচু বোয়েম যে সে নাগাল পর্যন্ত পায় না। অথচ কুলের সময় সেটা। ভাস্কর লবণ দিয়ে কুল খেতে বড় ভালো লাগে। সেন দাদা থাকলে পেট দেখিয়ে, স্বর্ণ থাকলে হাত পেতে, আর কেউ না থাকলে সিঁড়ি লাগিয়ে বেশ একটু নুন নিয়ে সে যেত দক্ষিণের বাড়ি। ওর অর্থাৎ ফুলু টুলু রসো সবাই গাছের নিচে বসে কুল খেত। মঞ্জু আসত না। মঞ্জু ছিল তখন শহরের মেয়ে। সে আসত পুজোর ছুটিতে, গ্রীষ্মের ছুটিতে। অজুকে ওদের সঙ্গে মিশতে দেখলেই কেন জানি তখন মঞ্জু ভীষণ রাগ করত।

তিনি ফিরে এসে বললেন, বসেন, মঞ্জু চান করতাছে। আপনারে বসতে বলছে।

অজু যেন এমনটা আশা করেনি। ওর নাম শুনেই কথা ছিল যেন মঞ্জু ছুটে আসবে। মঞ্জুকে দেখার জন্য সে কেমন ব্যাকুলতা বোধ করল। অমন সুন্দর যার হাত পা চোখ, গায়ের রঙ, চোখ তুলে চাইলে কেবল যার হাসি ঝরে পড়ত, ঘাস মাড়িয়ে গেলে মনে হত যার পা ভীষণ অহংকারী, সে এখন যে আসবে না, একটু যে সে দেরি করবেই এটা তার বোঝা উচিত। সুতরাং সে আলাপ কবার মতো যখন কোন কিছু খুঁজে পাচ্ছে না তখনই তিনি প্রশ্ন করলেন, আপনে মাইজা ঠাকুরের পোলা না?

অজু বলল, হ্যাঁ।

—হ্যাখাই চিনছি। কর্তা বাইচা আছে?

—না।

—ঠাইবেন?

—না।

—তা হইলে আছেডা কে?

—কেউ না। বলে অজু হাসল।—আপনাকে আমি চিনতে পারলাম না।

—চিনতে পারলেন না?

—না।

—একবার আপনেগ হাঁস চুরি গেল মনে আছে?

—আছে।

—পাড়ায় তখন হাঁস মুরগি কারো থাকত না।

—হ্যাঁ, মনে আছে।

—পাঁঠার বাচ্চা যত সব চুরি গ্যাল।

অজু বলল, সেতো তারপর সব খোঁজ পাওয়া গেল।

—কি কইরা পাইলেন। কেডা তারে ধরল?

অজু এবার ঠিক হয়ে বসল। মনে পড়েছে। তবে এই মানুষই কি সেই ভয়াবহ মানুষটি। এতটুকু সে মিল খুঁজে পাচ্ছে না। তখন ওর চুল ছিল খাটো। শরীরে ছিল তার অজস্র ঘা।

চুরির দায়ে সে জেল খেটেছিল ক'মাস। চোরের বাস গাঁয়ে হয় না। জেল থেকে ফিরে সে গাঁয়ে থাকতে পারল না, মানুষটি তারপর অনেকদিন নিখোঁজ ছিল।

তিনি বললেন, বড় বড় চোখে কি ছ্যাখতাছেন ?

—কিছু না।

—না ঠিক ছ্যাখতেছেন। ভাবছেন, মনে করতে পারেন কিনা। বলেই তিনি আবার জানালায় ডাক দিলেন—কেডা ?

—আমি রোফ্।

—তা তুমি এমন অবেলায় ক্যান ?

—একটু কাশির ওষুধ দিবা।

—বস বাইরে।

আলমারি খুলে গুনে গুনে কটা বড়ি বের করে দিলেন তিনি। কৃষ্ণচতুর্মুখ দিলাম। তুলসী পাতার রস দিয়া খাইয়। মধু দিবা দুই ফোঁটা। তোমার যা কাশি চরণামৃত রস কাজে দিব না। ছাড়ে কিনা ছ্যাখ। না হইলে বাসবলেহ নিয়া যাইবা। পয়সা কি আনছ ছ্যাখি।

রোফ্ পয়সা বের করলে কেমন ক্ষেপে গেল মানুষটা! —হারামজাদা চোট্টা, বেইমানি করার আর জায়গা পাওনা। পয়সা না দিয়া অসুধ খাইবা! তুমিত মিঞা ছ্যাখছি খানেগ চাইতে হারাম আছ। বলে সে জোরজার করে অষুধ আবার রোফের কাছ থেকে কেড়ে নিল।

এমন একটা অবস্থায় অজু ভীষণ বিব্রতবোধ করল।

রোফও দেবে না, আর এই মানুষটাও ছাড়বে না। শেষে এক টাকা বিশ পয়সা রফা হল। লোকটা গালাগাল দিতে দিতে চলে গেল। বলল, সেনবাবু বাইচা থাকলে তর মজাটা দেখাতাম।

অজু বাইরে বারান্দায় এসে দাঁড়ালে আবার গলা শোনা গেল। —কি মনে হইতাছে ? লোকটারে আপনে জানেন না। আপনের বাপে চিনত। লোকের গলা কাইটা পয়সা। এখন শ্বাসকষ্ট। যারে

কয় হাঁপানি। অরে আমি কিছুতেই বাসবলেহ দেই না। দিলেই শূয়োরের বাচ্চা ভাল হইয়া যাইব। আর মানুষের ফের গলা কাটব।

অজু কোন জবাব দিচ্ছে না। কেমন সবই ভূতোড়ে মনে হচ্ছে। কেবল এই বড় পাকা সড়কের পাশে বাড়িটা আছে বলে রক্ষা। কিছু কিছু মানুষের সাড়া রাস্তায় পাওয়া যাচ্ছে। মঞ্জুদের বাড়ির সামনে লম্বা বারান্দা। খোলা বারান্দা বলে ভেতরটা সব দেখা যায়। নীল রঙের সব জানালা। জানালাগুলো সব খোলা। পুকুরের দিকটায় বড় একটা ডালিমের গাছ ছিল। ওটা ছিল ওদের পূবের পুকুরে। গাছটা ছিল পুকুরে নেমে যাবার পথে। মঞ্জুর মা আত্মহত্যা করেছিল। ডালিম গাছটার নিচে তখন বর্ষার জল। জলে ডুবে আত্মহত্যা। ওর মনে আছে সে মঞ্জুর মাকে ডালিম গাছটার গোড়ায় ভাসতে দেখেছিল।

এসব কারণে সে এখন সব কিছুই কেমন যেন সন্দেহের চোখে দেখছে। এবং মানুষটার তখন আবার ডাকাডাকি। পেছনে সব হাতির শুঁড়ের গাছ। বড় বড় পাতা। ওর ছায়া লম্বা হয়ে পোস্ট-ফিসের বারান্দায় নেমে গেছে।

তিনি দু পা ছড়িয়ে বসেছেন। মাঝখানে উদখল। তিনি দুহাতে টেনে টেনে অষুধ ঘসে যাচ্ছেন। তার একটানা শব্দ।—তা কলকাতায় এখন মাছ পাওয়া যায় কেমন?

—পাওয়া যায়। তবে খুব দাম।

—ক্যান এই যে শোনতাছি, বাংলাদেশের সব মাছ আপনারা খাইয়া ফ্যালতাছেন।

—না না, কে বলেছে! মাছ এখনও যায়ই নি।

—কিন্তু মাইনসে যে কয়, আর মাছ খাইতে হইব না, সব মাছ ইণ্ডিয়ায় চালান। সবার কচু খাইতে হইব কেবল।

অজু এর কি জবাব দেবে ভেবে পেল না। এতক্ষণ মঞ্জুর চান করতে লাগে! সে বুঝতে পারল না আসলে মঞ্জু কোন খবর পেয়েছে কিনা। খবর পেলে মঞ্জুর এত দেরি করার কথা না।

আর এখনই মনে হল দরজা খুলে কেউ বের হয়ে আসছে। অজু দাঁড়িয়ে আছে ডিসপেনসারির বারান্দায়। বড় বড় কাঠের থাম। থামের আড়ালে ওর লম্বা শরীর, এবং চোখ মুখ। সে অন্যমনস্কভাবে একটা সিগারেট টানছে। চশমার বড় বড় কাচের ভেতর চোখ দুটো যে তার ভীষণ চেনা দেখলেই টের পাওয়া যায়। মঞ্জু তারপর আর কত লম্বা হয়েছে! ওর চুল আর কত বড় হয়েছে! মঞ্জুর ছিল ভারি সুন্দর কোঁকড়ানো চুল। নীল রঙের সে ফিতা ব্যবহার করত। কখনও লাল রঙের। আর স্বভাব ছিল মঞ্জুর সাদা রঙের ফ্রক পরার। ফ্রকের রঙ এমন ভাবে শরীরের সঙ্গে মিশে যেত যে বোঝাই যেত না মঞ্জু একটা ফ্রক গায়ে দিয়ে আছে। সে মঞ্জুকে কখনও শাড়ি পরতে দেখেনি। মঞ্জু শাড়ি পরলে কেমন না জানি দেখাবে।

অজু দেখল, সেই অহংকারী পা। ঘাসের ওপর যেন পড়ছে না! কিছুটা হাওয়ায় ভেসে আসার মতো যেন। অনেক লম্বা হয়েছে। সেই সাদা জমিনের শাড়ি। চওড়া নীল পাড়। গলায় পেণ্ডেন্ট হার। হাতে একগাছা করে পাতলা সোনার চুড়ি। চোখে চশমা! ভারি লেনসের। চোখ খুব খারাপ চশমার পুরো লেনস্ দেখে বোঝা যাচ্ছে। কপাল সাদা। সিঁথি শূন্য।

মঞ্জু বলল, তুমি আসবে জানতাম।

অজু প্রথম কথা বলতে পারল না। কেমন বিষণ্ণ চোখ মুখ মঞ্জুর। এবং চোখের নিচে কালো ছায়া যেন কত কাল থেকে এক দুঃখের ছবি নিয়ে জেগে আছে। অজু বলল, তুমি জানতে।

—জানতাম।

—আমি তো কোন চিঠি দিইনি।

—তবু জানতাম তুমি আসবে।

অজু স্যুটকেসটা হাতে নিলে বলল, ওটা থাক। সে ডাকল, জব্বার কাকা ভেতরে স্যুটকেসটা পাঠিয়ে দিও।

জব্বার কাকা বাইরে এসে বলল, মায় কিছু কইলেন?

অজু বুঝতে পারল জব্বার কানে কম শোনে।

—অজুর স্যুটকেশটা পাঠিয়ে দিও ভেতরে। বলে মঞ্জু পেছনে তাকাল না। কি যে সুন্দর এক ছবি এখন ঘাসের ওপর ছড়িয়ে যাচ্ছে! এমন বর্ষার দিনে মঞ্জু একা! ওর বিয়ে হয়েছিল কিনা, অথবা এটা কি ওর বৈধব্যের পোশাক সে ঠিক বুঝতে না পেরে কেমন বিচলিত বোধ করল। এই যে নির্জন পরিত্যক্ত সব বাসভূমি, তার ভেতর মঞ্জু কিভাবে যে বেঁচে আছে, বেঁচে ছিল জানার ভীষণ কৌতূহল হচ্ছে অজুর। মঞ্জুকে সে প্রশ্ন করল, কি করে বুঝলে আমি ঠিক আসব।

মঞ্জু বারান্দায় উঠে ঘুরে দাঁড়াল। বলল, জব্বার কাকা একটা কথা বলে থাকে প্রায়ই।

—কি কথা?

—জননী জায়া জন্মভূমির কথা মানুষ কখনও ভুলে যেতে পারে না অজু। মানুষ তার কাছে বার বার ফিরে ফিরে আসে।

মানুষেরা এ-ভাবে এ-পৃথিবীতে এক আশ্চর্য খেলার ভেতর বড় হয়ে যায়। যেন সুদূরে তার দেখা, অদূরে সে এখনও আছে, কিছুতেই জীবন থেকে সে শেষ হয়ে যায় না।

মঞ্জুর সাড়া শব্দ এখন পাওয়া যাচ্ছে না। কোনদিকে মঞ্জু থাকতে পারে। এ-বাড়িটাতে কটা ঘর আছে, মঞ্জুর চেয়ে সে কম ভাল জানে না। সে তো ছেলেবেলা এ-বাড়ির সব ঘরগুলো ঘুরে ঘুরে দেখত। দেয়ালে কি সাদা রঙ! একটা দাগ পড়ত না। এখনও নেই। যেন এখানে কখনও ছবি পুরোনো হয় না। তেমনি, সাদা এনামেল কালারের ভাস। নানা বর্ণের ফুল।

অজু এ-বাড়ির সব কিছুর ভেতর সেই ছেলেবেলা থেকে দুর্লভ কিছু আবিষ্কার করে বেড়াত। শৈশবে সে ভাবত, এ-বাড়ির মানুষেরা কোথায় যেন অন্য সব মানুষের চেয়ে আলাদা। সব মিলে এদের সব কিছুর ভেতর ছিল আশ্চর্য সৌরভ। সেই সকালে সেন দাদা ঘোড়ায় চড়ে রুগী বাড়ি বের হতেন। খুব সকালে সে পুকুর

পাড়ে দাঁড়ালে দেখতে পেত, মঞ্জু বাগানে ফুল তুলছে। তারপর সূর্য ওদের ঘাসে হলুদ রঙ ছড়িয়ে দিত। বাড়ির ভেতর থেকে বড় ডিসে নানারকম প্লেটে চা বিস্কুট, মঞ্জু ওদের লনে বসে চা খেত। এত-টুকু মেয়ে সকালে চা খায় ভাবতে সে ভীষণ অবাক হত।

ঘোড়াটা তখন অর্জুন গাছটার নিচে, সাদা রঙের ঘোড়া। অলিমদ্দি ঘোড়াটার শরীরে জোরে জোরে বুরুশ মারছে। সামনে কাঠের একটা বড় গামলা। চানা আর ঘাস। ঘাস আলাদা। ঘাস শেষ হলেই ঘোড়াটা চানা খেত।

ঘোড়াটার একটা নাম দিল।

অজু ডাকত, লাল বলে।

মঞ্জুও ডাকত, লাল।

আসলে ঘোড়াটার নাম ছিল যমুনা। সেনদাদা ঘোড়ার খোঁজ খবর নিতে হলে বলতেন, যমুনাকে চান করিয়েছিস অলি।

যমুনার জন্য সেনদাদা ভীষণ উদবিগ্ন থাকত যেন সব সময়।

যমুনা ছিল অজুদের খেলার সঙ্গি। সেনদাদা ঢাকা গেলে, ওরা অলিকে মাছ ধরতে পাঠিয়ে দিত। অলির ছিল ভীষণ মাছ ধরার নেশা। অলি মাছ ধরতে গেলে, মঞ্জু অজুকে ঘোড়ায় চড়া শেখাতো।

এ-ভাবে মানুষের ঘোড়ায় চড়ার ইচ্ছে কিভাবে যেজন্মে যায়। সে যে কি করে জেনে ফেলে চারপাশে যা কিছু আছে সবই সে মাড়িয়ে যাবে। সব তার জন্য। সে দুহাতে এমন সৌন্দর্য লুটেপুটে না খেতে পারলে কেমন নিজেকে ভীষণ দুঃখী ভেবে থাকে। অজুর মনে হত তখন সে আর মঞ্জু পাশাপাশি অনেকদূর পর্যন্ত হেঁটে যাবে। সবুজ উপত্যকায় ঘুরে বেড়াবে। অথবা কোন নদীর পারে হেঁটে গেলে অজুর মনে হবে, মঞ্জু ভারি সুন্দর।

সকাল বেলা মঞ্জু নীল স্ট্র্যাপের খড়ম পায়ে দিত। মঞ্জুও বারান্দা দিয়ে হেঁটে গেলে টের পাওয়া যেত মঞ্জু হেঁটে যাচ্ছে। খুব সকালে তার কাজ ছিল ফুল তোলা, শহর থেকে এলেই ঠাকুমা ওকে ফুল তুলতে বলত।

আসলে মঞ্জুরও খুব ভাল লাগত ফুল তুলতে। খুব সকাল সকাল মঞ্জুরও ঘুম ভেঙ্গে যেত। ওর মনে হত, হয়ত এতক্ষণে ওরা সব ফুল চুরি করে নিয়ে গেছে। ওরা বলতে টুলুফুলু খুশী আর রসো। অজুকে সে কখনও ফুল চুরি করে নেবে ভাবতে পারত না।

অজু ছিল মুখচোরা স্বভাবের মানুষ। অজুদের বাড়িতেও ছিল নানারকম ফুলের গাছ। কত রকমের জবা। কিন্তু একটা ফুল ওদের ছিল না। রক্ত জবার গাছ অজুদের বাড়িতে বাঁচত না। ঠাকুর ঘরের পেছনে সব জবা ফুলের গাছ। সেখানে অজুর কাকা নানা-ভাবে একটা রক্ত জবা গাছের ডাল পুঁতে দেখেছে গাছ বাঁচে না। অথচ অজুর কাকা রক্ত জবা না হলে বিগ্রহের পূজায় সব ঠিকঠাক থাকছে না এমন ভাবত।

মঞ্জু জানত, অজু আসবে। অজু আসবে কটা রক্ত জবার জন্য। সে এসেই চুপচাপ ঠাকুমার ঘরের পাস দিয়ে হেঁটে যাবে।

ঠাকুমার গলা—কেরে? অজু!

—আমি অজু।

—মঞ্জু, ওকে কটা ফুল দিয়ে দিস। কারণ অজু জানত, মঞ্জু এলে একটাও রক্ত জবা গাছে রাখবে না। মঞ্জুর এটা স্বভাব, সে সাজি থেকে ফুল তুলে দিতে ভালবাসে। অজু নীচে ঘাসের ওপর দাঁড়িয়ে। মঞ্জু ও বারান্দার সিঁড়িতে। এবং বেছে বেছে সব বড় বড় ফুল অজুর সাজিতে তুলে দেবার সময় মঞ্জু বলত, অজু তুই ঢাকা গেলি না!

—বাবা বলেছে, বড় হলে নিয়ে যাবে।

—লক্ষিবাজারে মতি সাহার আইসক্রিম খেলি না; আইসক্রিম না খেলে কেউ কখনও বড় হয় না।

অজু ভাবত, সত্যি বড় হয় না। সে বলত, কি করব বল, বাবাতো আমাকে নিয়ে যাচ্ছে না। একটু থেমে অজু বলত, তুই আমার জন্য একটা নিয়ে আসবি!

—তুই কি বোকারে!

. অজু ভাবত, সে সত্যি বোকা। আইসক্রিম না খেলে হয়ত মানুষ বোকাই থাকে। কারণ সেতো জানে না আইসক্রিম খেতে কেমন, সেতো জানে না. ওটা দেখতে কেমন। এই যে মাঠ, মাঠ পার হলে গোপের বাগ, তারপর গ্রাম মাঠ পার হলে ওর স্কুল, সে জানে না তারপর কি আছে।

অজু তখন চুপ করে থাকত।

মঞ্জু বলত, কিরে চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকলি!

অজুর মুখে তবু কোন কথা যোগাতো না। সে এদিক ওদিক তাকিয়ে বলত, যাইরে। অনেক পড়া বাকি।

তারপর ফুল নিয়ে সে সোজা চলে আসত। ঠাকুর ঘরে ফুল রেখে সে বারান্দায় ভাইবোনদের সঙ্গে পড়তে বসত। খুব জোরে জোরে পড়ার স্বভাব ছিল তার। মঞ্জু এলে যেন সে আরও গলা ছেড়ে পড়ত। সে একটা জায়গায় মঞ্জুর চেয়ে বড়। সে ওর চেয়ে দু ক্লাশ ওপরে পড়ে। পড়াশোনায় অজুর বেশ নাম আছে। পড়তে বসলেই যেন সে মনে করতে পারে আইসক্রিম বরফের হয়। বরফ গলে যায়। সে খুব বোকার মতো মঞ্জুর সঙ্গে কথাবার্তা বলেছে।

এমন হলেই সে দুদিন তিন দিন আর মঞ্জুদের বাড়িতে যেত না। মঞ্জুকে সে এড়িয়ে চলত। অথচ মঞ্জু কি করে যে টের পেয়ে যাব! মাকে সে এসে বলত, দিদিমা অজু কোথায়।

অজু তখন হয়ত বড় কামরাঙ্গা গাছের ডাল কেটে দিচ্ছে। সে দেখতে পাচ্ছে—মঞ্জু উঠোনে দাঁড়িয়ে, পায়ে আলতা, মঞ্জু আলতা পরতে ভালবাসে। মঞ্জু সুন্দর জুতো পায়ে দিয়েছে।

অজুদের ছোট্ট গ্রামটাতে মেয়েরা জুতো পরত না। কেবল মঞ্জুর দিদি পরত। সে শহরেই বড় হয়েছে বলে গ্রামে একটা বড় বেশি আসত না। মেয়েরা জুতো পরলে অজুদের সেই বয়সে রহস্যটা আরো বেড়ে যায়। আর অজুরা ছিল, কবে কখন মঞ্জু হাত তুলে ডাকবে। একটু কথা বলবে। মঞ্জুর সঙ্গে কথা বলার জন্য ওরা ছলছুতোয় মঞ্জুদের বাড়ির চারপাশে ঘুরে বেড়াত। জুতো

মোজা পরলে মঞ্জুকে গাঁয়ের পথে বনদেবী টেবি মনে হত। মঞ্জুর জন্য ওর আর অবনীর একটা নেশা ছিল।

মঞ্জুদের বাড়িতে ছিল একটা বুড়ো মতো মানুষ। সে কেবল হাম্বল দিস্তায় সারাদিন সব লতাপাতা, শুকনো হরতকি, জায়ফল গুঁড়ো করত। কেমন একটা ঢং ঢং করে শব্দ হত হাম্বল দিস্তার। দূরে, যতদূরেই যাক, হাম্বল দিস্তার শব্দ তাদের কানে এসে বাজত।

সকাল থেকেই সব মানুষজনেরা আসত। মঞ্জুর বাবার নাম অবিনাশ কবিরাজ। বড আটচালা ঘর, ওপরে টিনের চাল, বড় বড় জানালা কাচের, ভিতরে অনেক সব উঁচু আলমারি, অজস্র শিশি বোতল এবং সব হলুদ নীল সোনালী বড়ি। কত সব নাম। অজু আলমারির পাশে দাড়িয়ে আগে সব নাম মুখস্থ করত। এখন অজুর একটা নামও মনে নেই। কেবল সকাল হলে যারা আসত তাদের সে কিছু কিছু মুখ এখনও মনে করতে পারে। দরজার সামনে লাইন লেগে যেত। অবিনাশ কবিরাজ ওদের জিভ দেখে পেট টিপে বিনা পয়সার অষুধ দিতেন।

রুগি বাড়ি যাবার সময় সেন দাদা মাথায় শোলার হ্যাট পরতেন। কাপড়ের নিচে ফুলসার্ট গুঁজে দিতেন। পায়ে পরত গামস্থ। চোখে চশমা। এবং দুপাশে দুটো টিনের বাক্সে আর নীল হলুদ রঙের বড়ি নিয়ে দুতিন দিনের জন্য কখনও কখ.তে কোথায় চলে যেতেন। মাঠে ওর ঘোড়া ছুটলে বলত, ঐ যায় অবিনাশ কবিরাজ, বড় কবিরাজ। ধন্বন্তরি। মঞ্জু সেই সুন্দর সুপুরুষ মানুষটির মেয়ে। শহর থেকে এলেই মঞ্জুর শরীরে থাকত আশ্চর্য সুবাস। সারাদিন গন্ধটা অজুর নাকে চন্দনের মতো লেগে থাকত। সে অজুর জন্য নিয়ে আসত সুন্দর সুন্দর জলছবি। অজু ওকে বন থেকে সংগ্রহ করে চন্দনের গোটা উপহার দিত।

শহর থেকে এলেই মঞ্জু বলত, এগুলো তোর জন্য এনেছি অজু।

—কি দেখি।

—ছাখ না। বলে জলছবি সে এক ঝাক দিত। কোনোটা

ফুলের, কোনোটা ফলের, কোনোটা তিন-পা-আলা জোকারের। এমন সব চিত্র বিচিত্র ছবি।

মঞ্জু বলত, কি করে জলছবি তুলতে হয় জানিস ?

অজু যেমন দাঁড়িয়ে থাকত, তেমনি দাঁড়িয়ে থাকে। সেতো ও-সবের কিছু জানত না।

মঞ্জু লাফিয়ে লাফিয়ে চলে যেত ভেতরে। সে লম্বা কাচের গ্লাসে জল নিয়ে আসত। এমন সুন্দর কাচের গ্লাসও কোনদিন অজু দেখেনি। নানারকম লতাপাতার প্রিন্ট গ্লাসটার গায়ে। জলের ভেতর মনে হত লতাপাতা সব ভেসে বেড়াচ্ছে।

মঞ্জু এসেই বারান্দায় বলত, ধর।

অজু ধরত।

—বোস এবার।

সে বসত।

তারপর সাদা পাতার ওপর মঞ্জু ছোট ছোট ছবি জলে ডুবিয়ে চেপে রাখত। বেশ সময় পার করে দিত ঢাকা শহরের গল্প করে। গেণ্ডেরিয়াগঙ্গায় কত আনারস আর কাঁঠালের নৌকা আছে সে যেন চোখে বলে দিতে পারত তখন। অথবা সূত্রাপুরের পুল পার হয়ে একটা বড় মাঠে ছোট বটগাছ পাওয়া যাবে। সেখানে রঙ্গীন ঘুড়ি কে একটা ঘুড়ি বেঁধে রেখে গেছে। অজু সঙ্গে থাকলে সে ঘুড়িটা ঠিক পেড়ে আনত। এবং এমন সব গল্প যার মানে সব সময় অজু ধরতে পারত না।

ছবিগুলো সাদা পাতায় আকাশে তারা ফুটে ওঠার মতো ফুটে উঠলেই সে বলত, নে ধর। তোর বইয়ে একটা একটা করে জলছবি ছেপে দিবি, নিচে একটা নাম লিখবি।

অজু মাথা কাত করে বলত, লিখব। যেন সে খুব ছোট, ছোট-ভাইটির মতো একান্ত বশংবদ হয়ে থাকতো মঞ্জুর। কারণ মঞ্জুকে খুশী করতে না পারলে সে কোথাও হেরে যাবে এমন যেন কথা আছে।

—কি লিখবি ?

—কি লিখব আবার ? আমার নাম লিখব।

—তা হলেই হয়েছে।

অজু তাড়াতাড়ি সংশোধন করে নিতে গিয়ে আর কিছু বলতে পারত না।

—আমার নাম লিখবি। এগুলো আমি তোকে দিয়েছি লিখবি। মঞ্জু বলত।

এমন কথায় অজুর সায় থাকত না। মনে মনে সে বলত—না এ হয় না মেয়ে। কিন্তু মুখে বলত, আচ্ছা। আসলে সে যে বড় হয়ে উঠছে এটা টের পেয়ে যাচ্ছে। সে মঞ্জুর নাম কিছুতেই বইয়ে লিখতে পারে না। কোথাও না। এমন কি মঞ্জু যে মনের ভেতর একটা নাম হয়ে আছে সেটাও যেন একটা ভয়। কখন ধরা পড়ে যাবে।

শহর থেকে মঞ্জু এলে, ওর তাজা মুখ, আশ্চর্য নীল চোখ এবং মাখনের মতো গায়ের রঙ দেখে অজু কেমন দুঃখী মানুষ বনে যেত। ও যে-ভাবে যত কথা বলতে পারত, অজু তার উত্তরে কিছুই বলতে পারত না।

এই ছিল তাদের মঞ্জু। তারা মানে তিন জন, রসো, অবনী আর অজু। ওরা এক ক্লাসের ছাত্র। একসঙ্গে স্কুলে যেত। যেতে যেতে খিদে পেলে মাঠ থেকে খিরাই চুরি করত। এবং কোনো কোনো বিকেলে ফুটবল খেলার মাঠে না গিয়ে সেই আমলকি গাছটার নিচে বসে থাকত। ওদের যেন কি কথা থাকত বলার। গোপনে কিছু বুঝি রহস্য আবিষ্কার করে ফেলেছে শরীরের এবং এ-ভাবে বুঝি সেই আবিষ্কারের রহস্যটা মঞ্জুকে ঘিরে। ওরা আমলকি গাছটার নিচে, অথচ কিছু বলতে পারত না। যেন এটা একটা পাপ কাজ। এমন ভাবাও পাপ কাজ। ওদের মুখ দেখলেই তখন তা টের পাওয়া যেত।

কিন্তু এক গ্রীষ্মে ওরাই প্রথম দেখেছিল, মঞ্জু সাদা রঙের ঘোড়ায়

চেপে মাঠে নেমে যাচ্ছে। কি সুন্দর একটা ফ্রক গায়ে দিয়েছে মঞ্জু! তখন হয়ত সূর্য অস্ত যাবার মুখে। মঞ্জুও সোজা বসে আছে ঘোড়ার পিঠে। ঘোড়ার লাগাম ওর হাতে। হাওয়ায় ওর মাথার দু এক গুচ্ছ চুল মুখে এসে উড়ে পড়ছে। আবার বাতাসে সে-সব তুলে নিয়ে যাচ্ছে। ও হাঁটু পর্যন্ত পরেছে মোজা। ওর দুটো হাত লম্বা হয়ে আছে সামনে। লাগামের একটা দিক সেই বুড়ো মানুষটার হাতে। বুড়ো মানুষটা মঞ্জুকে ঘোড়ায় চড়া শেখাচ্ছে।

ওরা কাছে যেতে সাহস পায়নি। কারণ বুড়ো মানুষটা চায়না কেউ কাছে আসুক। কাছে এলে ঘোড়াটা ক্ষেপে যেতে পারে। ক্ষেপে গেলে যা হয়—ঘোড়াটা তখন ছুটবে। ঘোড়াদের একটা রোগ থাকে। ঘোড়া একবার ছুটতে পাবলে থামতে চায় না।

ওরা তাই দূরে দূরে ঝোপ জঙ্গলের ভেতরে লুকিয়ে দেখত মঞ্জুকে। মঞ্জু যাচ্ছে ঘোড়ায় চড়ে। একবার টেরও পাচ্ছে না, পাশের ঝোপে ওদের কেউ রয়েছে। অবনী ছিল একগুঁয়ে। ওর রাগ ছিল ভীষণ। মঞ্জু ওর সঙ্গে কথা বলত না বলে আরও রাগ। সে ভেবে-ছিল, ঠিক সময়ে ঘোড়াব পায়ে ঝোপের ভেতর থেকে ঢিল ছুড়ে দেবে। মঞ্জুর ঘোড়ায় চড়া সে বের করে দেবে।

মঞ্জু যেতে যেতে বলল, রাস্তায় কোন অসুবিধা হয়নি তো?

—কতটুকু আর রাস্তা।

—বাড়ি থেকে কখন বের হয়েছ?

—এই তখন আটটা বাজে।

—তুমি এ-ঘরটায় থাকবে।

অজু বলল. এটাতো সেনদাদার ঘর।

—বাবা এ-ঘরে থাকতে ভালবাসতেন। পাশে বাথরুম। জল তোমার যখন যত খুশী খরচ করতে পারবে। জলের জন্য তোমার ভাবতে হবে না।

—তুমি বুঝি কলকাতার জলকষ্ট কাগজ-টাগজে পড়েছ।

মঞ্জু বলল, ঐ একটা হবে।

অজু বলল, পাশের ঘরগুলোতে কে থাকে ?

—কেউ না।

অজুর বলতে ইচ্ছা হল, তুমি কি একা! কিন্তু মঞ্জুর মুখের দিকে তাকিয়ে কিছু বলা যায় না। সে মঞ্জুর পা দেখতে পাচ্ছে এখন। সব সময় চোখ তুলে মঞ্জুর মুখের দিকে ঠিক তাকাতে পারছে না। ফলে মাঝে মাঝে জানালায় চোখ রাখলে দেখতে পাচ্ছে, সামনে মাঠ, তারপর বাগান, বাগানে অজস্র গাছ। কত সব গাছের নাম। অষুধের জন্য নানা জায়গা থেকে সেনদাদার পূর্বপুরুষরা এনে লাগিয়েছে। সেনদাদা নিজেও এনে লাগিয়েছেন কত গাছ-গাছালি। লতাপাতায় ভরা একটা বিশাল উদ্ভিদের রাজত্ব চারপাশে। লাল রঙের বাড়ি, সবুজ মাঠ, নীল রঙের ডাকঘর, এবং সাদা রঙের ডিসপেনসারি বাদে সবটাই যেন মঞ্জুর মতো একাকী এবং নির্জন। সে বসে বসে সব নানারকম পাখিদের ডাক শুনতে পাচ্ছে। কোনো কোনো ডাক সে চিনতে পারে, কোনোটা পারছে না। অথচ আগে তার এমন ছিল না।

অজুর দিকে পেছন ফিরে মঞ্জু দেয়ালের ছবিগুলো মুছে দিচ্ছে। ঘরটা ঠিক রোজ রোজ দেখা শোনা করা হয়ে উঠত না। অথবা এখন যে ঘর-দোর সাফ করে দিয়ে গেল, দেয়ালের ছবিগুলোর দিকে ওর নজর ছিল না। ছবিগুলো সবই লালবর্ণের নদী অথবা পাহাড়ের। একবার সেনদাদা কাশী মথুরা বৃন্দাবন সব ঘুরে আসার পথে লছমন-ঝোলার একটা ছবি সংগ্রহ করে এনেছিলেন। এ-ঘরে সে ছবিটা এখনও আছে। অনেক পুরোনো ছবি, এতদিনেও ছবিটা বিবর্ণ হয়নি, এবং এ-ঘরে কেবল অজুর এ-ছবিটার সঙ্গেই মোটামুটি শৈশবের একটা বন্ধুত্ব রয়ে গেছে। মঞ্জু, ছবিটা পরিষ্কার করে দিতে দিতে বলছিল —কেমন লাগছে তোমার! সব তুমি ঠিক ঠিক চিনতে পারছ ?

অজু বলল, এ গ্রামে আমরাই প্রথম দেশ ছেড়েছি মঞ্জু। আমার ধারণা ছিল, আমরা বাদে গ্রামের আর সব ঠিকঠাক আছে। এখন দেখছি কিচ্ছু নেই। চারপাশে কেবল আগাছা আর জঙ্গল।

মঞ্জু কোন উত্তর করল না। বলল, তুমি একটু বিশ্রাম কর। হাত পা ধুয়ে নাও। চান করেও নিতে পার। তোমার তোয়ালে সাবান সব ঠিকঠাক আছে। তুমি ইচ্ছে করলে সাঁতারও কাটতে পার। চারিদিকে এখন শুধু জল। আর একটু বাদে লণ্ঠন নিয়ে বের হবে জব্বার কাকা। ঝোপ-জঙ্গলে চাঁই পেতে আসবে। সকালে দেখতে পাবে, চাঁইএর ভিতর কত সব বড় বড় গলদা চিংড়ি, বেলে আর পাবদা মাছ।

এসব কথা মনে হলেই একটা শৈশবের স্মৃতি খেলা করে বেড়ায়। মঞ্জু কি বুঝতে পেরেছে অজু তাকে এখন প্রশ্ন করবে, তোমরা এখানে কেন থেকে গেলে ? আমাদের তো ধারণা, আমাদের পরে তোমরাই প্রথম গ্রাম ছেড়ে চলে যাওয়ার মানুষ। কিন্তু সেনদাদা কি পরে মনস্থির করতে পারেননি। সেনদাদা কি বাবার মতো ইনডিসিসানে ভুগছিলেন ?

অথবা তুমি কি এখন ভেবে ফেলেছ, আমি তোমাকে প্রশ্ন করব, তুমি মঞ্জু কেন এই দেশ ছেড়ে আগে আগে চলে গেলে না। কেন তুমি এমন রিস্ক নিয়ে থেকে গেলে ? এখানে কি এমন তোমার আকর্ষণ! এই গাছপালা, এই জলাশয়, এই দক্ষিণের খাল, এই বড় অর্জুন গাছ অথবা বেতের জঙ্গল। অথবা সামনের ধূসর মাঠ, যেখানে তুমি শৈশবে ঘোড়ায় চড়ে দিগন্তে হারিয়ে যেতে। আমরা তোমার পেছনে ছুটে ছুটে ক্লান্ত হতাম। কিসের আকর্ষণে থেকে গেলে।

আর তুমিতো জানো মঞ্জু সেনদাদার মতো সুপুরুষ এ-তল্লাটে কেউ ছিল না। তুমি সেনদাদার আশ্চর্য রঙ পেয়েছ। বৌদির মুখ ছিল প্রতিমার মতো। তুমি তা পেয়েছ। তোমার পা দেখলে আমার মনে আসে লক্ষ্মীপূজোর সময়ে আলপনার কথা। ধীর-স্থির। কত সংগোপনে এক একটা পায়ের ছাপ রেখে যাচ্ছ ধরণীতে। মনে হত তোমার পায়ে ধানের ছড়া চারপাশে জড়িয়ে আছে। হাঁটতে তোমার ভীষণ কষ্ট। হয়তো এটাই ছিল তোমার

হাঁটার কায়দা। আমরা তোমার হাঁটা দেখে সব সময় কেন জানি ভাবতাম বড় তুমি অহংকারী মেয়ে। তোমাকে জব্দ করার কি প্রাণান্ত চেষ্টা ছিল অবনীর।

—কি ব্যাপার তুমি চুপচাপ জানালায় দাঁড়িয়ে আছ? মঞ্জু লণ্ঠন টেবিলে রেখে দিতে দিতে বলল—স্নান সেরে নাও। কিছু খাবে।

অজু বলল, তুমি আমাকে এক কাপ চা করে দাও। এখন আর কিছু খাব না।

—হাত মুখ ধুয়ে নেবে না?

না মঞ্জু। চা না খেলে শরীর আমার ঠিক হবে না। শক্তি পাব না। চা তেষ্টা আমার ভীষণ।

—সে বলবে তো। বলে মঞ্জু নিজেই কেমন নিজের অপরাধ স্বীকার করার মতো বলল, কখন তোমাকে আমি চা করে দিতে পারতাম। তুমি কেন যে এত দেরিতে কথাটা বললে।

মঞ্জু চশমাটা খুলে কাচ মুছে নিল।

অজু বলল, তুমি আমাকে এখন দেখতে পাচ্ছ?

—আবছা মতো।

—হঠাৎ এ বয়সে চোখ এমন হল?

মঞ্জু কিছু বলল না। হাসল। তারপর ডাকল, কেয়া। কেয়া। শোনতো।

অজু বুঝতে পারল, তবে এ-বাড়িতে আরও একজন আছে। তার নাম কেয়া। আশ্চর্য মেয়েতো। কোন সাড়া শব্দ পাওয়া যায় না। অজু বলল, এই কেয়া কে হয় তোমার?

—কেউ না।

কেয়া এসে গেছে। সুতরাং কেয়া সম্পর্কে অজু আর কিছু বলতে পারল না। শ্যামলা রঙের বিশ বাইশ বছরের একটি মেয়ে। মোটামুটি লম্বাই বলা চলে। চুলের খোঁপা মাথার তালুতে উঁচু করে বেঁধেছে। নীল ডুরে শাড়ি পরনে। খালি

পা। পায়ে রূপোর পাতলা চেলি। হাতে সবুজ কাচের চুড়ি। চোখ দুটোতে খুব মায়া। অজুকে একবার দেখেই চোখ নামিয়ে নিল।

মঞ্জু বলল, রায়েদের বাড়ির ছেলে।

কেয়া আবার তাকিয়ে চোখ নামিয়ে নিল। কারণ রায়েদের ভিটায় এখন সব আগাছার জঙ্গল। বন ঝোপ, গন্ধপাদালের পাতায় নীল হয়ে আছে বাড়ির চারপাশটা। আর সব নানারকম কিংবদন্তি আছে, অথবা যে সব পূজা পার্বণে যাত্রাগান হত, রামায়ণ গান হত, কখনও কবির আসর বসত এমনিভাবে—তারপর সেই পূজা পার্বণ উপলক্ষে গ্রামে প্রায় মেলার মতো বসে যেত—সে সব গল্পও সে যে কতবার শুনেছে—শুনে শুনে রায়েদের ছেলে বলেই আবার যেন চোখ তুলে দেখা।

মঞ্জু বলল, খুব ভালো করে চা করতো। অজুর জন্য বেশ ভাল করে চা বানাবি।

—ক' কাপ করব ?

—তোর জন্য করতে পারিস। ওকে জিজ্ঞাসা করে দেখতে পারিস চা খাবে কিনা এখন, আমার জন্য করবি ? কর।

কেয়া বলল, কটা চিনির, কটা গুড়ের।

—দুটো দুটো।

অজু বলল, আর কেউ আছেন ?

—জব্বার কাকা আছে।

অজু ভুলেই গেছিল জব্বার কাকার কথা।

কেয়া ঠিক বুঝতে পারল না মঞ্জুদি আব্বার কথা কেন বললেন ! আব্বাতো চা খায় না। মঞ্জুদি এই অজুবাবুর কাছে কেন সেই মানুষটার কথা গোপন করতে চাইছে। মানুষটাকে কি করে নিরাপদ দূরত্বে পৌঁছে দেওয়া যায়, কিভাবে আর একটা কঠিন বিভীষিকা থেকে মানুষটাকে রক্ষা করা যায় এমন ভেবে ভেবেই তো শেষ পর্যন্ত স্থির করা গেল, অজুবাবুকে খবর দেয়া যাক।

মঞ্জুদির কাছে অজুবাবুর ঠিকানা এসে গেলেই চিঠি। তুমি আসবে। তোমাকে আমার খুব দরকার।

কেয়া চলে গেলে মঞ্জু পাশের একটা চেয়ারে বসল। সে অজুর দিকে তাকাল। এখানে এসে বোধ হয় অজু কেবল পুরোনো দিনের কথাই ভাবছে। কারণ ওর চোখ মুখ দেখে মঞ্জু টের পাচ্ছে, বার বার অজু অন্যমনস্ক হয়ে যাচ্ছে। কি একটা কথা বলবে বলে তাকাচ্ছে মঞ্জুর দিকে, আবার বোধ হয় সঙ্গে সঙ্গে ভুলে গিয়ে বোকা বনে যাচ্ছে। কিছু বলতে না পাবায় লজ্জায় আবার অন্যদিকে চোখ ফিরিয়ে নিয়েছে।

মঞ্জু বলল, কেমন লাগছে ?

—খুব ভাল। তারপর একটু থেমে অজু বলল, ন, দশমাস আগে স্বপ্নেও ভাবিনি এখানে আবার ফিরে আসতে পারব।

—তুমি খুব আবেগে ভুগছ অজু।

—আমি ঠিক জানি না, এটা আবেগ কি অন্য কিছু। তবে বিশ্বাস কর—এখানে আসার আগে বাড়িতে ঢুকেছিলাম। আমার সঙ্গে সবাই যেন কথা বলে উঠল। ছোট ঠাকুরদাকে দেখতে পেলাম। তিনি তেমনি মাটি থাবড়ে থাবড়ে দিচ্ছেন। বৃষ্টিতে সব মাটি ধুয়ে না যায় সেজন্য তিনি বসে আছেন জেগে। ঠাকুমার গলা শুনতে পেলাম—অজু বাইরে দাঁড়িও না। বৃষ্টি আসবে। বৃষ্টিতে ভিজলে জ্বর আসবে।

—আবার যেন কাকার গলা। তুই রক্তজবা এনেছিস ? কটা। কটা দিল ?

ওর বলাব ইচ্ছে হল, আবার কখনও মনে হয়েছে, এই ভিটায় আমাদের সেই প্রপিতামহীকে, যিনি বাঘের উপদ্রব থেকে বাঁচার জন্য বাড়িটার চারপাশে গড় কাটিয়েছিলেন। কত সব বিচিত্র স্বর সব কীটপতঙ্গের ভেতর বেঁচে থাকে মঞ্জু। আমরা টের পাই না। সেই সব স্বরই হয়তো, মানুষেরা যারা হারিয়ে যায়, তাদের। তারা নানাভাবে এই সব গাছপালার ভেতর বেঁচে থাকে। কিছুই বোধহয় শেষ হয়ে যায় না।

মঞ্জু এসব শুনে কেমন আগের মতোই সামান্য হাসল। ওর হাসি ঠোঁটের ভাঁজে আশ্চর্যভাবে খেলা করে বেড়ায়। মঞ্জু যেন জানে, এ-বয়সে কার কতটা হাসা উচিত! সে খুব পোড়খাওয়া মানুষের মতো অজুকে এখন লক্ষ্য করছে। বলছে, অজু তুমি আগের মতোই আছো। এতটুকু বদলাওনি।

অজু বলল, হবে।

—হবে না। আমি ঠিকই বলছি।

—কিন্তু তুমি যে অনেক বদলে গেছ।

—কতটা ?

—কতটা আমি ঠিক বলতে পারব না। তবু অনেকটা মনে হয়।

মঞ্জু বলল, হবে। না বদলালে বাঁচতে পারতাম না।

অজু ভাবল, সে কোথাও মঞ্জুকে দুঃখ দিয়ে বুঝি কথা বলছে। সে তাড়াতাড়ি যতটা সম্ভব গলা বদলে বলল, সবাই চলে গেল সীমানা পেরিয়ে, তুমি যে কি সাহসে থেকে গেলে।

—আমি যে যাইনি তোমাকে কে বলল।

—চারপাশটা এত বেশি ঠিক-ঠাক আছে যে মনেই হয়না তুমি চলে যেতে পার। চলে গেলে বাড়ি-ঘর এমন ঠিক থাকে না।

—যারা যায়নি, তাদের সবার ঠিকঠাক আছে ভাবছ ?

অজু বুঝল সে অন্ধকারে ঢিল ছুড়ছে। এভাবে অন্ধকারে ঢিল ছুড়ে কিছু বোঝা যাবে না। সে জানালায় দেখতে পেল গাছপালার ভেতর দিনের আলো একেবারেই মরে গেছে। বাইরের কিছুই আর স্পষ্ট নয়। সে এবার মুখোমুখি বসল।

মঞ্জু বলল, তোমার গরম লাগছে না ?

—না।

—তুমি জামা খুলে ফেলতে পার। বলে উঠে দাঁড়াল মঞ্জু।

অজু বলল, তোমাদের বাড়িতে ফ্যান আলো সব আছে অথচ জ্বলছে না। কলকাতার মতো লোডসেডিং এখানেও চলে।

—আজ মেরামত শেষ হবার কথা। পত্রিকায় যা খবর

শুনেছিলাম আজই এ-সব অঞ্চলে আলো পাওয়া যাবে। সেই কবে থেকে আমরা যে অন্ধকারে আছি।

—অজু বলল, আমি খুব অবাক, গ্রামের কোথাও আর নতুন বসতি হয়নি। ভেবেছিলাম, এখানে সেখানে বাড়ি উঠেছে। শুনেছিলাম, যারা ভারতবর্ষ থেকে এখানে রিফুজি হয়ে এসেছিল, তারা হিন্দুদের সব দখল করে নিয়েছে। কিন্তু এখন দেখছি সব আগাছা আর জঙ্গল। গ্রামটা এখন একটা ছোট-খাট ধ্বংসাবশেষের সামিল। তার ভেতর এই বাড়িটা আশ্চর্য রহস্যময় তাজা। সেন-দাদা তোমার জন্য বিজলির আলোর বন্দোবস্ত পর্যন্ত করে দিয়ে গেছেন।

মঞ্জু বলল, অবাক হবার কথা ঠিক কিন্তু তুমিতো জানো, অজু, বাবাকে এ-অঞ্চলের মানুষেরা কি ভালবাসতো। বাবাও এ-সব মানুষদের ফেলে শেষ পর্যন্ত যেতে পারলেন না। আমাদের সবুর-মিঞা স্টেট ইলেট্রিক্‌সিটির চেয়ারম্যান হয়ে একদিন বাবার সঙ্গে দেখা করতে এলেন। বললেন, সেনবাবু এ-গ্রামের ওপর দিয়ে বৈদ্যেরবাজারে তার যাচ্ছে। এখানে আমার মানুষেরা দুটো পোস্ট পুঁতে দিয়ে যাবে। আপনি এ-নিয়ে ঝামেলা করবেন না।

মঞ্জু আঁচলে মুখ মুছল। বোধ হয় সে ঘামছে। হ্যারিকেনের আলোতে ঠিক টের পাওয়া যাচ্ছে না। একটা আবছা মতো মুখ, এবং সেই গন্ধটা, সেই কবে থেকে মঞ্জু আশ্চর্য গন্ধের একটা সাবান ব্যবহার করে আসছে অথবা তেল বা স্নো পাউডার সে জানে না, যে গন্ধটা ভারি মিষ্টি, এবং এখনও অজু বসে থেকে তা টের পাচ্ছে। সে মঞ্জুর দিকে ভালভাবে তাকাতে পারছে না। মঞ্জু এখনও তার কোন পারিবারিক খবর নেয়নি। একটা দীর্ঘ জীবন দুজনের অজ্ঞাত-বাসে কেটে গেছে। ওরা সবাই আছে এক অন্ধকারে। কেউ জানে না, জীবনটা, অর্থাৎ শৈশবের পরে যে জীবন, অর্থাৎ যে তরুলতা সমারোহে বড় হতে হতে ডালপালা মেলে দেয়, কে কোথায় কতটা তেমন ডালপালা মেলে দিয়েছে। কে কতটা বড় ঝড়ের সামনে

পড়েছে ! কেবল দুজন এখন মুখোমুখি। চুপচাপ। বাইরে কীট-পতঙ্গের শব্দ। ঘোড়াটা হয়ত এখনও অর্জুন গাছের নিচে ঘাস খাচ্ছে, তার একটা খস খস শব্দ, এবং জলে নৌকা ভেসে গেলে লগির শব্দ।

কেয়া এ-সময়ে চা নিয়ে এল।

কেয়া পাশের টেবিলে চা রেখে আলোটা সামান্য বাড়িয়ে দিল। তারপর কেমন আশাভঙ্গের সামিল দেখালো ওকে। সে মঞ্জুকে বলছে, আজও হল না তবে।

মঞ্জু বুঝতে পারল কথাটা।—তাইতো দেখছি।

—কবে যে হবে!

মঞ্জু বলল, ইণ্ডিয়া থেকেতো অনেক এনজিনিয়ার এসেছে! ওরা তো খুব খাটছে।

কেয়া বলল, এটা তোমার মঞ্জু দি।

কেয়া অজুর দিকে তাকাল না। বা তাকাতে সাঁহস পেল না।

—এটা আপনাব। কিছু বিসকুট।

অজু বলল, বিসকুট তুলে নাও। নষ্ট হবে। চান না করে অন্য কিছু মুখে দিতে পারব না।

—খালি পেটে। মঞ্জু চশমার ভেতর দিয়ে দেখল অজুকে।

—খালি পেটে কোথায়। তুমি কি ভাবছ বাড়ি থেকে বের হয়ে কিছু খাইনি?

—খাবে না কেন? মঞ্জু চশমা খুলে সোজাসুজি দেখল।

অজু বলল, গুড়ের চা আমাকে দিলে কোন ক্ষতি হত না।

—তোমার অসুবিধা হত। অনেক কষ্টে নারাণগঞ্জ থেকে আনিয়েছি। পাওয়া যায় না। বাইরের লোক এলে দিই।

—আমাকে বাইরের লোক ভাবছ?

—তা ছাড়া কি। তুমি ভারতবর্ষের মানুষ। তোমার জাত এখন আলাদা।

অজু কোন কথা বলতে পারল না। সে চুপচাপ চা খেতে খেতে

কেবল মঞ্জুকে দেখল। মঞ্জুও ওকে চা খেতে খেতে চুরি করে চশমার ভেতর দিয়ে দেখছে। কেউ কোন আর কথা বলতে পারছে না।

স্নানের ঘরে মাত্র কেয়া হ্যারিকেনটা পৌঁছে দিয়েছে আর তখুনিই জব্বার ছুটে এসে খবর দিয়েছে, আলো জ্বলেছে।

মঞ্জু এ-ঘর ও-ঘর করে সুইচ টিপে দিচ্ছে। বারান্দার আলো জ্বেলে দিয়েছে। ডাকঘরের সামনে আলো জ্বলে গেল। অজু যখন স্নান সেরে পাটভাঙ্গা ধুতি, পাঞ্জাবি পরে এসে বারান্দায় ফ্যানের নিচে দাঁড়াল তখন মনে হল, একটা ভীষণ রূপকথার দেশ। ডিসপেন-সারির ওপরে সব পিটকিলা গাছেব ডাল। ডালে ছোট ছোট গোল গোল সব ফল। ডাকঘরের আলোতে সব ফল সাদা হয়ে গেছে। মঞ্জুর গলা পাওয়া যাচ্ছে। এখন মনে হচ্ছে পৃথিবীতে কি যে সুখ এই বেঁচে থাকা।

বাগানের গাছগুলো একেবারে স্বপ্নের মতো, জানলা দিয়ে সাদা আলো এসে গাছে গাছে পড়ছে। ও-পাশে বড় পুকুর। পুকুরের পাড়ে, পাড়ে রসুন গোটার গাছ, মনে হয় লম্বা গাছগুলো কখনও কখনও অন্ধকারে হেঁটে যায়। অজু এখানে দাঁড়িয়ে সেই সব গাছগুলোকে এখন হেঁটে যেতে দেখছে।

কেয়া বারান্দায় কটা নীল রঙের চেয়ার টেনে আনল। কারণ সে যেন জানে অজুবাবু এখানে এ-ভাবে একা দাঁড়িয়ে থাকলে মঞ্জুদি রাগ করবে। কেয়া চেয়ার পেতে দিয়ে বলল, বসুন।

—ও ঠিক আছে।

কেয়া বলল, একটু বাইরে ঘুরে ফিরে দেখবেন?

—এই রাতে।

—ভয় কি।

—সাপখোপের ভয় নেই! আগে তো আমাদের এখানে খুব সাপের উপদ্রব ছিল।

—এত আলোতে সাপ আসতে পারে!

অজু বলল, তা হয়তো পারে না। মঞ্জু কোথায়?

—মঞ্জুদি রাতের খাবার রান্না করছে।

অজু বারান্দা থেকে নেমে ডাকঘরের পাশ দিয়ে হাঁটতে থাকল। একটা টর্চ হলে হয়ত ভাল হত। কিন্তু কেয়া হয়তো শুনে আবার হেসে উঠবে। সে খুব সন্তর্পণে হাঁটছে। কেয়া পাশে পাশে থাকছে। এটা ওটা বলে দিচ্ছে। মঞ্জু এখন রান্নাঘরে। মঞ্জুকে দেখে ওর যতটা অবাক হবার কথা ছিল, সে যেন ততটা হয়নি। মঞ্জু তার যৌবন এখনও ভীষণভাবে ধরে রেখেছে। চোখ দেখলে বোঝা যায় সে বড় একটা ঝড়ের সামনে সোজা দাঁড়িয়েছিল। ভেঙ্গে পড়েনি। তার সরল ঋজু লম্বা শরীর সব অমানুষিকতাকে যেন হেলায় জয় করতে পারে। মঞ্জুকে দেখলে কেন জানি ভীষণ সমীহ করতে ইচ্ছে হয়। মঞ্জু আর আগের মঞ্জু নেই।

'অজু বলল, মঞ্জু তোমার কে হয় কেয়া?

-দিদি হয়।

--কেমন দিদি?

—কেমন দিদি আবার। নিজের দিদি।

—কিন্তু তোমাকে তো দেখিনি। সেনদাদা কি আবার বিয়ে করেছিলেন?

কেয়া আর অজু যাচ্ছে এখন ভেতর বাড়ির পাঁচিলের ও-পাশে। সে যেতে যেতে হা হা করে হেসে উঠেছিল। মঞ্জু মানুষের সাড়া পেয়ে বলেছিল—কে যায়?

কেয়া বলেছে, আমরা। অজুবাবুকে নিয়ে ঘুরছি।

মঞ্জুর আর সাড়া শব্দ নেই। যেন মঞ্জুর জানা, কেয়া অজুকে নিয়ে কতদূর যেতে পারে। এ-বাড়ির চারপাশে নানা জায়গায় আলোর ডুম জ্বালানো। এমন একটা অন্ধকার গ্রামে এই আলো না হলে যেন সেনদাদার মতো মানুষের পক্ষে শেষদিকে বাঁচা দায় হত। সবুর মিঞা বুঝেসুজেই এমন একটা এলাহিকাণ্ড এখানে করে দিয়ে গেছে।

কেয়া বলল, আপনি যেন কি বললেন?

—সেনদাদা কি আবার বিয়ে করেছিলেন ?

—না।

—তবে ?

—তবে কি বলব আপনাকে! আমি এখানেই আছি। বড় হয়েছি। আব্বা ছিল সেনবাবুব কাছের মানুষ। আব্বাকে সেনবাবু অষুধের নামটামও বলে গেছে অনেক। তারপর আরও কি বলতে গিয়ে কেন যে সে থেমে গেল!

—তুমি তবে এখানেই থাক।

—এখানেই আছি।

—কোন অসুবিধা হয় না ?

—কেন, কি অসুবিধাব কথা বলছেন।

—এই তোমাদের আচার অনুষ্ঠানের ব্যাপারে ?

—না। অসুবিধাতো একটা জায়গায়। ওটা না থাকলে তো বলেই কেয়া কেমন অন্য কথায় চলে এল, এবং সেই পুকুরের পাড়ে পাড়ে যে রসুন গোটার গাছ আছে, যে গাছগুলো খাড়া, যারা রাতে হেঁটে বেড়ায় বলে অজুর শৈশবের ধারণা, তাব ভেতর ঢুকে বলল, মঞ্জুদি এখানে এলেই কেবল আপনার কথা বলত। দাদাবাবুও তাই। বলত, অজুটা যে কোথায় আছে, কত বড় হয়েছে!

—দাদাবাবু মানে ?

—দাদাবাবু মানে দাদাবাবু।

অজু কিছুক্ষণ আর কথা বলল না। গাছের নিচে ঘুরে বেড়াতে তাব আব ভাল লাগছিল না। পাশে খাল। খালেব ওপারে পেরী ঘোষের বাড়ি। অন্ধকারে বাড়ির গাছপালা পর্যন্ত স্পষ্ট নয়।

অজু বলল, পেরী ঘোষের ছেলেরা আছে ?

—কেউ নেই। পেরী ঘোষের ছোট ভাই হাবুল ঘোষ চাব পাঁচ বছর আগে চলে গেল। এখন বাড়িটা ছাড়াবাড়ি।

—ও-পাশে একটা তেঁতুলের বন ছিল। সেটা আছে ?

—ওটা আছে।

—তারপর আমবাগান।

—আমবাগানে কিছু রিফুজি আছে।

—করিম মিঞার দরগাতে আমরা মধু চুরি করতে যেতাম।

কেয়া বলল, চলুন বারান্দায় গিয়ে বসি।

—তোমার ভয় করছে।

কেয়া হাসল। ভারি মিষ্টি হাসি। সে সেই ডুরে শাড়িটাই পরে আছে। পায়ে সেই নীল রঙের স্ট্র্যাপ দেওয়া কাঠের খড়ম এবং বড় পরিচ্ছন্ন থাকতে ভালবাসে কেয়া। আর ওর গোড়ালি অজু দেখতে পাচ্ছে। খুব মসৃণ গোড়ালি—লাল আভা। কেয়াকে মাঝে মাঝে খুব বিষণ্ণ লাগে। কথা বলতে বলতে কেয়া মাঝে মাঝে অন্যমনস্ক হয়ে যায়।

অজু ফেরার সময় বলল, দাদাবাবু এখানেই থাকতেন?

—তবে কোথায় থাকবে? ওইতো ছিল সব। সেনবাবু মারা যাবার আগে কবিরাজীবিদ্যাটা ওকে দিয়ে গেছিলেন।

—তাহলে দাদাবাবু এখানে সেনবাবুর মতো ঘোড়ায় চড়ে অনেক দূরে চলে যেত।

—না গেলে চলবে কি করে বলুন। এমন বিশ্বাস তো আমাদের আর কারো ওপরে নেই।

কেয়ার চুল উঁচু করে তেমনি খোঁপা বাঁধা। সে গাছের ছায়ায় অথবা বাঁকে বাঁকে আশ্চর্যভাবে ঢুকে যাচ্ছে, বের হয়ে আসছে। অজুর অভ্যাস নেই বলে বেশ দেরি হচ্ছে বের হয়ে আসতে। ঝাফরি কাটা আলো ওদের ওপর ছড়িয়ে যাচ্ছিল। মাছ ভাজার গন্ধ আসছে। মঞ্জু অতিথির জন্য নানাভাবে খাবার তৈরি করছে। মুগ ডাল রান্না করছে মঞ্জু, সে তাও টের পাচ্ছে। মঞ্জু বেগুন ভাজছে। সব গন্ধ চারপাশে সঁ সঁ করতে থাকলে অজু বলল, কেয়া তুমি স্কুলে পড়েছ?

কেয়া বলল, অজুদা আপনার কি ধারণা?

— আমাদের সময় এখানে তোমাদের স্কুলে যাওয়া বারণ ছিল।

— সব পাল্টে গেছে।

—তোমার নাম এমন সুন্দর হবে জানতাম না। আমি তোমাকে জব্বার কাকার মেয়ে বলে কেন যে এখনও ভাবতে পারছি না।

কেয়া লাফ দিয়ে বারান্দায় উঠে গেল। বেশ ব্যালেন্স রেখে সে সোজা দাঁড়িয়ে গেল। কিন্তু অজুর সাহস হল না। কেয়া তারপর অজুর দিকে তাকাল। আলোর মুখোমুখি অজু, কেয়ার পেছনে আলো। একজনের মুখ আলোর দিকে, অন্যজনের মুখ অন্ধকারের দিকে। কেয়া বলল, আমার মুখটা খুব স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছেন ?

—না।

—কেন নয় ?

—ঠিক আলো পড়ছে না বলে।

—আলো পড়লে বিশ্বাস করতে কষ্ট হয় না আমি কেয়া ?

—আমি ঠিক বুঝতে পারছি না কেয়া। তুমি আমাকে কি বলবে বুঝতে পারছি না।

—আমি জব্বার মিঞার মেয়ে ভাবতে আপনার কেন কষ্ট হয় বলুন।

অজু খুব লজ্জায় পড়ে গেল। কেন যে বিশ্বাস করে সে মনের কথাটা খুলে বলতে গেল। অজু তাড়াতাড়ি সংশোধন করার জন্য বলল, এমনি ঠাট্টা করছিলাম।

কেয়া বলল, অজুদা ভয় পেয়ে গেলেন।

—ভয় পাব কেন ?

— ভয় না পেলে আবার আর একটা মিথ্যা কথা বলতে যাচ্ছেন কেন ?

অজু বুঝতে পারল সে কেয়াকে যতটা সহজ সাধারণ গোবেচেরা ভেবেছিল—কেয়া আদৌ তা নয়। নানাভাবে কেয়া বুঝে ফেলেছে অজু মনের কথা ফের গোপন করতে যাচ্ছে। জব্বার কাকার মেয়ের এটা বিশ্বাস না হবারই কথা। প্রথমত তার নাম, তার চোখ মুখ

আচরণ, এতদিন যে একটা বিভেদ গড়ে রাখা হয়েছিল, চোখে সুর্মা টেনে দিলে যা হয়ে থাকে, অথবা কাজল—একটা আলগা ভাব, অথবা অবহেলা, সেটা অজু এখনও কাটিয়ে উঠতে পারেনি। সে বলল, তুমি মনে কিছু করনা কেয়া।

কেয়া চেয়ারটা এগিয়ে দিয়ে বলল, বসুন। আপনি ঘেমে গেছেন।

অজু বলল, আমি ঘেমে গেছি! সে কপালে হাত দিল।

কেয়া জোরে ফ্যান চালিয়ে দেবার সময় বলল, মঞ্জুদি কিন্তু আমাকে একদিনও বলেনি আপনি আসবেন।

—আমি নিজেও জানি না, আমি আসব।

—তবে এলেন যে।

—চিঠিটা আমাকে কেয়া কেন যে এত বেশি করে শৈশবের কথা মনে করিয়ে দিল!

তখন মঞ্জু আসছে হাতে প্লেট নিয়ে।—মাছ ভাজা খাও। আর গল্প কর। মঞ্জু দুটো প্লেটে বড় বড় ইলিশ মাছ ভাজা রেখে দিল। তারপর ডাকল, হাবলি, জল দে এখানে। সে কেয়ার দিকে তাকিয়ে বলল, তুইতো একটু জল নিয়ে আসতে পারিস।

মঞ্জু চলে গেলে অজু বলল, তোমাদের দেখে মনেই হয় না, ন'দশ মাস আগে তোমরা কি ভীষণ একটা দুঃসময়ের ভেতর ছিলে।

কেয়ার হাসিখুশী মুখ সহসা অন্ধকার হয়ে গেল। সে মাথা নিচু করে বসে থাকল। ধীরে ধীরে বলল, যা হয়েছে, আমরা খুব তাড়াতাড়ি তা ভুলে যেতে চাইছি অজুদা। তারপর সে কি ভাবল, ভেবে অজুর মুখ, সামান্য চোখ তুলে দেখল।—অজুদা আপনি কখনও ন দশমাস আগে কি ঘটেছে এসব মঞ্জুদির কাছে জানতে চাইবেন না। কখ্‌খনও বলবেন না, মঞ্জু তুমি তখন কিভাবে বেঁচে ছিলে। বললে মঞ্জুদি আবার চুপচাপ জানালায় দাঁড়িয়ে থাকবে।

এখন চারপাশে কি কঠিন নির্জনতা! কোথাও কোন শব্দ নেই। ডিসপেনসারি ঘরের জানালা খোলা। জব্বার কাকা একটা কাগজে

ছোট ছোট পিল তৈরি করছেন। দু আঙ্গুলে গোল গোল করে ওষুধের বড়ি সাজিয়ে যাচ্ছেন। অর্জুন গাছের নিচে তেমনি ঘোড়াটা। আর একটু রাত হলে ঘোড়াটাকে এনে বোধ হয় জব্বার কাকা আস্তাবলে বেঁধে রাখবেন। তারপর বাগান, গাছগাছালি পার হয়ে বর্ষার জল, কিছু কীটপতঙ্গের আওয়াজ। অজু ইজিচেয়ারে হেলান দিয়ে আছে। সামনে বেতের নীল রঙের চেয়ার। পাশে কেয়া কেমন অপরিচিত। যেন কোন স্টেশনে বসে রয়েছে। ট্রেন এলেই যে যার জায়গায় উঠে গিয়ে বসবে।

অজুর আর সাহস হল না কিছু জানতে। দাদাবাবুর কি নাম, সে কোথায়, মঞ্জুর ছেলেপুলেরা? বাড়িতে কোন শিশুরই সাড়া শব্দ নেই। মঞ্জুর এখন যৌবন, সব মিলে সে ভয়ে ভয়ে কেবল বলল, এদিকে খানসৈন্যরা এসেছিল।

—কাল দেখাব।

—কি দেখাবে? অজু ভীষণ অবাক হল কেয়ার কথায়।

—ওদের এখানে একটা কোম্পানি মজুদ ছিল।

—কোন দিকটায়?

—গোপের বাগ উঠে যেতে যে বড় আমবাগানটা ছিল তার ভেতরে।

—তবে তো বেশি দূর না।

—কে বলেছে দূর।

—তুমি এখানেই ছিলে!

—কোথায় যাব।

—অনেকেই তো পালিয়ে ইজ্জত বাঁচিয়েছে।

—সবাই তা পারেনি অজুদা।

অজুর বলতে ইচ্ছে হল, তোমরা, তোমরা পেরেছ। কিন্তু সে বলতে গিয়ে কি এক অসীম কুণ্ঠায় চুপ করে গেল। সে বোকার মতো কেয়ার দিকে তাকিয়ে থাকল শুধু।

এ-ভাবে বেশ সময় কেটে গেল। ওরা কেউ কথা বলছে না।

দুজনে চুপচাপ মুখোমুখি বসে আছে। শৈশবে সে এ-গ্রামটায় এমন সময়ে কান পাতলে শুনতে পেত চারপাশের সব বাড়ি থেকে ছেলেদের পড়ার শব্দ। খোকাদা খুব জোরে জোরে পড়ত। স্বরাজেরও গলা ছেড়ে পড়ার অভ্যাস ছিল। দক্ষিণের বাড়িতে খোকাদার ভাই-বোনেরা মিলে একসঙ্গে পড়ত বলে একটা হাটের মতো অবস্থা ছিল। এ-সময়টাতে ধনকাকা ঠাকুর ঘরে থাকতেন। তার অনবরত ঘণ্টা নাড়ার শব্দ, অনেক দূর থেকে শোনা যেত। ওরাও তখন পড়ত দুলে দুলে। বারান্দায় তক্তপোষে বসে চাব পাঁচ ভাই বোন খুব চেঁচামেচি করে পড়তে ভালবাসত।

মঞ্জু রান্নার ফাঁকে ফাঁকেই চলে আসছে। সে মাঝে মাঝে নানারকম ঠাট্টা তামাসা করতেও ভালবাসছে। এই যেমন একবার বলে গেল, কেয়াকে তোমার কেমন লাগে।

—খুব ভাল।

—ওর একটা ভাল বিয়ে দিয়ে দাও তো।

—বললেই দিতে পারি।

কেয়া তখন ধ্যাৎ করে উঠে গেল। মঞ্জু বলল, দেখলে কেমন রাগ মেয়ের।

অজু বলল, কেয়াকে দেখে বোঝাই যায় না জব্বাব কাকার মেয়ে।

মঞ্জু বলল. না বোঝার কি আছে। ও শুনেছি বয়সকালে বেশ সুপুরুষ ছিল। কেয়া তার মেয়ে।

—আচ্ছা ওর নামতো মেহেরুন্নিসা হওয়া উচিত ছিল।

—ওর এমন একটা নাম আছে। আমরা ওকে কেয়া বলে ডাকি।

অজু খুব দার্শনিকের গলায় বলল, কেন যে আমরা সব ভিন্নদেশের মানুষ হয়ে গেলাম। কেয়াকে দেখে আমার তো এখানেই থেকে যেতে ইচ্ছা হচ্ছে।

মঞ্জু বলল, কাকীমাকে লিখে দেব এসব কথা।

—তা লিখে দিও। চিঠিটা আমার ছোকরা চাকরের হাতে পড়বে। সে চিঠিটা পড়তে পড়তে একচোট হেসে নেবে।

মঞ্জু বলল, তোমার কিছুই আমার এখনও জানা হল না। তাড়াতাড়ি খেয়ে নাও। কত কথা যে তোমাকে বলব বলে বসে আছি। কেয়া এসে বলল, মঞ্জুদি ডালে একটু জল দিতে হবে।

—যাচ্ছি।

অজু বলল, তুমি দিয়ে দিতে পারছ না।

মঞ্জু বলল, ও দিলে তুমি খাবে।

—খাব না কেন! তুমি দিলে খেতে পারি, ও দিলে খেতে পারব না কেন।

—কিন্তু আমি যে এখনও সংস্কার কাটিয়ে উঠতে পারিনি।

—বলছ কি। এত সব ঘটে যাবার পরও।

মঞ্জু কেমন অন্যমনস্ক হয়ে গেল। সে বলল, কেয়া আমি আসছিরে।

মঞ্জু চলে গেলে কেয়া বলল, এটা আপনি কি করলেন অজুদা!

—কি করলাম!

—কি করলেন বুঝতে পারছেন না।

—না।

—মঞ্জুদির মুখটা দেখলেন না?

—দেখলাম তো।

—কেমন উদাসীন হয়ে গেল না চোখ মুখ।

—হ্যাঁ তা কেমন হয়েছে।

—কেন যে বলতে যান!

অজুর মনে হল সত্যি সে বলে ফেলে ভাল করেনি। এত সব ঘটে যাবার পর, কি এত সব ঘটেছে, বিশেষ করে মঞ্জুর জীবনে, সেতো কিছুই জানে না। এখনও চারপাশে নানা রকম রহস্য শুধু, যেমন জব্বার কাকার জোর-জার করে টাকা রেখে দেওয়া, যেমন চারপাশে আর কোন লোকালয় নেই। এত বড় গ্রামে ভারি নির্জন এই বাড়িটা চেঁচামেচি করলে কেউ শুনতে পায় না, কেবল পাশের খাল দিয়ে কখনও মানুষেরা নৌকা বেয়ে চলে যায়। আর কি আছে

এখন এ-গ্রামে বসবাস করার মতো! অথচ মঞ্জু এখানেই থেকে গেল। ওদেরতো ঢাকা শহরে একটা বাড়ি ছিল। ওর জ্যাঠামশাই অমূল্য সেন সেখানে থাকত। লক্ষ্মীবাজারে ওদের বড় একটা কবিরাজীর দোকান ছিল। মঞ্জু তো ওদের সঙ্গে সীমানা পার হয়ে চলে যেতে পারত।

এমন সব ভাবতে ভাবতে ওর কেমন রাগ বেড়ে গেল। মঞ্জু ছেলেবেলাতেই ছিল ভীষণ একগুঁয়ে। সে জানত না, ওর ভেতরে কি যে আশ্চর্য আকর্ষণ আছে! গ্রামদেশে এমন রূপবতী মেয়ের বড় হওয়া ভীষণ ভয়ের। তবু সেনদাদা যেহেতু ছিলেন এ-অঞ্চলের গণ্যমান্য মানুষ সেজন্য বোধ হয় কেউ মেয়েটার বড়ো হওয়া নিয়ে ঘোড়ায় চড়া নিয়ে ছোট কথা বলতে সাহস পেত না। এবং এ-মেয়ে ঘোড়ায় চড়া না শিখলে যেন মঞ্জু সেন হত না।

—আমাকে কেমন লাগছে রে অজু। মঞ্জু ঘোড়ায় চড়ে বলত।

—ঝানসির রাণী লক্ষ্মীবাই।

তখন অজুরা ছোট ছিল আর ছিল কল্পনায় আজাদ হিন্দ ফৌজের বীর জোওয়ান। মঞ্জুকে রাণী লক্ষ্মীবাই ভাবতে ওদের ভীষণ ভাল লাগত। কল্পনায়, অজু, অবনী রসো সবাই ছিল এক একজন বীর জওয়ান! মঞ্জু আদেশ করলেই যুদ্ধক্ষেত্রে ঝাঁপিয়ে পড়ত। মঞ্জুকে পিঠে নিয়ে ঘোড়াটা কদম দিলে ওরা পিছু পিছু মঞ্জুকে ধরার জন্য ছুটত! কিন্তু ঘোড়াটা ছিল ভীষণ বজ্জাত। সে বুঝতে পারত বুঝি অজুরা কেন তার পেছনে পেছনে আসছে।

মঞ্জু প্রথম কদম দিত। মঞ্জুর ববকাটা চুল উড়ত বাতাসে। ফ্রক উড়ত বাতাসে। ওর হাত থাকত সামনে। সে লাগামে কি যে সুন্দরভাবে হাত রেখে দিত। আর জিনে পা রেখে পেটে খোঁচা মারলে ঘোড়াটা মাঠের ওপর দিয়ে দ্রুত ছুটত। ওটা কি ঘোড়াটার বদজাতি ছিল, না মঞ্জুর ওরা সে-বয়সে বুঝতে পারত না। শুধু দেখতে পেত, পূব পাড়ার মাঠ পার হয়ে দরগার বড় শিমূল গাছটা পার হয়ে ঘোড়াটা উত্তরে বায়দীর দিকে যাচ্ছে। ওরা তখন

কে কোথায় ছিটকে পড়ে থাকল মঞ্জু যদি একবার ঘাড় ফিরিয়ে দেখত।

এমন হলেই মঞ্জুর সঙ্গে ওদের ভীষণ গোলমাল বেঁধে যেত। বিশেষ করে অবনীর। সে বলত, দাঁড়া আমি দেখাচ্ছি মজা।

অবনী এমন বললেই, অজুর ভীষণ ভয় করত। অবনী একটা কিছু করে ফেলতে পারে। কিন্তু সে একটা কিছু করে ফেললেই সঙ্গে অজুর নাম থাকবে। সেনদাদা যদি কাকাকে সব বলে দেয় তবে, কি যে হবে না! তখন ছিল অজুর যত অনুনয় অবনীকে। ঠিক আছে, আমি বলব মঞ্জুকে, মঞ্জু তুই আর একবার কথা বল অবনীর সঙ্গে। অবনী ভীষণ রাগ করেছে।

অবনী বলত, দেব একখানা ঝেড়ে। ঘোড়ায় চড়া বের করে দেব।

অজু জানে এটা অবনী পারে। অনায়াসে পারে। একটা কিছু করে দিয়ে সে বেশ ক'দিন উধাও হয়েও থাকতে পারে। ওর বাবা ওর সম্পর্কে যেন জেনে ফেলেছিল ওটার কিছু হবে না। কাজেই কোথাও চলে গেলে আবার যথাসময়ে ফিরে আসবে ওর বাবা তা জানত। অজুরা অবনী ফিরে এলে বলত কোথায় ছিলিরে?

—মামাবাড়ি গেছিলাম।

—তুই একা চিনে যেতে পারিস?

—পারব না কেন, এই তো সনকান্দা পার হয়ে হরিহরদি, তার-পর দুটো গ্রাম, তারপর নদী, তারপর একটা বড় মসজিদ বিশ্বাসদের, ওটা পার হলেই বড় একটা মাঠ। মাঠে পড়লেই যা আমার ভয়। চোখ বুজে তখন ছুটতে থাকি। আমি একবার নিশির পাল্লায় সেখানে পড়ে গেছিলাম। তারপর নিশি সম্পর্কে বিস্তারিত খবর, সুতরাং অবনী অজুদের কাছে নানাকারণে হিরো ছিল। সে একটা আস্ত নিশিকে বোকা বানিয়ে ওর গলা থেকে মালা তাবিজ চুরি করে চলে এসেছিল পর্যন্ত!

—নিশিতো ভূতের সামিল, অজুরা এমন বলত।

—ভূতেরা বুঝি গলায় মালা তাবিজ পরে না। কি যে আহাম্মক না তোরা।

এরপর অজুদের আর কোন কথা বলার থাকত না। তা ভূততো সব করতে পারে। সামান্য মালা তাবিজ পরতে পারে না সেটা কি করে হবে !

এভাবে অবনী ছিল কড়া মেজাজের। এক রোখা। রোখ চেপে গেলে সে ঘোড়াটার পেছনে খোঁচা মেরে দিত। তারপর ছুটে পালাত। কিন্তু ঘোড়াটা ছিল বেশ। ছোট ঘোড়া বলেই যেন কথা শোনে। মঞ্জুর বাবা শহরে গেলে ঘোড়াটা ছাড়া থাকত। ওব দুপায়ে থাকত দড়ি বাঁধা। সে বেশি দূর যেতে পারত না। মঞ্জু অলিমদ্দিকে বলত দড়ি খুলে দিতে। তারপর বলত, জিন পরিয়ে দিতে। মঞ্জু ঘোড়ায় চড়লে ওরা ঠিক টের পেয়ে যেত —সেনেদের বাড়ির মেয়েটা এখন মাঠের ভেতর ঘোড়ায় চড়ে বেড়াচ্ছে। অজুরা কখনও কখনও তখন নানাবর্ণের পাতার ভেতর অথবা ঝোপজঙ্গলে লুকিয়ে থেকে মঞ্জুকে দেখত। গাছপাতার ভেতর থেকে ঘোড়ার ওপরে মঞ্জুকে দেখতে তখন বড় ভাল লাগত।

কেয়া বলল, কি ভাবছেন ?

—পুরোনো কথা।

—পুরোনো কথা না বলে বলুন শৈশবের কথা।

—তোমার শৈশব মনে পড়ে না কেয়া ?

—কার না মনে পড়ে !

—ভারি ইনটারেসটিঙ না !

—ঠিক জানি না।

—আমার কিন্তু ভীষণ ভাল লাগে ভাবতে। যেমন ধর এই যে আজকের মঞ্জু, ওকে আমি কিছুতেই বিশ্বাস করতে পারছি না। আমার বার বার শৈশবের মঞ্জুর কথা মনে আসছে। ও যখন ঘোড়ায় চড়ে যেত কি যে বিউটিফুল লাগত তখন !

কেয়া বলল, উঠোন খাবার রেডি। মঞ্জুদিকে বলতে হবে, কি যে বিউটিফুল লাগত তখন।

ওরা দুজনেই এবার হেসে উঠল। এবার মনে হল এরা এ অল্প-সময়েই বড় কাছাকাছি এসে গেছে। কেয়ার কাছে অজুবাবু যেন কতকালের চেনা। চটপটে কেয়া অনেকদিন পর অজুবাবুর সামনে হাসতে পারছে।

মঞ্জু বলল, এটা আমার ঘর।

অজু বলল, এ-ঘরে আগে অনজু পিসি থাকত।

—তার আগে থাকত মা। মা মরে যাবার পর এ-ঘরে কেউ থাকত না। অনজুদি শহর থেকে এলে থাকত।

অজু বুলল, কেয়া কোন ঘরটায় থাকে!

—পাশের ঘরটাতে।

—তোমার ঘব পার হয়ে যেতে হয়!

—ও-ঘরে আর একজন থাকে।

অজু বুঝতে পারছে না সে কে?

মঞ্জু বলল, এস দেখবে।

অজু মঞ্জুর পেছনে পেছনে ঘরে ঢুকে গেল। কেয়া নেই। কিন্তু সে অবাক, আট দশ বছরের একটি ছেলে চুপচাপ শুয়ে আছে। চোখ দুটো ভীষণ তাজা, কিন্তু বড় রুগ্ন।

মঞ্জু বলল, আমার একমাত্র ছেলে নীলু।

অজু ওর পাশে বসে ছেলেটার কপালে হাত রাখল। মঞ্জুকে ওলটে পেয়েছে, যেন ছোট মঞ্জু। ওর কি অসুখ ইচ্ছে ছিল বলবে, কিন্তু ঠিক নীলুর সামনে এ-কথা বলা হয়ত ঠিক হবে না।

মঞ্জু নীলুর মাথায় হাত রেখে বলল, তোমার অজু দাদা। আমি ওকে বলেছি, অজু কাকাকে চিঠি দিয়েছি, দেখবে সে ঠিক আসবে।

অজু এই ছেলেটির দিকে বেশি সময় তাকিয়ে থাকতে পারল না। চুল বেশ বড় হয়ে গেছে। মাথাটা একরাশ চুলে ঢাকা। অজুর বলতে ইচ্ছে হল, তোমার মানুষটির কি খবর! কিন্তু কপাল এবং

সিঁথি দেখে সে সাহস পাচ্ছে না। ছেলেটির চোখে আশ্চর্য মায়া। যেন বেশি সময় তাকিয়ে থাকলেই সে সেই আশ্চর্য মায়ায় আটকা পড়ে যাবে।

মঞ্জু জানালার পাশে দাঁড়িয়ে বলল, আমার এখন এই একমাত্র সম্বল অজুকাকা।

মঞ্জু এ-ভাবে অজুকাকা ডাকলে অজু ভয় পায়। যখন খুব স্বাভাবিক থাকে তখন মঞ্জু অজুকে অজু বলেই ডাকে। অজুকাকা বললেই যেন মনে হয় মঞ্জু অজুর কাছে ভীষণ প্রত্যাশা নিয়ে বসে আছে। ঠিক ছেলেবেলার মতো। অজুকে একদিন সে বলেছিল, তুমি আমার অজুকাকা। তুমি অবনীকে বলে দাও না, ওকে আমি ভালবাসি না।

অজুর কি ভয় সে কথাটা বলতে! আমি কি করে বলি! আমি বললে, সে ভাববে আমার কোন স্বার্থ আছে মঞ্জু। তুমিই বলে দিও। আমি বরং অবনীকে ডেকে নিয়ে আসব। আমরা বরং রসুন গোটায় গাছেব নীচে দাঁড়িয়ে থাকব। তুমি চুপি চুপি এসে অবনীকে বলে যেও।

মঞ্জু সব সময় সোজাসুজি কথা বলতে ভালবাসত। ভাল বাসা-বাসির সঠিক মানে অজুর তখন জানা ছিল না। অবনীকে বলে দিও, আমি ওকে ভালবাসি না মানে, ওকে আমার পছন্দ নয়। ও খুব একগুঁয়ে। মানুষেব সম্মান রাখতে সে জানে না। মঞ্জু এমন বলতে চাইত।

ঘরে সামান্য আলো। খুব কম পাওয়ারের আলো জ্বালানো। বোধ হয় খুব বেশি আলো ছেলেটা সহ্য করতে পারে না। অজু একটা চেয়ারে বসে আছে এখন। সে এমন এক রুগ্ন বালকের সঙ্গে কি যে কথা বলবে। বিশেষ করে মানুষের বিপদ দেখলে সে ঘাবড়ে যায়। মঞ্জু নানারকম সমস্যায় পড়ে তাকে আসতে লিখেছে, এটা একটা আনন্দের বেড়ানো যে নয়—সারা বিকেল এখানে থেকে এবং কেয়ার সঙ্গে কথা বলেই বুঝতে পেরেছে।

তা ছাড়া অজু পত্র-পত্রিকায় যা পড়েছে, তাতে করে মঞ্জুর কিছু একটা হবার কথা স্বাভাবিক। না হওয়াই অস্বাভাবিক। সে সেজন্য খুব জোর দিয়ে ওকে কিছু জিজ্ঞাসা করতে পারছে না। সে বরং নীলুকেই যেন প্রশ্ন করতে পারে, নীলু তুমি কেমন আছ ?

—আমি ভাল আছি।

মঞ্জু পাশে দাঁড়িয়ে ম্লান হাসল।

অজু টের পেয়েছে, মঞ্জুর মুখের হাসিটুকু ভীষণ হতাশার। 'আমি ভাল আছি' মঞ্জুকে খুব কষ্ট দিচ্ছে ভেতরে ভেতরে। নীলু যে আর ভাল হবে না ওটা মঞ্জুর হাসিটুকু দেখলেই বোঝা যায়। তা ছাড়া অজু বুঝতে পারল না মঞ্জু একে একে সব দেখাচ্ছে কেন। এক সঙ্গে সে কিছু বলছে না। দেখাচ্ছে না।

সে যেন বলতে চাইল, মঞ্জু তুমি আমাকে আর কি কি দেখাবে বলে ভেবে রেখেছ।

মঞ্জু বলল, এই নীলু আমাকে বাঁচিয়ে রেখেছে। ওর জন্য কিছু একটা আমি করে ফেলতে পারছি না।

ঠিক নীলুর সামনে এমন কথা অজুর ভাল লাগছিল না। এমন কথা বলার পরই বোধ হয় মঞ্জু কাঁদে। কারণ অজু দেখতে পাচ্ছে নীলু মুখ ঘুরিয়ে মাকে দেখার চেষ্টা করছে, মা এ-সব বলে আবার চুপচাপ দাঁড়িয়ে আছে কিনা সে ঘাড় ঘুরিয়ে দেখার চেষ্টা করছে।

অজু বলল, নীলু তোমার খাওয়া হয়েছে ?

নীলু মাথা নেড়ে বলল, হ্যাঁ।

—তুমি কি খেতে ভালবাস ?

—আমার বেতের ডগা সেদ্ধ খেতে ভাল লাগে।

অজু একটু বিস্মিত হল। বেতের ডগা সেদ্ধ খেতে ভীষণ ভাল। সুগন্ধ আতপ চাল, একটু ঘি, একটু কাঁচা লংকার ঘ্রাণ আর বেতের ডগা সেদ্ধ, ঠাকুমা যখন উপুসের দিনে খেতেন তখন অজুরা চার পাঁচ ভাই গোল হয়ে দরজার সামনে দাঁড়িয়ে থাকত—ঠাকুমা কখন

ডাকবে। কখন বড় দলা, একটু নরম বেতের ডগা সেদ্ধ হাতে হাতে দেবে। নীলুর এ-সব ভাল লাগে। খুব সহজ এ-সব এখানে পাওয়া। এমন একটা জিনিস সে খেতে চাইবে যা অজুকে ভীষণ আয়াসে সংগ্রহ করতে হবে। সে বলল, আর কিছু খেতে ইচ্ছে হয় না ?

নীলু পাশ ফিরে শোল। খুব ধীরে যেন কত কষ্ট হচ্ছে, এমন কষ্ট দেখে ওকে সাহায্য করতে গেলে মঞ্জু বাধা দিল।—ওকেই পাশ ফিরতে দাও।

অজু আর সাহার্য্য করল না। নীলু কোনরকমে পাশ ফিরে বলল, আমার ভীষণ মিষ্টি খেতে ভাল লাগে। মা দেয় না। তুমি আমাকে এনে দেবে ?

অজু বলল, দেব। তুমি ভাল হলেই এনে দেব।

—আমি আর ভাল হব না অজুদাদা।

—কেন হবে না। কলকাতায় এসব অসুখ অসুখই না। সেখানে কত বড় বড় ডাক্তার আছে। দেখবে সেখানে গেলেই তুমি ভাল হয়ে যাবে। বলেই অজু নিজের কাছে ভীষণ অপরাধী ভেবে ফেলল। আসলে সে এ-ভাবে কথা বলছে কেন। মঞ্জুতো তাকে এ-ভাবে কোন কথা বলেনি। সে বলল, তোমার কিছুই হয়নি নীলু। কাল দ্যাখো আমি তুমি বারান্দায় বসে গল্প করব।

মঞ্জু বলল, এস।

অজু উঠে দাঁড়াল।—আমি যাচ্ছি নীলু। অনেক রাত হয়েছে।

—আর একটু বোস না।

—কাল সকালে আবার তোমার ঘরে আসব।

—মা তুমি একটু বোস।

—তোমার অজুদাদার শোবার ব্যবস্থা করে আসছি।

—আমি জানি তুমি আর আসবে না।

—কেন আসব না ?

—তুমি মা আমার ঘরে আসতে চাও না।

—কি যে তুই বলিস নীলু!

—আমি ঠিক বলছি অজু দাদা। মা এ-ঘরে ঢুকতেই ভয় পায়। কেয়া মাসিকে আমার ঘরে রেখে দিয়েছে।

অজু ঘর পার হতে হতে এসব শুনছিল। মঞ্জু, নীলুর মৃত্যুর আশায় বসে আছে। সে এখন শুধু দিন গুনছে বোঝা গেল। যাতে মায়া কমে যায়—নিষ্ঠুরতার সামিল যদিও, মঞ্জু সহসা কোনো বেশি প্রয়োজন না থাকলে ঘরে ঢুকতে চায় না। সপ্তাহে একদিন শহর থেকে বড় গাড়ি করে ডাক্তার আসে। সেদিন সে অনেকক্ষণ ডাক্তার চলে গেলেও বসে থাকে। অন্যদিন কেয়া কি বুঝতে পারে, বুঝতে পারলেই যাতে ও-ঘরে মঞ্জুদিকে বেশি যেতে না হয় সে জন্য সে সব কাজ, নীলুর সব সেবা-শুশ্রূষার ভার নিজের হাতে নিয়ে নিয়েছে। ভয়, এই অসুখের সঙ্গে মঞ্জুদিও না একটা বড় অসুখে পড়ে যায়।

মঞ্জু যেতে যেতে বলল, নীলু যতদিন আছে, আমাকে দাঁত কামড়ে এখানে পড়ে থাকতে হবে।

অজু সোজা হেঁটে যাচ্ছে ওর ঘরের দিকে। মঞ্জু পেছনে আসছে, মঞ্জু আরও কথা বলবে। সে ওর কথায় বাধা দিল না। সে ঘরে ঢুকে একটা সিগারেট ধরাল। মঞ্জু বড় খাটে মোটা তোষক ফেলে দিচ্ছে। তার ওপর সাদা ধবধবে চাদর। সব কাজ সে নিজ হাতেই করছে। কেয়া এ-সময় ওকে সাহায্য করতে পারত। কিন্তু এত রাতে সে কেয়ার সাড়াশব্দ একেবারে পাচ্ছে না।

অজু বলল, কেয়া কোথায়?

মঞ্জু যেন শুনতে পায়নি। সে মশারি ফেলে দেবার আগে বলল, তুমি শুয়ে পড়। মশারি গুঁজে দিচ্ছি।

—ওটুকু আমি করে নিতে পারব মঞ্জু। তুমি বরং নীলুর কাছে যাও।

মঞ্জু বলল, এখানে জল থাকল। পাশের জানালা খোলা রেখনা। আজকাল কিছু চোরের উৎপাত হয়েছে।

অজু বলল, আমার বেশ ভয় লাগছে মঞ্জু।

—গাঁয়ে থেকে তো অভ্যাস নেই আর। প্রথম প্রথম করবে। তারপর সয়ে যাবে।

অজু বুঝতে পারল না মঞ্জু এর দ্বারা কি বোঝাতে চাইছে। অজু কি এখানে অনির্দিষ্ট কালের জন্য এসেছে! মঞ্জুর কথাবার্তা শুনে মনে হচ্ছে, অজু ইচ্ছে করলেই এখানে যতদিন খুশি থেকে যেতে পারে। অজুর কোন দায়-দায়িত্ব নেই। সে স্বাধীন মানুষ। এমন কি ইচ্ছে করলে অজু এখানেই থেকে যেতে পারে। মঞ্জুর কথা শুনে ওর সামান্য মনে মনে হাসি পেল। এবং এজন্যই বুঝি মঞ্জু কোন কিছুতেই তাড়াহুড়ো করছে না। খুব ধীরে-সুস্থে সব বলা যাবে। অজু তবু বলল, মঞ্জু সেনদাদা কবে মারা গেলেন?

—প্রায় বছর তিনেক হবে।

—তুমি কি তখন থেকে এখানেই আছ?

—কোথায় যাব তবে।

—বিয়ে হলে মেয়েরা তো বাপের বাড়ি থাকে না।

—বিয়ের পরে থাকতে পারে।

—তা পারে।

—তবে?

মঞ্জু এই তবেটুকু বলেই আর দাঁড়াল না। মঞ্জুর সুন্দর কোঁক-ড়ানো চুলে আশ্চর্য সব ভাঁজ। ওর সামান্য পরিশ্রমেই কপালে ঘাম দেখা দেয়। যাবার সময় মঞ্জু চোখ তুলে তাকালে অজু বুঝতে পেরেছিল, এ-ঘরে একা এলেই মঞ্জু ঘেমে যায়। মঞ্জু তাড়াতাড়ি হাতের কাজ সেরে ফেলতে চায়। মঞ্জু চলে গেলে অজু স্যুটকেসটা খুলে কি যেন বের করবে ভেবে বসে থাকল। সে কি বের করবে ঠিক মনে করতে পারছে না।

অজু এ-ভাবে বেশ খানিকটা সময় পার করে দিল। সে স্যুটকেসের এটা-ওটা ঘাঁটছে। আর কি যেন ভাবছে। মঞ্জু যাবার সময় দরজাটা ভেজিয়ে দিয়ে গেছে। বারান্দার দিকে দুটো জানালা খোলা। অর্জুন গাছটার নিচে নৌকার শব্দ। ডিসপেন-

সারিতে জব্বার কাকা কারো সঙ্গে কথা বলছেন। আর যেন সাড়া-শব্দ নেই। শুধু চারপাশে কিছু আলো এবং মাঝে মাঝে সেই এক কীট-পতঙ্গের আওয়াজ ভেসে আসছে। সে কেন স্যুটকেসটা খুলেছে মনে করতে পারছে না।

এভাবে এমন হয়ে যায়। আসলে অজু অন্য কিছু ভাবছে। সে স্যুটকেসের ভেতর আসলে কিছু খুঁজছে না। খুঁজলেও এখন তা আর খুব তেমন দরকারী মনে হচ্ছে না। সে বসে আছে। মঞ্জু চলে যাওয়ায় এ-ঘরটায় সে কেমন একা। সে অনেক কথা জানতে চাইবে এমনই হয়তো ধারণা মঞ্জুর। মঞ্জু একসঙ্গে বোধ হয় সব প্রশ্নের জবাব দিতে ভয় পাচ্ছে। সে বোধহয় ভাবছে, একসঙ্গে তার ক্ষমতা নেই সব কথার জবাব সে অজুকে দিতে পাবে। মঞ্জু হয়তো সেজন্য তাড়াতাড়ি কাজটুকু সেরে চলে গেছে। অথবা কি মঞ্জু অনেক সময় চায়! একা, একসঙ্গে বসে অনেকক্ষণ সে তার সঙ্গে কথা বলতে চায়।

অজু এবার বুঝতে পারল, সে মঞ্জুর চিঠিটা খুঁজছে। কোথায় রেখেছে চিঠিটা। সে আর একবার চিঠিটা পড়ে দেখতে চায়। তাড়াতাড়ির মাথায় সে চিঠিটা কবার পড়েছে—কিন্তু, চিঠির ভাষার ভেতর কি যেন কি একটা রহস্য আছে, সে বার বার পড়েও তা ধরতে পারেনি। এখানে এসে সে মঞ্জুকে দেখেছে, কেয়াকে, জব্বার কাকাকে দেখেছে। গ্রামের আগের ছবি একেবারে পাল্টে না গেলেও অনেকটা পাল্টে গেছে। শুধু ঝোপ জঙ্গল, বন বাদাড় গ্রামটার চারপাশে। সে আসলে স্যুটকেস খুলে চিঠিটাই খুঁজছে। মঞ্জুর চিঠি। চিঠিতে কি মঞ্জু কোথাও অজুকে অজুকাকা সম্বোধন করেছে!

আসলে সবই অজু পড়েছে। অজুকাকা এমন শব্দ কোথাও লেখা নেই—তবু মনের ভেতর কখনও কখনও ভীষণ সংশয় দেখা দিলে নিজের চোখকে বার বার অবিশ্বাস করতে ইচ্ছে হয়। সে চিঠিটা বের করে পড়ল। না, মঞ্জু কোথাও অজুকাকা লেখেনি। কেবল লিখেছে অজু তোমাকে আমার এ-সময়ে ভীষণ দরকার।

তুমি এস। আরও সব লিখেছে, আজ বিশ একুশ বছর পর তোমার ঠিকানা পেয়ে হাতের কাছে বাঁচার মতো একটা প্রেরণা পেয়েছি। তুমি এস। তোমাকে আমার খুব দরকার।

অজু এবার চিঠিটা ভাঁজ করে রেখে দিল। সে রাতেব পোশাক পাল্টে নিল। বাথরুমের কাজ সেরে হাতমুখ মুছে জানালার কাছে এসে একটা চেয়ার টেনে বসল। সামনে বারান্দা পার হলে ঘাসের লন। সে বুঝতে পাবছে শুলে এখন তার ঘুম আসবে না। সে বরং বসে বসে শৈশবের যা কিছু ছিল প্রিয়, সব কিছু যেমন পুকুরের পাড়ে পাড়ে হাঁটা, মাছের শব্দ শোনা, সব এখন পেলে যেন সে আবার আগের মতো ছুটতে পারে। কেবল মঞ্জু আর আগেব মঞ্জু নেই। সে কেমন যুবতী হয়ে গেছে। ওর ছেলেটার অসুখ। মঞ্জু ভেবে ফেলেছে ছেলেটা কিছুতেই বাঁচবে না। ওর চোখে মুখে সব সময় গভীর এক বিষণ্ণতা। মানুষের শৈশবের দিন কেন যে এ-ভাবে পাল্টে যায়। মঞ্জুর জন্য ওর কেন যে ভীষণ কষ্ট হচ্ছে। সে উঠে দাঁড়াল। অনেকক্ষণ জানালায় চুপচাপ দাড়িয়ে থাকতে ইচ্ছা হচ্ছে।

আসলে মানুষের শৈশব সবচেয়ে প্রিয় তার কাছে। এবং এইসব গাছপালা মাঠ এবং রোদ্দুরে ঘুরে বেড়ানো, দত্তদের আমবাগানে শুয়ে শুয়ে পরীক্ষার পড়া করা, সব একসঙ্গে মনোরম এক স্মৃতি। এবং স্মৃতির ভেতর ফিবে এলে সবকিছুই রূপকথার মতো মনে হয় অজুর। সে মঞ্জুকে, কেয়াকে, জব্বার কাকাকে এমন একটা অবস্থায় আবিস্কার করবে ভাবতেই পারেনি। কেমন ওরা একটা রূপকথার দেশেব মানুষ হয়ে গেছে। বিশেষ করে এই নির্জনতা গ্রামের, কোথাও আর মানুষের আবাস নেই, কেবল একটা লালরঙের ইটের বাড়ি, আর ডিসপেনসারি ঘর, নীল রঙের ডাকঘর, ঘাসের লন আব পেছনে অনেকদূর পর্যন্ত দীঘির মতো বড় পুকুর, পুকুরের চার ধাবে সারি সারি রসুন গোটার গাছ। মাঝে মাঝে সব ইলেকট্রিক আলো জ্বালা, যেন এবা সব স্বপ্নের মতো জেগে আছে এখানে।

সেখানে সে তার শৈশবকে কিছুতেই খুঁজে পায় না। কি প্রাণান্ত ছিল, মঞ্জুর সেই খবর পৌঁছে দেওয়া অবনীকে।—অবনী তোকে মঞ্জু পছন্দ করে না। তুই আর মঞ্জুর সঙ্গে কথা বলার চেষ্টা করবি না।

অবনী বলেছিল, তুই ওকে বলেছিলি, আমি ওর সঙ্গে কথা না বললে খুব দুঃখ পাই।

—বলছিলাম।

—কি বলল ?

—বলল, দুঃখ পেলে তার আমি কি করব!

অবনী দুঃখ পেলে অজুর ভীষণ খারাপ লাগত। সে, রসো, অবনী তারপর মাঠে মাঠে ঘুরে বেড়াতো। লটকন ফল চুরি করে আনত অবনী। ওরা ভাগ করে খেত। আর নানারকম ফন্দি-ফিকির খুঁজতো কি করে মঞ্জুর সঙ্গে কথা বলা যায়।

অজু আবার অবনীকে বলত, বললাম অবনী দুঃখ পেলে আমাদের খুব খারাপ লাগে। তোর লাগে না ?

—কি বলল ? অবনী বড় বড় চোখে তাকিয়ে থাকত।

—বলল, না লাগে না ?

অজুরা ভাবত, মঞ্জু শহরের মেয়ে বলেই বোধ হয় ওরা যতটা সহজে দুঃখ পায়, মঞ্জু ততটা সহজে দুঃখ পায় না। ওরা তো মঞ্জুর মতো সুন্দর মেয়ে কোথাও দেখেনি। মঞ্জু কবে আসবে, কারণ তাদের মনে আছে মঞ্জু ছুটিতে গাঁয়ে না এলে কেমন একটা খাঁ খাঁ ভাব সারাটা গাঁয়ে। বিকেল হলেই অজুরা ডিসপেনসারির দাওয়ায় চুপচাপ বসে থাকত। সেনদাদা বলত কিরে তোরা ভাস্কর লবণ নিতে এসেছিস। বোস দিচ্ছি। সেনদাদা ভাস্কর লবণ দিয়ে বলত, পূজোয় তো মঞ্জু আসবে না ভাইরা—ওর স্কুল খুললেই পরীক্ষা। পরীক্ষার পরে আসবে।

অজুর মনে আছে গোটা পূজোর মাসটা ওদের ভেতর কেমন একটা দুঃখ জেগে থাকত—যা তারা কাউকে বলতে পারত না।

মঞ্জু এসে বলল, অজু ঘুমিয়েছে। তুই এবার ওকে ডেকে খাইয়ে দে। অনেক রাত হয়েছে।

কেয়া সিঁড়ি দিয়ে নেমে এল। এদিকটা সব সময় অন্ধকার থাকে। এখানে কোন আলো নেই। কেয়া জানে সব। কারণ চোখ বুজে সে এ-বাড়ির সব জায়গায় চলে যেতে পারে। কোথায় কতটা অন্ধকার থাকবে সে জানে। বাড়িটার একটু দূরে এক কোঠা ঘর। ঘরটা বোধহয় সেনবাবুর বাবা করে গেছিলেন। বোধহয় ও-ঘরটায় যারা পশ্চিমা বেহারা ছিল তাদের রান্নাবান্না হত। এক সময় তারা থাকত ঘরটায়। ঘরটার ব্যবহার কবে থেকে যে বন্ধ হয়ে গেছিল সে যেন মঞ্জুও বলতে পারবে না। চারপাশে সেই লম্বা চন্দন গোটার গাছ। প্রায় চারপাশে গভীর জঙ্গলের মতো। এখন এখানে একটা সরু পথ আবিষ্কার করা যায়। মনে হয় সকাল বিকেল কেউ খুব সন্তর্পণে হেঁটে যায়। কেউ যেন টের পায় না কে বা কারা পথটায় হাঁটে।

কেয়া কিছু লতাপাতা ডিঙ্গিয়ে লাফ দিয়ে সিঁড়িটার ওপব দরজায় টোকা মারল। খুব আস্তে। যেন পৃথিবীর কেউ টের না পায়।

দরজা খুলে গেলে বলল, যান খেয়ে আসুন।

মানুষটার চোখ মুখ যেন শান্ত। সে নেমে যাবার সময় বলল, তোমাদের খাওয়া হয়েছে?

—না। আপনি খেলে আমবা খাব।

—কে যেন এসেছে দেখলাম।

—অজুদা এসেছেন।

—সেই, যাকে আসতে লেখা হয়েছিল?

—হ্যাঁ।

মানুষটার মুখ ভীষণ গম্ভীর হযে গেল। সে ধীরে ধীর নেমে গেল। সে সেই সরুপথে ঝোপ্‌ জঙ্গল ফাঁক কবে চলে যাচ্ছে। কিছুটা এলেই আলো পাওয়া যায়। সে আলোতে এসে স্বস্তি পায়।

অন্ধকার রাস্তাটুকু পার হতে তার ভীষণ ভয় লাগে। ভয়ে সে টর্চ পর্যন্ত ব্যবহার করতে পারে না। আসলে,এখন তার কিছুই ব্যবহার করবার মতো সামর্থ্য নেই। সে এখন একা অন্ধকারে নানাভাবে বাঁচাব জন্য দিন গুনছে। সে ভীষণ উদ্‌বিগ্ন। তার চোখ মুখ দেখলে মানুষের মায়া হবার কথা।

কেয়ার এখন অনেক কাজ। বিছানা তুলে ঝেড়ে আবার পেতে দেওয়া। পুরোনো নোনা ধরা ইটের ছোট্ট এক কামরা ঘর। দেওয়ালের খসা চূণ বালি সব সময় ঝুর ঝুর করে ঝরছে। সকালে এ-ঘরে বসে থাকলে বিকেলে চেনা যাবে না। কেমন বিবর্ণ এক ছবি হয়ে যায় মানুষ। এ-ঘরটাকে কেয়া সারাদিন খেটে বাসযোগ্য করে তোলার যে কতদিন থেকে চেষ্টা করছে। মানুষটার যাতে কোন অসুবিধা না হয়. সে নানাভাবে তা চেষ্টা করে যাচ্ছে।

কেয়া প্রথমে ঘরটা ভালভাবে পবিষ্কার করে ফেলল। জানালা-গুলো সব খুলে দিল। ঘরটার একটা দিকের জানালা খোলা রাখা হয়। বর্ষাকাল বলে তেমন ভয় নেই। কাবণ চারপাশে এখন এই সব গাছপালা বনজঙ্গল নিয়ে বাড়িঘর দ্বীপের মতো। একটা জানালা খোলা রাখতেই মঞ্জুদি ভঁয় পায়। এখন যেহেতু সে এ-ঘরে নেই, সব জানালা খুলে দেয়া যায়। একটু মুক্ত বাতাস খেলে বেড়াক এমন ভাব কেয়ার চোখে মুখে। সে হ্যারিকেনের আলোটা আর একটু উসকে দিল। ওর বালিশ ঠিক করে দিল। এখন সে ফিরে এলে দরজা বন্ধ করে শুয়ে পড়বে। কিন্তু সকালে কেউ যদি সহসা সেই জঙ্গলের ভেতর ঢুকে যায় তবে দেখতে পাবে একটা মরচে ধরা তালা ঝুলছে। এই পুরোনো কোঠাবাড়িটার সঙ্গে মরচে পড়া তালাটাও যেন দীর্ঘকালের। দেখলে মনে হবে, সেই কবে এই ঘরে তালা পড়েছে আর খেলা হয়নি।

কেয়া মনে মনে বেশ হাসল। খুব মজা লাগে যখন, কেয়া খুব সকালে এসে ভাবে কমাণ্ডার মুর্শিদ এবার আপনার ঘরে তালা পড়বে। বাইরের কাজ কিছু বাকি থাকলে সেরে ফেলুন। বনজঙ্গল

ফুঁড়ে আসমানের আলো এসে নামছে। আপনি তখন বের হতে ভয় পাবেন।

তখন কমাণ্ডারের গলা পাওয়া যায়। সে বেশ ধীরে ধীরে মীর্জা গালিবের কোন শায়ের আবৃত্তি করছে। আবৃত্তি করে আবার বাংলায় কেয়াকে বুঝিয়ে দিচ্ছে।

—ও সব পরে বোঝাবেন। ওঠোন। তাড়াতাড়ি। আব্বা আর একটু বাদেই ডাকঘরের তালা খুলে দেবে।

সে কেমন আলস্য নিয়ে উঠত। দেখলে মনে হত সে কেমন ধীরে ধীরে নির্জীব হয়ে আসছে। তবু মাঝে মাঝে সাহস পাবার জন্য যেন সে গালিবের কোন শায়ের আবৃত্তি করে থাকে। আর কিছু না। সে কেমন অধীর আগ্রহে মাঝে মাঝে মঞ্জুর ঘরে ঢুকে যায়—মঞ্জু কিছু হল!

—এখনও কিছু করতে পারিনি সাহেব।

মুর্শিদ মাথা নিচু করে আবার সেই বনজঙ্গলের পথে ঢুকে ছোট্ট ঘরটায় গিয়ে দরজা জানালা বন্ধ করে বসে থাকত। কেমন একটা ভয়, আতঙ্ক। মঞ্জু তাকে নানাভাবে সাহস দিচ্ছে। মঞ্জুর দিকে তাকালে সে বাঁচতে সাহস পায়।

কেয়া তাকে নিয়ে বেশ মজা করে থাকে। ভালো মানুষ, বিনীত। অথচ সেই দিনগুলোতে সাহেবের সেই কঠিন গলা, এবং নানাভাবে তাদের পৌঁছে দেওয়ার কথা ভাবলে গা কাঁটা দিয়ে ওঠে এখনও। এবং ভেতরে ভেতরে এক ঘৃণা অথবা প্রতিশোধের স্পৃহা জেগে উঠলে কেয়া কেমন অধীর হয়ে যায়। কিন্তু মঞ্জুদির দিকে তাকালে সে সাহস পায় না। সমস্ত ঘৃণা নিমেষে কেমন উবে যায়। মঞ্জুদির চোখে কোন বেদনার ছাপ লেগে নেই। মঞ্জুদি কত সহজে যে মানুষকে ক্ষমা করার কথা ভেবে থাকে।

কেয়া তাড়াতাড়ি সব হাতের কাজ সেরে ফেলল। মশারি টানানোর সময় ওর মনে হল একটা জোনাকি পোকা ঘরে ঢুকে গেছে। সে তাড়াতাড়ি সেটা বের করতে গিয়ে দেখল—ভাঙ্গা ইঁটের

খাঁজে সে বেশ আশ্রয় নিয়ে বসে গেছে। এত উঁচুতে নাগাল পাবার কথা না। জোনাকি পোকা জ্বললে সাহেব ভয়ে ঘুমোতে নাও পারে। সুতরাং যে-ভাবেই হোক ওটাকে বের করার দরকার আছে। না বের করলে সকালে মঞ্জুদির কাছে নালিশ, একটা জোনাকি পোকার জন্য রাতে ঘুম হয়নি মঞ্জু। তখন মঞ্জুদির সামনে দাঁড়াবার সাহস কেয়ার নেই। মঞ্জুদি ভীষণ বকবে।

কেয়ার আরও হাসি পায় ভেবে—এমন যোয়ান মানুষ, আর ভীষণ সুপুরুষ মানুষ, কলকাতার রাজাবাজারে যার শৈশব কেটেছে, দেশভাগের পর যার বাবা করাচির বন্দরে জাহাজীর কাজ নিয়ে চলে গেল এবং যে একদা মেহেদি রাঙাতো, তারপর বড় হতে হতে সুবাদার মেজর তারপর আরও কি যেন এবং এখন এখানে শিশুর মতো সরল, মঞ্জুদির কথার ওপর যার কথা বলার সাহস নেই—কখনও কখনও সরল বালকের মতো অভিমান—এসব সাহেবকে না দেখলে বিশ্বাস করা যায় না। আসলে মানুষ নানাভাবে ভাল থাকার চেষ্টা করে থাকে। কিন্তু কখনও কখনও এক রক্তের নদী বয়ে যায়। মানুষের ছায়া নড়ে ওঠে। এবং বনজঙ্গলের ভেতর সাপের মতো তার শরীরে শয়তানেরা বাসা বেঁধে ফেলে।

সবই মঞ্জুদির কথা। মঞ্জুদি এখন হয়তো ওকে খেতে দিচ্ছে। খুব যত্নের সঙ্গে মঞ্জুদি ওকে খাওয়ায়। সে পেঁয়াজ রসুন খেতে ভালবাসে বলে, মাছে অথবা রুটির তরকারিতে মঞ্জুদি পেঁয়াজ রসুনটা বেশি দেয়। রাজাবাজারে যার শৈশব কাটে, যে এক ভাঙাঘরে মানুষ, যার নশিব দেশভাগের পর পাল্টে যায়, সে এখন এখানে মঞ্জুদির কাছে প্রায় সরল বালকের মতো।

—তোমার পেট ভরল সাহেব ?

—ভীষণ।

তারপরই ফিস ফিস গলায় বলল, কেউ এসেছে ?

—এসেছে।

—সে বিশ্বাসী মানুষ তো।

—মনে তো হয়।

—আমাকে আবার ধরিয়ে দেবেনাতো ?

—না। সে তেমন মানুষ নয়। তোমাকে দেখলে তারও মায়া পড়ে যাবে।

সাহেব এমন কথায় ভীষণ লজ্জা পেল। তার চোখ দুটো সহসা জলে ভবে গেল।

—তুমি তোমার ছেলে বউর কাছে ফিরে যেতে পারবে আশা করছি।

সাহেব মাথা নিচু করে রেখেছে। সে মঞ্জুকে আর একটা কথাও বলছে না। চারপাশে সংশয়, সন্দেহ। খুট করে আওয়াজ উঠলেই ওর বুকটা কেঁপে ওঠে! আর ওই মেয়ে মঞ্জু এবং কেয়া ওর হয়ে কতভাবে কি যে করছে! সে কৃতজ্ঞতায় এখন আর চোখ তুলে মঞ্জুর দিকে তাকাতে পারছে না।

—নাও ওঠো। আমরা এবার খেতে বসব।

সাহেব উঠে পড়ল। বাইরে এল। এখানে আবার আলো জ্বলে ওঠায় ও খুব শংকিত। এতদিন সে যেন বেশ ছিল। চারপাশে অন্ধকার, বেত ঝোপ, কুচলতা এবং আশশ্যাওড়ার জঙ্গল। সে যে-দিকটা খোলা রাখে—সেখানে অজস্র গাছ, এবং বন এত গভীর যে কেউ উঠে আসতে পারবে না। বন পার হলে দত্তদের হাজা মজা পুকুর। পুকুরে বেনা ঘাস। এসব পার হয়ে কেউ ওর পশ্চিমের জানালায় উঠে আসবে না। সুতরাং দিনের বেলাতেও সে জানালা খুলে ঘুমিয়ে থাকতে পারে।

আসলে সে এখন আর ঘুমোতে পারে না। রাতেও সে খুব একটা নিশ্চিন্তে ঘুমোতে পারে না। কেবল মনে হয় হৈ হৈ করে আল্লা-হু-আকবর বলে ছুটে আসছে কারা—ওকে হত্যা করার বাসনা। সে ভেবে পায় না ঈশ্বর এমন ভয়াবহ ভাবে মানুষকে তাড়া করতে পারে!

সে ধীরে ধীরে নেমে যাবার সময় দেখল কেয়া হ্যারিকেন হাতে

দরজায় দাঁড়িয়ে আছে। সে দরজা বন্ধ না করলে কেয়া ফিরবে না। কেয়ার তারপর অনেক কাজ থাকে হাতে। কেয়া তার থালা গ্লাস মেজে রাখবে। সে এখানে কিছুটা হিন্দু মতে খাওয়া-দাওয়া করছে। ঠিক খানা খেতে পারছে না। একদিন সে মঞ্জুকে আপশোষ করে বলেছিল, আসন পেতে খেতে ভাল লাগে না।

—তোমার জন্য মাদুর বিছিয়ে দেব।

সাহেব জানে এটা মঞ্জুর ওপর ভীষণ টরচার হবে। সব ধুয়ে মুছে নিতে বেলা পড়ে আসবে। সে-জন্য সে বলেছে, না থাক।

তবু একদিন মঞ্জু ওর খুশিমতো একটা মাদুরে সাদা চাদর পেতে দিয়েছিল। তারপর চিনে মাটির বাসনে ভাত ডাল, বেশি বেশি পোস্ত সামনে সাজিয়ে দিয়ে বলেছিল, খাও সাহেব। খাও।

সাহেব ভীষণ সরমের ভেতর পড়ে গিয়েছিল। খেতে বসে খুব সংকোচের সঙ্গে বলেছিল, আসলে মঞ্জু তোমাদের সঙ্গে থাকতে থাকতে আমার নানারকম বদভ্যাস গড়ে উঠেছে। এই যেমন নিজের বাড়িতে হম্বি তম্বি করার স্বভাব ছিল, এখানেও তেমনি মাঝে মাঝে করতে ইচ্ছে হয়।

মঞ্জু বলেছিল, সাহেব তুমি সব সময় করতে পার, তোমাকে কে বারণ করেছে।

সাহেব ভীষণভাবে হাসতে গিয়েও পারেনি। মঞ্জুর স্বামীকে সে চোখের ওপর মরতে দেখেছে। সে দাঁড়িয়েছিল। একজন নিরীহ মানুষকে কিভাবে অহেতুক হত্যা করা যায় তার দৃশ্য সে চোখের ওপর দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখেছে। তবু ভাগ্য বলতে হবে, মেজর তাকে গুলি করতে নির্দেশ করেনি। সে তবে কি যে করত! সে তবে কিভাবে যে মঞ্জুর স্বামীকে দাঁড় করিয়ে হত্যা করত! ভাবতে গেলেই তার নিঃশ্বাস নিতে পর্যন্ত কেমন কষ্ট হয়। সে মঞ্জুর দিকে সোজা তাকিয়ে কথা বলতে পর্যন্ত সাহস পায় না। মঞ্জু হয়তো জানে না, আসলে ওর গুলিতে অবনী মরেনি, সে ইচ্ছে করেই ফাঁকা

আওয়াজ করেছে। কিন্তু ঠিক ঠিক গুলি করলে একটা ফাঁকা আওয়াজে কিছু আসে যায় না।

সে ছুটো পেয়ারা গাছের ছায়া পার হয়ে গেল। ছুটো বড় রস্থন গোটার গাছ পার হয়ে গেল। কেয়া টের পেয়েছে সে আসছে। নানা রকম গাছ লতা পাতার ভিতর দিয়েও দেখা যায় সব। সবুর মিঞা অঞ্চলের এমন একজন ধন্বন্তরির জন্য ভারি সুব্যবস্থা করে দিয়ে গেছে। রাতে এত আলো চারপাশে জ্বলতে থাকলে রূপকথাব দেশের মতো মনে হয়। সাহেবের ছায়া তার ভেতর নড়ে-চড়ে বেড়ালে, কেয়া টের পায় বুঝি সাহেবের খাওয়া জোর হয়েছে। এটুকু পথ হেঁটে আসতে পর্যন্ত কষ্ট। খুব আস্তে আস্তে সে হাঁটছে।

কাছে গেলে কেয়া বলল, কি সাহেব খুব খেয়েছ!

—খুব।

—মঞ্জুদির হাতে রান্না!

—ভারি সুন্দর।

—মনে থাকবে?

—থাকবে।

—ভাবিকে গিয়ে বলবে, মঞ্জুদির মতো এমন সুন্দব মেয়ে হয় না!

—বলব।

—সে বিশ্বাস কববে?

—কেন করবে না কেয়া?

—তোমাদের দেশের লোক বিশ্বাস করবে এসব কথা।

সাহেব বলল, হঠাৎ তুমি কেয়া এমন সব কথা বলছ?

—তুমি তো চলে যাবে। আর তো নাগাল পাব না। তাই মনের ঝাল বেশ করে ঝেড়ে নিচ্ছি।

সাহেব হাসল।—কেয়া তুমিও ভারি মিষ্টি মেয়ে। তোমার কথাও বলব।

আমার কথা বলতে হবে না। আমরা তো এখন তোমাদের দুষমন।

সাহেব বলল, মঞ্জু তোমার জন্য অপেক্ষা করছে। যাও।

কেয়া বুঝল, সাহেব ওর সঙ্গে আর এখন কথা বলতে চায় না। সে নিচে নেমে বলল, দরজা বন্ধ কর।

সাহেব দরজা বন্ধ করে বলল, চোখের সামনে মানুষের যে লাঞ্ছনা দেখেছি কেয়া আল্লার দুনিয়ায় কখনও যেন এমন না ঘটে। সব তুমি কেয়া নতুন করে মনে করে দিও না। দিলে আমি রাতে ঘুমোতে পারব না। অনর্থক আমাকে কষ্ট দিয়ে তোমার কি লাভ।

কেয়া বোধ হয় জবাব দেবে কিছু ভাবছিল, কিন্তু মঞ্জুদি ভিতরের বারান্দায় দাঁড়িয়ে ডাকছে, তোর এত দেরি কেনরে কেয়া! খাবি দাবি না!

অজু পশ্চিমের জানালাটা খোলা রেখেছিল। ঘরের সব জানালা বন্ধ করে সে ঘুমোতে পারে না। পাখার হাওয়া তেমন একটা দরকার নেই। রাত বাড়ার সঙ্গে কেমন একটা ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা ভাব উঠে আসছে।

সে চুপচাপ বেশ কিছু সময় বিছানায় কাটিয়ে দিয়েছিল। ঘুরে ফিরে মাথাব ভেতর মঞ্জুর কথা, রসো অবনী, টুলু ফুলু এবং আরও যারা এই মাটিতে শৈশব ফেলে গেছে তাদের কথা। সে ভেতরে ভেতরে ভীষণ উত্তেজনায় ভুগছে। সে যত সহজে ভেবেছিল ঘুমোবে, ঠিক তত সহজে ঘুমোতে পারল না। বার বার মঞ্জুর মুখ উঁকি দিচ্ছে। মঞ্জুকে এখন ভীষণ মহিমময়ী দেখায়। ওর ভারি চশমার ভেতর ওকে যেন ঠিক চেনা যায় না। সে যতটা না গম্ভীর তার চেয়ে চোখের ভারি চশমা তাকে আরও বেশি গম্ভীর করে রাখে। আর অবাক অজুর কাছে, বার বাব জলের ভেতর সবুজ ঘাসেব মতো মঞ্জুব মুখ হারিয়ে যায়। মঞ্জু তখন, ছোট মঞ্জু, মঞ্জু মাঠের ভেতর ঘোড়া নিয়ে ছুটছে। এ ছবিটাই মঞ্জুর সব চেয়ে মনে রাখার মতো। আর একটা ছবি সে মনে করতে পারে, মঞ্জুর মায়ের মৃত্যুর দিনে ওর পায়ের কাছে বসে থাকা।

অজুরা দূরে দাঁড়িয়েছিল। জলে ডুবে মরেছিল মঞ্জুর মা। ওর কি

যে দুঃখ ছিল! কেন যে জলে ডুবে মরে গেল মঞ্জুর মা এখনও অজু রহস্যটা আবিষ্কার করতে পারেনি! মঞ্জুর সেই ছবিটাও সে মনে রেখেছে। মঞ্জুর চোখ দিয়ে জল পড়ছে না। সে সাদা পাথরের প্রতিমা যেন। চারপাশে সবাই ভিড় করেছে। এমন একটা অপমৃত্যুর খবর থানায় সেদিন কেউ পৌঁছে দিতেও সাহস পায়নি: সেনদাদা নির্বিঘ্নে, খালপাড়ে মঞ্জুর মাকে দাহ করেছিলেন।

এবং কতদিন যে এই ব্যাপারটা গ্রামের ভেতর একটা ভূতুড়ে ব্যাপার হয়েছিল! কতদিন যে সে এবং আরও যারা আছে গ্রামের অর্থাৎ শৈশবের ছোট ছোট মানুষেরা এমন একটা ভূতুড়ে ব্যাপারে পড়ে গিয়ে রাতে-বিরাতে কিছুতেই ঘর থেকে বের হত না। অজুদের কষ্ট ছিল মঞ্জুব জন্য। মঞ্জুর মা মরে যাবার পর অজুদের মায়া কেমন মেয়েটার ওপর আরও বেড়ে গেল। ওরা মঞ্জুকে আর কিছুতেই কোন কারণে আঘাত করতে সাহস পেত না।

অথচ অবনীকে কিছুতেই বাগে আনা যেত না। সে ক'দিন বেশ চুপচাপ ছিল এ-ব্যাপারে, সেও একটা যেন সাংঘাতিক শোক-সন্তাপে পড়ে গেছে এমন ভাব—তারপর মঞ্জু শহরে চলে যেতেই সব ভুলে অবনী আবার আগের অবনী হয়ে গেছিল। সে বলেছিল, সেনদাদা মানুষটা আসলে ভাল নয়!

—তুই এটা কি বলিস অবনী।

—আমি ঠিকই বলি। না হলে মঞ্জুর মায়ের মতো মানুষ আত্মহত্যা করে।

তখন অজু স্বাভাবিক ভাবেই আর কোন জবাব দিতে পারত না। কোথায় যে গণ্ডগোলটা ছিল—সে কিছুতেই বুঝে উঠতে পারে না। নানাভাবে সব স্মৃতি এসে অজুর মাথাটা কেমন গুলিয়ে ফেলেছে—আর তখনই মনে হল, জানালার ওপাশে কে যেন হ্যারিকেন হাতে জঙ্গলের ভেতর ঢুকে যাচ্ছে। সে লাফ দিয়ে উঠে বসল।

মশারির ভেতর থেকেই সে স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে, একজন লম্বা মতো মানুষ হেঁটে যাচ্ছে। হাতে হ্যারিকেন। এত রাতে এমন

বর্ষার বনজঙ্গলের ভেতরে কোনো পথ থাকতে পারে সে যেন কিছুতেই ভাবতে পারে না। বর্ষাকাল বলে চারপাশে সবুজের সমারোহ। আগাছা বনঝোপ চারপাশে ভীষণভাবে পথ ঘাট ঢেকে দিয়েছে। তার ভিতর মানুষটা হারিয়ে যেতেই ওর কেমন কৌতূহল হল। বাথরুমের ও-পাশের দরজাটা খুলে সে দেখতে পেল, বনজঙ্গলের ভেতর সেই পুরানো বেহারাদের থাকবার কোঠাবাড়িটা। সেখানে মানুষটা উঠে গেল। কিন্তু দরজায় কে দাঁড়িয়ে!

কেয়া! কিন্তু এত রাতে ওখানে। সে মানুষটার সঙ্গে কিছু কথাবার্তা পর্যন্ত বলছে। কেয়া ওখানটায় কি করছে! মঞ্জু এখন কি করছে। তারপরই মঞ্জুর গলা—কিরে এত দেরি করছিস কেন? খাবি দাবি না!

তবে মঞ্জুও জানে ব্যাপারটা! মানুষটাকে এখন মনে হচ্ছে মঞ্জুই পাঠিয়েছে। সে কি কেয়ার কেউ হয়: ওর কেমন মঞ্জু সম্পর্কে আরও রহস্য বেড়ে গেল। এবং এভাবে একটা জায়গায় চলে আসা, সে ঠিক ঠিক এসেছে কিনা, না এমন একটা গাঁয়ে সে হাজির হয়েছে, যেখানে কোনো মানুষের চিহ্ন নেই। সবাই মরে গিয়ে ভূতটুত হয়ে গেছে। সে একটা ভূতোড়ে বাড়িতে হাজির। তারতো বিশ্বাসই হয় না মঞ্জু এমন একটা নির্জন গাঁয়ে একা পড়ে থাকতে পারে। তার-পরই নীলুর মুখ এবং জব্বার কাকার সেই গোলমেলে ব্যাপারটা মনে হলে তার ভেতরে সাহস ফিরে আসে।

তবু একটা ভীষণ সংশয় অজুর মনে। মঞ্জুকে সে ঠিক বুঝে উঠতে পারছে না। তার হাতে যদিও ছুটি অনেকদিন তবু কালই মঞ্জুর চিঠির কথা সে খোলাখুলি জানতে চাইবে। এ-ভাবে এখানে সে বেশিদিন থাকতে পারবে না। সে কেমন হাঁপিয়ে উঠেছে। মঞ্জুকে সে আগের মতো করে আর চিনতে পারছে না।

কেয়া হ্যারিকেনটা নিয়ে ফিরছে। ফেরার সময় সে গুনগুন করে একটা গান গাইছিল। মনে হল সুরটা রবীন্দ্রসঙ্গীতের। ওয়ারডিং ঠিক কানে আসছে না। হ্যারিকেনের আলোটা সে এদিকে

এসেই নিভিয়ে দিল। এবং আড়াল থেকে অজু দেখতে পেল এখন কেয়া আর মঞ্জু দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কি বলতে বলতে হাসছে। মঞ্জুর চেয়ে কেয়া জোরে হাসতে পারে। ওর হাসি কানে এলে অজু ফের ঘরে ঢুকে গেল। ও বুঝতে পারল, কিছুতেই রাতে তার ঘুম আসবে না। কলকাতায় এখনও বাস ট্রাম চলছে। সে রাতে ঘুম থেকে উঠলেও যেন টের পায় গড়ের মাঠে লাস্ট ট্রাম টালিগঞ্জে যাচ্ছে। তবু তার কি ঘুম! ঘুমে সে চোখ মেলতে পারে না।

আর এখানে কোন শব্দ নেই, কেবল নির্জনতা, নীলুর অসুখ, জব্বার কাকা ডিসপেনসারির দরজা-জানালা বন্ধ করছে, এবং মনে হচ্ছে মঞ্জুও সব জানালা বন্ধ করে শুয়ে পড়ছে। মঞ্জুর ঘর, ওর সাদা চাদর এবং মঞ্জুর শোওয়ার ভঙ্গী সে এখন জেগে জেগে অনুমান করতে পারছে। যত মনে হচ্ছে তত মাথায় আশ্চর্য একটা জ্বালা। তার চোখে ঘুম আসছে না। নিরিবিলি এমন একটা জায়গায় সে কিছুতেই ঘুমোতে পারছে না।

আর তখন, মনে হচ্ছে রাত বেশ অনেক, কেউ ওর দরজায় খুট খুট করে কড়া নাড়ছে। অজুর মনে হল এ-ভাবে কেন! কে আসছে! সে ঠিক অনুমান করতে পারছে না, কেয়া না মঞ্জু। সে এখন কি কববে বুঝতে পারছে না।

তবু উঠতে হয়। ওপাশের দরজায় কেয়া অথবা মঞ্জু বাদে কেউ এখন দাঁড়িয়ে থাকতে পারে না। কেয়াকে আসতে হলে মঞ্জুর ঘর পার হয়ে আসতে হবে। সে এতটা দায়িত্ব কিছুতেই নেবে না। তাছাড়া মঞ্জুব অন্য সময় হল না! সে মঞ্জুকে যতভাবেই ভেবে থাকুক, এভাবে তার কাছে মঞ্জু এলে এখন কেমন যেন মঞ্জু ছোট হয়ে যাবে। সে চায়না মঞ্জু এ-ভাবে ওর কাছে আসুক।

এ-ভাবে কতক্ষণ পার হয়ে গেছে সে জানে না। আসলে সে ভিতরে ভিতরে দরজা খুলতে ভয় পাচ্ছে। ভয় একটা লম্বা হাত যদি মশারির ভিতর ঢুকে যায়! তারপর কঙ্কালের কোন ছায়া। কেন যে এমন মনে হয়—মঞ্জু কেন যে চোখের ওপর একটা কঙ্কালের

মতো ছবি হয়ে যাচ্ছে। দরজার খট খট শব্দটা এখন থেমে গেল। আর কোন শব্দ হচ্ছে না। এবং সেই খট খট শব্দটা থেমে গেলে ওর মনে হল, না ঠিক এ-ভাবে শুয়ে থাকা উচিত না। দেখা দরকার ও-পাশে কে দাঁড়িয়ে আছে! কে হেঁটে বেড়াচ্ছে! তবু উঠতে গিয়ে ভয়। যদি মঞ্জু না হয়, যদি কেয়া না হয়। যদি মঞ্জুর মা দাঁড়িয়ে থাকে। এতদিন পর অজু ফিরে এসেছে জেনে যদি মঞ্জুর মার মায়া হয়—অজু তুই এসছিস? কত বড় হয়ে গেছিসরে! তোকে কতদিন দেখি না! যেমন সে তাদের বাড়িতে বন-জঙ্গলের ভিতর থেকে ঠাকুমার কথা শুনতে পেয়েছিল, তেমনি যদি মঞ্জুর মা দরজার ও-পাশে এখন দাঁড়িয়ে তাকে ডাকে!

অজুর কপালে ঘাম দেখা দিল। বেশ ঘেমে যাচ্ছে। সে ঢোক গিলল ক'বার। গলা ভীষণ শুকনো মনে হচ্ছে। পায়ে সে মোটেই শক্তি পাচ্ছে না। কোথাও আর কোন শব্দ নেই। ও-পাশের জানালাটা খোলা। সে জানালার সামনে যেতে পর্যন্ত ভয় পাচ্ছে। বনজঙ্গলের ভেতরে কোনো একটা পাখীর ডাক অনবরত ভেসে এলে যা হয়, নির্জনতা আরও বেড়ে যায়—একটা কট্ কট্ শব্দ, যেন ঝিঁ ঝিঁ পোকা কাঠ কাটছে অনবরত, আর কোন শব্দ নেই—না, আছে, অনেক দূরে শেয়ালেরা হেঁকে যাচ্ছে, কুকুরেরা ডাকছে—ওসবের ভেতর এত ঘামলে কি করে যে চলে! তবু সে দরজার কাছে এসে সহসা দরজাটা খুলে দিলে, মনে হল শুধু অন্ধকার চারপাশে। ওর ঘরের আলোটা পর্যন্ত ও-ঘরে আলো পৌঁছে দিতে পারছে না। মৃত সব হরিণের মুখ দেয়ালে দেখা যাচ্ছে। আর কিছু না। এ-ঘরটা ফাঁকা, অথবা বসবার ঘর। কিছু সোফা সেট আর দেয়ালে নানাবর্ণের ছবি। সে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কাঁপছে, কারণ সে কিছু দেখতে পাচ্ছে না। একেবারে ফাঁকা। গেল কোথায় সে! দরজায় ঠক ঠক শব্দ করে সে পালাল কোথায়!

এতসব ভাববার ওর সময় ছিল না। সামনের দরজা দিয়ে

ঢুকে গেলেই মঞ্জুর ঘর। ঘরে আলো জ্বলছে না। মঞ্জু কি ঘুমোচ্ছে! নাকি অন্ধকার থেকে মঞ্জু বলে উঠবে, এই যে অজু, আমি এখানে। তুমি এস।

মঞ্জুর শৈশবে ছিল এমন স্বভাব। সে লুকোচুরি খেলার সময় কিভাবে যে ছোট একটা ঝোপের ভেতর নিজেকে অদৃশ্য করে রাখত। কেউ যখন খুঁজে বের করতে পারত না, সবাই যখন, কাছারি বাড়ির মাঠে, অথবা ঘোষেদের জলপাই গাছের নিচে কিংবা চন্দন গোটার জঙ্গলে খুঁজে বেড়াতো মঞ্জুকে তখন সে ঝোপের ভেতর থেকে অজুর পায়ে চিমটি কাটত।—আমি এখানে। বলে সে হাত টেনে ঝোপের ভেতর বসিয়ে দিত অজুকে।

এ-ভাবে এখানেও মনে হচ্ছে অজু তেমনি মঞ্জুর কথা শুনতে পাবে। কিন্তু সে এ-ভাবে কতক্ষণ যে অন্ধকারে দাঁড়িয়ে থাকল। চার পাশের দেয়ালগুলো মাঝে মাঝে হিন্দি ছবির মতো ওর কাছে এগিয়ে আসছে আবার পিছিয়ে যাচ্ছে। দেয়ালের ছবিগুলো ছোট হয়ে যাচ্ছে, বড় হয়ে যাচ্ছে। মৃত হরিণের মুখেরা সজীব হয়ে পরস্পর ডেকে বেড়াচ্ছে। সে ভাবল, ভালোরে ভালো, এতো আচ্ছা ঝামেলায় পড়া গেল। সে কেমন তাড়াতাড়ি ঘর থেকে পালাবার জন্য ছুটে নিজের ঘরে ঢুকতে গিয়ে দরজার চৌকাঠে সে ধাক্কা খেল। সে পড়ে যেতে যেতে উঠে দাঁড়াল। এবং ভয়ে দরজা জানালা বন্ধ করবে ভাবতেই মনে হল ও-পাশের ঘরটায় কেউ দরজা খুলছে। আলো এসে পড়েছে অন্ধকার ঘরটায়। আলোর ভেতর মঞ্জু প্রায় একটা আবির্ভাবের মতো সাদা পোশাকে দাঁড়িয়ে আছে! অজু সেদিকে চোখ তুলে তাকাতে পারছে না।

মঞ্জু কাছে এসে বলল. কিসের শব্দ হল বলতো?

—চৌকাঠে ধাক্কা খেয়েছিলাম।

—তুমি কি করছিলে! ঘুমাওনি!

—ঘুম আসছে না মঞ্জু। সত্যি কথা বলতে কি আমার কেমন ভয় করছে।

—তুমিতো চিরদিন ভীতু স্বভাবের মানুষ। বলেই সে ভাল করে লক্ষ্য করতে দেখল, অজু ভীষণ ঘামছে।

—কি হয়েছে বলতো? মঞ্জু পাশে বসল। ওর ঘুম জড়ানো চোখ। চোখেব পাতা ভারি।—হঠাৎ একটা শব্দে আমার ঘুম ভেঙ্গে গেল। চৌকাঠে তুমি ধাক্কা কি করে খেলে!

—ও-ঘর থেকে আসতে গিয়ে! তারপরে লজ্জায় সে কি বলতে গিয়ে বলতে পারল না।

—ও-ঘরে কি করতে গেছিলে!

—আমার মনে হল কেউ দরজায় কড়া নাড়ছিল!

—কে তোমার দরজায় কড়া নাড়তে যাবে অজু!

—আমি সত্যি বলছি মঞ্জু কেউ নেড়েছে।

তারপর মঞ্জু কি ভাবল। সে বলল, এখানে এস। এটা কি!

—বুঝতে পারছি না।

—দেখছনা পাল্লাটা একটু লুজ আছে। একটু হাওয়া দিলেই নড়ে। অজু হা করে তাকিয়ে থাকল কিছুক্ষণ। তারপর বলল, হবে হয়তো!

মঞ্জুর পোশাক দেখে মনে হয় না সে ঘুমিয়েছিল। বোধ হয় মঞ্জু শোবার আগে পাটভাঙা শাড়ি পরতে ভালবাসে। কালোপাড় শাড়ির সাদা জমিন। সাদা জমিনে কখনও কখনও কাজ করা থাকে। সে বেশ একপাশ হয়ে শোয়। আর নড়ে না। সেজন্য ওর শাড়ির পাট ভাঙ্গে না। অজু মঞ্জুর দিকে তাকিয়ে এমনই ভাবছিল।

মঞ্জু বলল, শুয়ে পড়। বলে উঠতে যাবে, এমন সময় কেন যে ভেতরে কি হয়ে যায়, ওর উঠতে ইচ্ছে করে না। আজ ন' মাসের ওপর সে একা। এ ভাবে একা থাকতে থাকতে সে হাঁপিয়ে উঠেছে। এবং অজুকে দেখলে ওর এই হাঁপিয়ে ওঠা কমে যেতে পারে—অজুকে কি অজুহাতে যে এখানে নিয়ে আসা যায়! অজু সেই শৈশবের অজু, যে ছিল ভীষণ লাজুক, যার চোখ ছিল টানা,

যে লম্বা ছিল, অথচ শরীর যার সবল ছিল না তেমন, সে এখন দেখতে কেমন হয়েছে এই ভেবে একটা চিঠি, অবশ্য আরও কাজ আছে অজুর জন্য, সেটা এখন বলা যাচ্ছে না। দুদিন না গেলে বলতে পারবে না। একজন আর্মি থেকে ডেজার্টার মানুষ এ-বাড়িতে আশ্রয় নিয়েছে। এবং সেই সব দিনে ওর কাজ ছিল মঞ্জুকে মেজরের কাছে পৌঁছে দেওয়া। কেয়াকে আগেই পৌঁছে দেওয়া হয়েছিল। সব কাজ ঐ মানুষটার। সে মানুষটা এখন তার কাছে রয়েছে। তার আশ্রয়ে আছে।

মঞ্জু বলল, দরজাটা বাইরে থেকে ভাল করে টেনে দিয়ে যাচ্ছি। আর ঠক ঠক করে নড়বে না।

অজু বলল, ঠক ঠক করে কিছু নড়লে আমার ঘুম আসে না। তারপরই যেন ওর বলার ইচ্ছে, মঞ্জু আর একজন মানুষ এ-বাড়িতে আছেন, সে কে? তার সম্পর্কে আমি কিছু জানি না। তাকে দেখলাম তোমাদের সেই পুকুরের ধারে আলগা বাড়িটাতে ঢুকে যেতে। সেখানে তো কিছু বেহারা থাকত। সেখানে মানুষটা কি করে এখন! কেয়া সেখানে কি করছিল!

মঞ্জু বলল, তুমি এমন ঘামছ কেন? বলে সে উঠে পাখা ফুল স্পিডে চালিয়ে দিল।

—ঠিক বুঝতে পারছি না।

মঞ্জু ও-পাশের চেয়ারে বসল। দুজন মুখোমুখি। সামনে বাতিদান। এখন যেন নিরিবিলি ওরা অনেক কিছু বলতে পারে। অজু বুঝতে পারছে মঞ্জুর এখন ওঠার ইচ্ছে নেই। এতদিন পর দেখা। অথচ ওর শরীরের সেই মনোরম গন্ধটা এখনও ঠিক তেমনি আছে। মঞ্জুকে অজু ঠিক ভালভাবে দেখতে ভয় পাচ্ছে। সে কেমন অন্যদিকে কি দেখছে এমন মুখ করে বলল, অনজু পিসিরা কোথায় আছে?

—জামাইবাবু নাগপুরে আছেন। অনজুদির একটাই ছেলে। ছেলেটা দেরাদুনে মিলিটারি কলেজে পড়ছে।

—সেনদাদা কবে মারা গেছেন ?

—বছর চারেক হবে।

—তারপর তোমার মানুষটি ?

—সে নেই।

—কোন অসুখে ? কারণ অসুখে মারা যাক এমনই যেন চাইছিল অজু।

—না।

—তবে।

—তবে যা হয়ে থাকে। ওরা এল। ওকে ডাকল। মাঠে নিয়ে গেল। তারপর···। মঞ্জু চোখ নিচু করে দিল। ওর মুখ ভারি থম থম করছে। এত রাতে এ-সব কথা না তোলাই ভাল ছিল। তবু যেন এই সময়, দুজনে কিছু কথা বলা, কিছু না বলেতো চুপচাপ বসে থাকা যায় না, আসলে এতদিন পর যেন এমন একটা অবসরের জন্য দুজনেই অপেক্ষা করছিল—কত কথা ওদের জমা হয়ে আছে, অথচ বলতে পারছে না। মঞ্জুর বিয়ে হয়েছে, ছেলে হয়েছে, অজুর জীবনটা নানাভাবে ব্যর্থতায় ভরা। আর সে জানে এ-জন্য সে নিজেই দায়ী। জোরজার করে চেয়ে নেবার মতো মানুষ সে নয়। সবাই কেমন ওর কাছে অতিথির মতো এসে থেকে খেয়ে চলে গেল।

অজু বলল, তোমরা চলে গেলে না কেন ?

—কোথায় যাব ?

—কেন যেখানে সবাই গেছে।

মঞ্জু হাসল। সেই এক নীল রঙের হাসি। কঠিন বিষাদে ভরা।—তুমি তো দেখলে অজু, আমার ছেলেটা এ-ভাবে জন্মের পর থেকে শুয়ে আছে। এ-ভাবে সে বিছানাতেই বড় হয়েছে। ওকে ফেলে আমরা কোথায় যাব বল !

—এখানে কেন যে তোমরা পড়ে থাকলে বুঝি না! গ্রামের তো কেউ নেই। তোমাদের কি আকর্ষণ ছিল থাকার !

মঞ্জু বলল, বাবাকে তো তুমি জানতে। এত বড় একটা অঞ্চলে

এমন প্রতাপ নিয়ে বেঁচেছিলেন, এমনভাবে মানুষের সঙ্গে মাটির সঙ্গে জড়িয়ে গিয়েছিলেন যে আর কোথাও গিয়ে নতুন ভাবে বাঁচতে সাহস পাননি।

—কেন নীলুর বাবাকে নিয়ে তুমি চলে যেতে পারতে ?

—ঐ বড় সম্পত্তি। আর সে মানুষটাকে তো তুমি জানতে। কতটা সে একগুঁয়ে ছিলো তাও তুমি জানতে—সে কি ভেবেছিল, কে জানে, সে বলত, না বেশ কবিরাজিটা যখন শিখে ফেলেছি, আর যখন রুগীপত্রও হচ্ছে তখন আর নতুন দায় নিয়ে কাজ নেই। বেশ আছি। দেশ ছেড়ে কোথাও পালাব না।

—সে কে মঞ্জু ? অজু কেমন স্মার্ট গলায় কথাটা বলে ফেলল।

—তোমাদের অবনী।

—আমাদের অবনী !

মঞ্জু আর কোন কথা বলল না। মাথা নিচু করে বসে থাকল।

এ-ভাবে কি যে হয়ে যায়। কেন যে মঞ্জুর এমন বলার পর কপাল ঘামে। মঞ্জুকে দেখে মনেই হয় না, সে এমন একটা শোক সামলে উঠতে পারে। অথবা অবনী তার যৌবনে কেমন হতে ছিল, অজুর কথা বলত কিনা মঞ্জুকে, অজুকে যে একবার মঞ্জু নিয়ে কি সব শিখিয়েছিল—এবং সে-সব কথা সেতো অবনীকে বলে দিয়ে বিশ্বাস-এর পরিচয় দিয়েছিল—আর অবনী এমন জেনেও মঞ্জুকে বিয়ে করেছিল কি করে—না অবনী বুঝতে পেরেছিল, শৈশবে বালক-বালিকাদের নানারকম কৌতূহল থাকে, মঞ্জু অজুকে নিয়ে সামান্য কৌতূহল মিটিয়েছিল—ওতে আর দোষের কি ! অথবা যদি অবনী বলে দিয়ে থাকে, মঞ্জু তুমি ভীষণ পাকা ছিলে ছোট বয়সে। তুমি যা জানতে ছোট বয়সে আমরা তা জানতাম না। তুমি অজুকে কি সব করেছ ! অজু লজ্জায় রাঙা হয়ে উঠেছিল। তুমি অজুকে এসব করতে করতে কি সব বুঝিয়েছ, যে অজু একদম উঠতে পারেনি।

এবং এসব মনে হলেই অজু কেমন সংকোচের ভেতর পড়ে যায়।

কি দরকার ছিল এসব বলার অবনীকে! অবনীকে না বললে ওর কি ক্ষতি হত। অবনী যদি বলে দিয়ে থাকে—মঞ্জু অজুকে কি ভাববে! মানুষের তো সব গোপন রাখার ইচ্ছে তার স্বভাবে। সে কেন যে বলতে গেল! আসলে, মঞ্জু ওকে কত ভালবাসে, এবং মঞ্জুর কাছাকাছি থাকার মতো মানুষ যে সেই—সেদিন যেন এটা গর্ব করে বলার মতো একটা ব্যাপার ছিল অজুর। অজু বলল, মঞ্জু, অবনী তোমাকে ছেলেবেলাতেই ভীষণ ভালবাসত।

সেই ছেলেবয়সে মঞ্জু কি জবাব দিত এমন কথায় অজু যেন এখনও তা বলে দিতে পারে। কিন্তু এবয়সে মঞ্জু কি দেবে সে জানে না। জানে না বলেই যেন সে জানতে চায়, অবনী ওর কতদূর কাছের মানুষ ছিল! অবনীকে সে শেষ পর্যন্ত সত্যি ভাল-বাসতে পেরেছিল কিনা! না অবনী সেই জোরজার করে, কোনো একটা অঘটন ঘটিয়ে মঞ্জুকে নিজের করে নিয়েছিল!

তারপর অজুর মনে হয় সে সত্যি এখনও সেই শৈশবেই থাকতে চাইছে। সে সেই বয়স থেকে উঠে আসতে চাইছে না। অবনী মঞ্জুকে বিয়ে করেছে ভাবতেই কেন এত সব সংশয় এসে দেখা দিচ্ছে সে বুঝতে পারছে না। আসলে সেও একটা সেই মানুষ যার ভেতরে আছে কঠিন, অমানুষের ছবি। সেটা উঁকি দিলেই সংশয়। এবং বিশ্বাস হয় না মঞ্জু অবনীকে কোনদিন সত্যি ভালবাসতে পারবে। অজু এবার নিজের মনেই হেসে দিল, বলল, অবনীর কথা মনে হতেই শৈশবের কত আজেবাজে কথা মনে আসছে মঞ্জু।

মঞ্জু বলল, তুমি এবারে শুয়ে পড়। অনেক রাত হয়েছে। কোন ভয় নেই। দরজায় শব্দ হলেও কিছু ভাববে না। বলে সে আর বসল না। উঠে নিজের ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দিল। দরজা বন্ধ করে দেবার সময় জোরে জোরে বলল, অজু, অবনী আমাকে একদম ভালবাসত না, সে আমাকে ভীষণ সন্দেহ করত। অজু আর কি ভাববে। সেই লোকটার কথা আর কিছুই জানা হল না।

মুর্শিদ তখন বসে বেশ আরাম করে একটা সিগারেট খাচ্ছিল।

এবং মনে মনে কি যেন তার কবিতার মতো বাজছিল। কেউ এসে গেছে এখানে—যে তাকে নিয়ে যাবে হিন্দুস্থানে। সেখান থেকে সে জেনে নেবে সব। খুঁজতে গেলে হয়তো কেউ না কেউ প্রতিবেশী মিলে যাবে—রাজাবাজারের অলিগলিতে অথবা পার্ক-সার্কাসে কেউ যদি থেকে যায় তবে দেখা হয়ে যাবে—আর না যায়তো অত বড় দেশ পার হলেই সে হোসেনিয়ালার কাছে একটা জায়গা পেয়ে যাবে, যার ভিতরে ঢুকে গেলে সেই পবিত্র স্থান, সেখানে আছে তার পুত্র রহমান, বিবি মর্জিনা, মেয়ে মিনার। সে কেমন মনে মনে একটা আশ্চর্য রকমের বিশ্বাস গড়ে ফেলেছে—এসে গেছে, এসে গেছে তার। তাকে খুব দেখার ইচ্ছে, যে তাকে নিয়ে যাবে। কিন্তু কেয়া বলেছে, সাহেব অত তাড়াহুড়া করলে চলবে না। মঞ্জুদির জানমান নিয়ে কথা। এমন কথায় মুর্শিদের মুখ ভীষণ কালো হয়ে গেছিল—এটুকুতেই এখন মুর্শিদ ছেলেমানুষেব মতো ভয় পেয়ে যায়।

---তবে কি হবে কেয়া ?

কেয়া মুর্শিদের চোখে মুখে এমন ভীতির ছাপ দেখে বলেছিল, এখানে তোমাকে আমরা আটকে রাখবো।

মুর্শিদ বলেছিল, আমার মেয়েটা কত বড় জানো ?

—কত বড়, তুমিতো কতবার বলেছ।

—বলেছি !

—বলনি ?

—আমার মনে থাকে না কেয়া।

—বলনি, তোমার মেয়ে মিনার আসার সময় প্ল্যাটফরমে দাঁড়িয়ে কাঁদছিল।

—হ্যাঁ, বলেছি !

—বলনি, রহমান চুপচাপ পাথর হয়ে গেছিল যেন !

—বলেছি !

—বলনি, মর্জিনা, চোখ তুলে তাকাতেই সাহস পায় নি, পাছে তুমি ঝর ঝর করে কেঁদে ফেল।

—এত সব বলেছি!

—তুমি সাহেব ভুলে যাও!

—ভুলে না গেলে বাঁচতে পারতাম না কেয়া। পাগল হয়ে যেতাম।

তারপর কেয়া আর কথা বলে না। হ্যারিকেন নিয়ে নেমে আসে। মুর্শিদ সংসার অন্ত প্রাণ। দুবছরের ওপর হতে চলেছে, সে তার আত্মীয় পরিজনের সঙ্গে দেখা করতে পারছে না।

কেয়া জানে মুর্শিদ এখনও দরজা বন্ধ করেনি। এখনও সে দরজা খুলে দাঁড়িয়ে আছে। এবং হ্যারিকেনের আলো নিভে গেলেই সে দরজা বন্ধ করে দেবে। একটা সিগারেট খাবে। তারপর গালিব থেকে, সেই কবিতাটা আবৃত্তি করবে—

ইশ্‌ক পর জোর নহীঁ হ্যায় যে বো আতিশ গালিব
কি লগায়ে ন লগে প'র বুঝায়ে ন বনে।

কেয়া একদিন কবিতাটা শুনে বলেছিল, মানে?

—মানে? এর মানে হচ্ছে, আচ্ছা তোমাকে কবিতা করে বলব, না গদ্য করে বলব কেয়া।

—কবিতা করে বল।

—কবিতা করলে এমন হয়তো দাঁড়ায়,

প্রেমের পরে জোর খাটে না গালিব সে তো বহ্নি
জ্বালতে গেলে জ্বলবে না তো নেভাতে গেলে তেমনি।

—হয়েছে থাক! তোমার প্রেম মিঞা তোমার বিবির জন্য কত আছে আমি জানি। তুমি একটা নচ্ছার মানুষ।

মুর্শিদ তখনই দরজা বন্ধ করে চুপচাপ বসে থাকে। ওর ঘরে আছে এখন একটা বড় বাক্স। বাক্সতে আছে সব অবনীর জামা কাপড়। মুর্শিদ এক জামা প্যান্টে এখানে এসে আশ্রয় নিয়েছিল। মুর্শিদ জানতো এখানে সে সবচেয়ে বেশি নিরাপদে থাকবে। ওর মনে হয়েছিল, সে মঞ্জুর জন্য এতটা যখন করেছে, তখন মঞ্জু তার জন্য কিছু করবে। এবং এখানে এসেই সে বুঝে ফেলেছিল, মঞ্জু তাকে

নিয়ে একটা সমস্যায় পড়ে গেছে। আর্মি থেকে একজন ডেজার্টার মানুষকে নিয়ে সে যে কি করে! হিন্দুস্থান থেকে রিফুজিরা আবার ফিরে আসছে। কিছু কিছু এ-গাঁয়েও উঠে আসতে পারে। তখন অত নিরিবিলি থাকবে না গ্রামটা। দত্তদের বাড়ি থেকে আরম্ভ করে কাছারি বাড়ি পর্যন্ত, তারপর ঘোষেদের ছাড়া বাড়ি পর্যন্ত একটা এমন নিবিড় অরণ্য সৃষ্টি হয়েছে, যেখানে দিনের বেলাতেও মানুষেরা যেতে ভয় পায়। এইটাই মঞ্জুর পক্ষে রক্ষা।

অবনীর জামা-কাপড় তার খাটো হয়। সে খাটো জামা-কাপড় পরেই থাকে। মাঝে মাঝে খুব হাসাহাসি করে এই নিয়ে কেয়া। এত লম্বা মানুষের জামা-কাপড় কোথায় পাওয়া যাবে। বাবা ওর উর্দুভাষী মানুষ। লম্বা, বড় বেশি খিদমতগার, সে ওর বাবার মতো লম্বা হয়েছে। মা বাঙ্গালী, ছোট্ট মেয়ে, স্বভাবে ভীতু, এবং সে মায়ের মতো স্বভাব পেয়েছে। সে যখন আর্মিতে জয়েন করে তখন ওর মা আল্লার কাছে সারাদিন মোনাজাত করেছে। রোজা রেখেছে। মা দরজায় মোমবাতি জ্বেলেছে। সবই করেছে, ছেলে সুখে থাকুক, ভাল থাকুক এই ভেবে।

মঞ্জু বলেছিল, নাও মিঞা। আমার মানুষের জামা-কাপড় দিলাম। তোমরা আমার সব কেড়ে নিয়েছ, আমি তোমাকে এই-টুকু দিলাম। তুমি এখানে জামা-কাপড় বাদে থাকবে কি করে?

কেয়া বলেছিল, এটা তুমি কি করছ মঞ্জুদি!

মঞ্জুকে খুব শক্ত দেখাচ্ছিল। সে বলেছিল শুধু, কেয়া আমারটা আমি ভাল বুঝি। সে বুঝি আরও কিছু বলতে চেয়েছিল, বলতে চেয়েছিল, ওরা সব যখন নিয়েছে, এটুকুও নিয়ে নিক! অর্থাৎ মানুষের স্মৃতিটুকু। স্মৃতিটুকু মানুষকে খুব কষ্ট দেয়। স্মৃতি সব সময় দুঃখের কথা মনে করিয়ে দেয়। সুখের কথা মনে করিয়ে দেয়। আমার জীবনে সুখের কথা বলতে কিছু নেই। নিজের ভাগ্য দেখে মনে হয় মার সঙ্গে আমার ভাগ্যের কোথাও মিল আছে।

তারপর কেয়া আর বাধা দেয়নি। এখন আর এসব লাগে না।

এক মাসের ওপর আছে মানুষটা। মঞ্জু কিছুই করে উঠতে পারেনি। মঞ্জু হিন্দু বলেই কিছু সুযোগ-সুবিধা সে এখন সরকারের থেকে বেশি পাচ্ছে। যেমন কেয়াকে পবিত্র করার ইচ্ছায় কোন সংঘ তার ভার নিতে চেয়েছিল। কিন্তু মঞ্জু তা হতে দেয়নি। কেয়ার ভেতরে যে কীট বাসা বেঁধেছিল—সেই নিয়ে জব্বার কাকার যেন কোন ভাবনা ছিল না। মঞ্জু জব্বার কাকাকে নানা ভাবে বুঝিয়েছে, এখনই করে ফেলা দরকার। জব্বার কাকা ধার্মিক মানুষ। সে বলেছে, আমি পারি না মা। এবং মঞ্জু নিজের হাতে রসগোল পাতার বড়ি নিয়ে কেয়াকে খাইয়ে দেবার সময়, কেয়ার সেই কঠিন মুখ দেখে কেমন ভয় পেয়ে গেছিল। তারপর কেয়াকে কিভাবে যে সুস্থ এবং স্বাভাবিক করে তুলেছে, সে সব মনে হলেও মঞ্জু মাঝে মাঝে জানালায় দাঁড়িয়ে থাকে।

সবই জানে মুর্শিদ। যখন সব মনে হয় তার, নিজের ভেতরও এক অস্বস্তি সে বয়ে বেড়ায়। সেতো সেই মানুষেরই বংশধর। যেমন যোসেফ একদা সমুদ্রে পথ করে দিয়েছিল, অথবা সেই সব দৈববাণী, মানুষের দ্বারা সৃষ্ট সব, অথচ মানুষই মাঝে মাঝে কেন এমন হয়ে যায়। সব ভেঙ্গে চুরে সে নষ্ট করে দিতে ভালবাসে।

কেয়া চলে গেলেই সে প্রথম মশারির নিচে যায় না। খাটো জামাকাপড়ে কেমন দেখায় আয়নায় দাঁড়িয়ে সে কিছুক্ষণ তা দেখে বেশ মজা লাগে নিজেকে দেখতে। অবনীবাবু খুব সৌখিন মানুষ ছিলেন। জামা-কাপড়ের কাটিঙ দেখে সে সেটা বুঝতে পারে। সেতো এখান থেকে কিছুই নিয়ে যেতে পারছে না। শেষ দিকে সেতো সরকার থেকে মাইনে পর্যন্ত পেত না। সে যদি ডেজার্টার না হত, তবে বন্দি তালিকায় তার নাম থাকত। মাঝে মাঝে সে এটা করে যে খুব বুদ্ধিমানের কাজ করেছে বুঝতে পারে। এবং তখনই গুন গুন করে গালিবের কোন কবিতা আবৃত্তি করতে থাকে।

শবমিন্দা রাখ্তী হ্যায় মুঝে বাদে বাহরসে
মিনায়ে বেশরাব্ ওয়াদিল-এ বে-হাওয়ায়ে গুল।
কেয়া যদি বাংলা মানে জানতে চায় তবে সে বলবে,
বসন্তকে এড়িয়ে চলি নিতান্তই নিজেব দোষে।
পুষ্পবিহীন হৃদয় আমার শূন্য মদের পাত্র হাতে।

সে বসে থাকল কিছুক্ষণ! ঘব অন্ধকার। শুধু হাতেব সিগাবেটটা জ্বলছে। এবং একটা জোনাকিব মতো, অন্ধকাবে সিগাবেটেব আলোটা নিয়ে খেলা কবতে থাকল। একবাব সে আলোটা চোখের সামনে রেখে দেখল। একবার ফু দিয়ে কতটা আলো প্রবলভাবে জ্বালা যায় দেখল। তাবপব ওটা সে হাওয়ায ঘুবিয়ে ঘুরিয়ে অন্ধকাবে হেঁটে বেড়াল। আসলে সে জানে এখন শুলে তাব ঘুম আসবে না। সে সাবাদিন এই ঘবটাতে বন্দী থাকে। ঘব থেকে বেব হওয়া তাব বাবণ। বিশেষ করে সকালেব দিকে। সকালে ডাকঘর খোলা থাকে। লোকজন আসে নৌকায়। কেউ দেখে ফেললে মঞ্জুব পক্ষে বোঝানো মুসকিল হবে। তবে মঞ্জু তাকে প্রথম রাতেই কিছু পবামর্শ দিয়েছিল। যেমন ধরা পড়লে নাম বলতে হবে, নীলমাধব সেন। বাবাব নাম, অনিলমাধব সেন। বাড়ি হুগলিব কাছাকাছি একটা গ্রাম গ্রামটাব নাম মুর্শিদ নিজেই বলেছে। গ্রামটাব সঙ্গে তাব ছেলেবেলাব কিছু পবিচয় আছে। এ-ভাবে সে নিজেব একটা ছদ্মনাম আগেই ঠিক কবে বেখেছিল। সম্পর্কে মঞ্জুব কি হয় তাও। কাজেই সে এখন এই ঘবে একা। মিনাব এখন হয়তো ঘুমিয়ে কাদা। মাব জন্য জেগে থাকার স্বভাব বহমানেব। মার কাজটাজ করে শুতে রাত হয়। বাড়িটাতে বাবা মা মারা যাবার পর মর্জিনা একা। বাঙালী মেয়েদের মতো খুব ঘবকুনো। সংসাব বাদে সে কিছু জানে না। সবাই শুয়ে পড়লেও সে জানে মর্জিনা ঘুমায় না। ওব চোখে ঘুম নেই। তবু বন্দীদেব একটা লিস্ট দেশে পৌঁছে গেছে। সে লিস্টে তাব নাম নেই। মর্জিনা জানে যুদ্ধক্ষেত্রে মানুষটা গেছে,

হয়তো একটা পেনসনও সে এত দিনে পেয়ে যেতে পারে। মর্জিনার কথা মনে হলেই সে কেমন ভেতরে ভেতরে ভীষণ অসহিষ্ণু হয়ে ওঠে। তার কিছু ভাল লাগে না। আবার সে গালিবের বিখ্যাত গজল থেকে কিছু আবৃত্তি করে সব ভুলে থাকতে চায়।

আসলে এখন সে বোঝেনা মানুষ হিসাবে সে কে? সে তো বাংলা ভাষা ছেলেবেলা মায়ের কাছ থেকে শিখে ফেলেছে। বাবা ছিলেন ধর্মভীরু মানুষ, এখন যদিও মনে হয় সে ইচ্ছে করলে তামাম ভারতবর্ষের মানুষ হিসাবে নিজের একটা পরিচয় দিতে পারত, তার বাবা কেন যে দেশ ছেড়ে বিদেশে গেলেন! আসলে বাবা এসেছিলেন কলকাতায়। তিনি ছিলেন উত্তর প্রদেশের মানুষ। আখের চাষ ছিল বাবার। তবু বাবা বেশী টাকার খোজে কলকাতায় এসে স্ক্র্যাপের ব্যবসা করে বেশ দু পয়সা করেছিলেন। তারপর কলকাতায় দাঙ্গা। দাঙ্গার সময় সে তার বাবার মুখের দিকে তাকাতে পারত না। বাবা সে সময় খুব ঘাবড়ে গেছিলেন। এবং কেন যে তার মনে হয়েছিল, নিজেদের জন্য একটা আলাদা দেশ না হলে বাঁচা যাবে না। তিনি নিজে উর্দুভাষী মানুষ বলে করাচি জায়গাটা বেশি পছন্দ করে ফেলেছিলেন। সে এখন ঠিক বুঝতে পারে না, কেন এমন হয়! মঞ্জু বলেছে সিন্ধুতে ভীষণ দাঙ্গা লেগেছে। রহমান যে কি করছে এ-সময়! সে কোন দেশের মানুষ নিজেও ঠিক করতে পারছে না। এবং এমন মনে হলেই তার পায়চারি বেড়ে যায়। চোখে ঘুম আসে না। সে তখন কি করবে ভেবে পায় না।

সিগারেটটা কখন নিভে গেছে। সে বুঝতে পারছে, অনেকক্ষণ ধরে সে তার বাড়ি, বাড়ির পাশে বড় ইদগাহের আজান, এবং মাজারে যারা মোমবাতি দিতে এসে বসে থাকে তাদের মুখ দেখতে দেখতে কখন যেন দেখে ফেলেছে মর্জিনা বসে আছে। সারা শরীর তার কালো বোরখায় ঢাকা। সে মাজারে মোমবাতি জ্বেলে দিচ্ছে। বাংলাদেশের কোন গঞ্জে অথবা মাঠে ওর মানুষটা দেশের জন্য শহিদ হয়েছে। এবং বেইমান মানুষেরা দেশটাকে দু টুকরো করে

কি যে লাভ পেল! এসব ভেবে মর্জিনার চোখ থেকে হয়ত ভীষণ একটা আক্রোশ ফেটে পড়ছে। যেন রহমানকে সে একটা গাছের নিচে ডেকে নিয়ে বলছে, তুমি তোমার আব্বার কথা মনে রেখ। তামাম হিন্দুস্থানের বিরুদ্ধে তোমার হাজার বছরের জেহাদ ঘোষণা থাকুক, না থাকলে রহমান আমি মরেও শান্তি পাব না।

মর্জিনা হয়তো খুব ভেঙ্গে পড়েছে। সে অন্যদের মতো বোধহয় আর কখনও ভাববে না তার খসম ফিরে আসতে পারে। সেজন্য সে নিজেকে হয়তো তৈরি করে ফেলেছে—অথবা যদি সে রাতে চুপি চুপি চলে যায়, সে গিয়ে বলে, মর্জিনা আমি এসেছি, আমি নিজেকে বন্দী বলে ঘোষণা করতে লজ্জা পেয়েছি, নানা-ভাবে আমি এসেছি সীমানা পার হয়ে। (তখন এমন অবস্থা যে কোম্পানির সৈন্যসংখ্যা কত তার হিসাব দিতে গেলে কমাণ্ডারের কপালে ঘাম দেখা দিত।) কে কোথায় মরে আছে কেউ ঠিক বলতে পারছে না। সে যে ডেজার্টার কে আর সেখানে তা প্রমাণ করবে। কেবল একটা কাজ, কাজটার কথা মনে হলেই ওর বুকটা ভয়ে কাঁপে। কাজটার বিরুদ্ধে সে কোনো অজুহাত দাঁড় করাতে এখনও পারেনি। তখন তার মাথা গরম হয়ে যায়। সে স্বদেশে আবার অপরাধীর তালিকায় না পড়ে যায়। এখন তার শুধু একটাই ভাবনা, একজন মানুষ এসেছে তাকে নিয়ে যেতে। সে যদি বাংলা দেশের সীমানা তাকে পার করে দিতে পারে তবে বাকিটা নসিবের সঙ্গে লড়াই। সে-লড়াইয়ে সে জিতে যেতেও পারে।

এখন আর কি করা! এই জানালায় সে ন'মাসের ওপর একা একা দাঁড়িয়ে এমনিই ভেবেছে। তার প্রতিটি গাছ লতা পাতা চেনা, আর একটু পরে আমড়া গাছটার নিচে কটা ডাহুক ডেকে উঠবে। চারপাশে তার কি কি গাছ আছে সে বলে দিতে পারে। কোন গাছে কোন পাখি কখন উড়ে আসবে সে বলে দিতে পারে। সব পাখিদের নাম সে এখন বলে দিতে পারে। ঝোপের

ভেতর দিয়ে বর্ষার জলটা রোজ কতটা করে বাড়ছে তার চেয়ে কেউ বেশি জানে না। একটা পাখি অথবা গাছের মতো সে এখানে নিরিবিলি বেঁচে আছে।

ক'দিন হল মশার উপদ্রবটা বেড়েছে। আর চারপাশে ঝোপ জঙ্গল বলে মশাটা একটু বেশি। তবু রক্ষা দু দিন আসমানে মেঘ নেই, সারাটা দিন কি সুন্দর রোদ। গাছপালার ভেতর দিয়ে রোদ নামলে কেমন জায়গাটা ভীষণ একটা দূরের পৃথিবী মনে হয়। সে চুপচাপ ঝোপ জঙ্গলের ভেতর তখন আউল বাউলের মতো ঘুরে বেড়াতে পারে। মঞ্জু বলেছে, মুর্শিদ তুমি যে বনটায় মানুষ ঢোকে না, যেখানে কেবল হেঁটে যাওয়া যায়, এবং আমাদের বাড়ি বলেই যেখানে যে কেউ যখন খুশি ঢুকতে পাবে না, সেখানে কেবল হাটতে পাব।

মুর্শিদ মাঝে মাঝে ভীষণ হা হা করে হাসে। এখন মঞ্জু, তার কমাণ্ডার-ইন-চিফ। মঞ্জু যা যা বলবে তাই তাকে করতে হবে। যেমন সে রোজ রোজ গোসল করতে চাইত না। সে তার স্বভাবে কিছুটা মরুভূমির মানুষ হয়ে গেছিল। স্নান ছ সাতদিন বাদে করার স্বভাব। কিন্তু মঞ্জু বলেছে—সাহেব তোমার এসব চলবে না। রোজ চান করবে। তোমাকে কেয়া একটা ঘাট দেখিয়ে দেবে সেখানে তুমি চান করলে কেউ দেখতে পাবে না।

মুর্শিদ বলেছিল, আমার কোন অসুবিধা হয় না মঞ্জু।

—তোমার না হলেও আমাদের হয়।

—কেন তোমাদের এমন হয়?

—চান আমরা অসুখ হলে করি না। তুমি একটা সুস্থ সবল মানুষ, চান না করে খাবে সে কি করে হয়!

—গোসল করতে খুব ডর লাগে।

—কোন ভয় নেই। না পার, কেয়া তোমাকে ডুব দেওয়া দেখিয়ে দেবে।

—কেয়া রোজ গোসল করে!

— করে না! তোমার মা তো বাঙালী ছিল, তিনি করতেন না।

—করতেন।

—বাবা।

—আব্বাও করতেন। কিন্তু ওখানে গিয়ে স্বভাব পাল্টে গেছিল। অত পানি পাব কোথায় ?

—এখানে তো আর পানির অভাব নেই।

—কিন্তু পুকুরে! ওর বাপরে! আমি পারব না। পুকুরে নেমে গোসল করার অভ্যাস আমার নেই।

—না থাকে, কেয়া আছে।

তারপর কমাণ্ডার-ইন-চিফ কেয়াকে পাঠিয়ে বলেছিল, মুর্শিদকে পুকুরে নিয়ে যা। চান না করলে গায়ে ভীষণ গন্ধ হয় ঘামে। কাছে যাওয়া যায় না।

কেয়া বলেছিল, ও যদি পুকুরে গোসল করতে গিয়ে ডুবে মরে—তবে কিন্তু আমি কিচ্ছু জানি না। তুমি ওটাকে পাঠাচ্ছ……আমার ভয় লাগে।

—তোমার ভয় নেই কেয়া। ঠিক দেখবে আমি ডুব দিতে পারব। কমাণ্ডার-ইন-চিফের অর্ডার। অর্ডার ইজ্ অর্ডার।

তারপর এক ভয়াবহ ব্যাপার। আসলে সে তো কখনও পুকুরে স্নান করেনি। ওদের বাড়িটা ছিল কিছু উষর অঞ্চলে। করাচি থেকে ট্রেনে যেতে হয়। আর এমন সমতল ভূমি সে পাবে কোথায়। এমন নির্মল জলই বা পাবে কোথায়। সে স্নান করতে নেমে সিঁড়িতে বসে ছিল কিছুক্ষণ। জলে তার মুখ দেখা যাচ্ছিল। এত বড় দীঘির মতো পুকুরে সে যেন নামতে ভয় পাচ্ছে। আর কেয়া কি আশ্চর্য তর তর করে সিঁড়ি ভেঙ্গে নেমে যাচ্ছে। ওর কি সুন্দর পা। ও কি সুন্দর করে শাড়ি পরতে ভালবাসে। চোখে কি যে আশ্চর্য এক লম্বা টান সুর্মার। সে কেমন কালো জলে সাদা ফুলের মতো ভেসে বেড়াচ্ছিল। কেয়া ডাকছিল, গোসল না করলে দিদি বলেছে ভাত দেবে না। বসে রয়েছ কেন মিঞা, এস। নামো। ডুব দাও।

—যা পানি। পানির অতল মেলা ভার। আমি আবার পড়ে যাব নাতো?

—পড়ে গেলে আমি কি করব!

—আমাকে একটু ধর না। বলে সে পা টিপে টিপে নিচে নামছে।

—আমার বয়ে গেছে।

—বয়ে গেছে! আচ্ছা কমাণ্ডার-ইন-চিফকে যদি না বলছি কথাটা!

—তুমি মিঞা এখনও সেই পাকিস্তানী আছো?

—না থাকলে উপায় কি। যা মানুষের পাল্লায় পড়েছি।

—তুমি মঞ্জুদিকে গাল দিলে!

—তোবা তোবা সে আমি পাবি। একটু থেমে মুর্শিদ মুচকি হেসেছিল। তারপব বলেছিল, মঞ্জুকে বলব, তুমি মঞ্জু এমন লোক দিয়েছ, যে আমার হাত ধরে পানিতে পর্যন্ত নামায় নি। আমি ডুবে মরে গেলে তোমার ভীষণ একটা কেলেঙ্কারী হবে।

— তোমাকে আমি হাতে ধরে নামাব না বলেছি!

—তবে! কিন্তু কেয়া ওকে হাত ধরে বাচ্চা ছেলের মতো নামাতে গেলে বলল, ঠিক আছে, ছাখো না পারি কিনা। সে একা একা বেশ কোমর জলে নেমে গিয়েছিল। কিন্তু সে যতবার ডুব দিতে যাবে ততবার কেয়া দেখেছে গলা পর্যন্ত ডুবে যায়। মাথাটা কিছুতেই জলের নিচে ডুয়ে যেতে চায় না। মুর্শিদ নানাভাবে চেষ্টা করছিল। কেয়া পাশে দাঁড়িয়ে ভীষণ রেগে যাচ্ছে। এক দুই তিন, ডুব। বা এটা ডুব হল?

—হল না!

—কৈ মাথা ডুবেছে।

—ডোবেনি।

—তোমার মাথা মিঞা। আমি পারব না, পারব না!

তখন পাড়ে মঞ্জুর গলা, কি হয়েছে রে?

—কি হবে আবার, ছাখো না এসে কি হয়েছে! কেয়ার কান্না কান্না গলা।

মঞ্জু কাছে গেলে বলল, দেখবে কেমন ডুব দিচ্ছে!

কেয়া যেন এখন হাবিলদার মেজর। বলল, আবার এক. দুই, তিন, ডুব! আবার জলের ওপর দাঁড়িয়ে চিৎকার কেয়ার, ওটা, ডুব হল!

মুর্শিদ ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়েছিল একবার কেয়ার দিকে, আবার মঞ্জুর দিকে। মঞ্জু বুঝতে পারল মুর্শিদ পারছে না। ভীষণ ভয় পাচ্ছে জলের নিচে মাথা ডোবাতে। বোধ হয় ওর নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে যাবার একটা ভয় ভেতরে আছে। তা ছাড়া এটা যে কত বড় অভ্যাসের ব্যাপার এখন মঞ্জু পাড়ে দাঁড়িয়ে বুঝতে পারছে। অথচ এখনও মনেই হয়নি মানুষ জলের নিচে ডুবে স্নান করতে পারে না।

মঞ্জু বলেছিল, ঠিক আছে, একদিনে হবে না। মুর্শিদ তুমি শরীরটা মুছে ভাল করে পাড়ে বসে মাথাটা ধুয়ে নাও।

কেয়া কেমন হয়ে গেল। পাড়ে উঠে শাড়ি থেকে জল নিঙড়াতে নিঙড়াতে বলল, তুমি এলে বলে। না হলে ওকে দেখাতাম গোসল কাকে বলে।

মুর্শিদ মঞ্জুকে উদ্দেশ্য করে বলল, মঞ্জু, কেয়া ভীষণ ক্ষেপে গেছে। দুটো ভাত সে আজ বেশি খাবে।

— ঠিক আছে মিঞা, তোমায় আর উপদেশ দিতে হবে না। কাল মজা দেখাব।

পরদিন কেয়া ভেবেছিল, মুর্শিদ ডুব না দিতে পারলে জলে দাড় করিয়ে রাখবে। কিন্তু যেই না বলা, এক, দুই, তিন, ডুব। বেশ ডুবে গেল। তারপর ভোঁস করে নাক ভাসিয়ে বলল, কি ঠিক আছে কেয়া!

কেয়া একেবারে স্তম্ভিত। বলল, মিঞা মঞ্জুদিকে বলে দেব সব। তোমার ক্যামোফ্লেজ ভেঙ্গে দেব।

—কি বলবে?

—বলব, বিশ্বাসঘাতক।

— বিশ্বাসঘাতক মানে?

—বিশ্বাসঘাতক মানে, যাকে বিশ্বাস করা যায় না।

—অঃ। বলেই মুর্শিদ তর-তর করে সিঁড়ি ধরে উঠে গেল। বাংলাদেশে এসে সে যে আগেই এ-সব রপ্ত করে নিয়েছিল, কেয়া অথবা মঞ্জুকে কিছুতেই বুঝতে দেয়নি। সে বলল, গোসল না করিয়ে যখন ছাড়বে না, তখন আর কি করা। গোসল করেই ভাত ডাল চানা যা হয় কিছু খাব। তারপর বলল, কি যেন মঞ্জু বলে, পড়েছি যবনের হাতে·····

কেয়া বলল, আমরা যবন, না তোমরা যবন।

—সবাই আমরা যবন, সবাই আমরা কাফের, জায়গা মতো সবাই আবার আমরা মানুষ কি ঠিক না!

কেয়া মানুষটার ভেতর কিছু এলেম আছে এটা বুঝতে পেরে চুপ করে গেছিল সেদিন।

মঞ্জু খাটে বসে বেশ জোরে জোরে নিশ্বাস নিতে থাকল। সে বেশ ছুটে এ-ঘরে এসেছে। সে কি বুঝতে পেরেছিল অজু মঞ্জুকে শৈশবের কথা বলে বলে কিছু একটা করে ফেলবে! সেটা তার নানাভাবে খুব সহজ হয়ে গেছে। অজুর কাছে তার ভীতির কিছু নেই। অজু বরং আগের মতোই আছে। মঞ্জু ওর সামনে বসে এটা টের পেয়েছে।

অথচ সে যে ছুটে এল কেন! আসলে মনে মনে সে নিজেকে বিশ্বাস করতে পারছিল না। ভেতরে ভেতরে তার আশ্চর্য হাহাকার। প্রায় দু বছরের কাছাকাছি সে অবনীকে হারিয়েছে। অথচ শরীরের ভেতরে তেমনি কীটেরা ঘুরে বেড়ায়, রক্তে তাদের চলাফেরা সে টের পেলে বুঝতে পারে মাঝে মাঝে আকাঙ্ক্ষার অসহ্য জ্বালা শরীরে। সে তখন কেমন দিশেহারা হয়ে যায়, এবং মনে হয় সংসারে সে ভারি একা হয়ে গেল।

মঞ্জু একটা ডিম আলো জ্বেলে রাখে। তার ভেতর মঞ্জুকে ভীষণ রহস্যময়ী লাগে। সে বসে আছে খাটে। দু পা মেঝেতে ঝোলানো।

শাড়ির আঁচল একটু আলগা। দেখলেই মনে হয় মঞ্জু ভীষণ কিছু ভাবছে। তার আর ঘুম আসবে না। অজুর শরীর এখনও তেমনি সুন্দর। অজুর তেমনি চোখ না তুলে কথা বলার অভ্যাস। এত রাতে মঞ্জু তার ঘরে একা, সে ভীষণ তাতে অস্বস্তি বোধ করছিল। মঞ্জু তো অজুর সমবয়সী, না, মঞ্জু তার কিছু ছোট হবে! মা বলতেন, অজু তোর দু বছরের বড়। অজুকে তুই কাকা ডাকবি। মঞ্জু কেমন ঠোঁট বাঁকিয়ে এবার হাসল।

ঘুম ভেঙ্গে গেলে মঞ্জুর কিছু কাজ থাকে। যেমন দেখা, ও-ঘরে নীলুর শরীরে চাদর আছে কিনা, অথবা গরমে নিলু ঘামলে চাদরটা মঞ্জু ফেলে দেয়। পাখার হাওয়া কমিয়ে, সে নিজে নিচে দাঁড়িয়ে টের পেতে চেষ্টা করে মাথায় হাওয়ায় নীলুর শীত করে কিনা। এবং মঞ্জু জানে, এ-ঘরে গেলেই সে কেয়াকে দেখতে পাবে—কি নিরীহ মুখ মেয়েটার। স্কুল থেকে সবে পাশ করেছিল, এবং তাকে শহরে পাঠিয়ে দেবে বোর্ডিং-এ কথা ছিল। কেয়া কলেজে পড়বে এমন বাসনা জব্বার কাকার। ঘুমিয়ে থাকলে কেয়াকে আরও নিরীহ দেখায়। শিশু বয়সে কেয়া তার মাকে হারাবার পর থেকেই এখানে আছে।

জব্বার কাকা জেলে। জেল থেকে বের হয়ে এলে, তিনি বিবির কাছে যেতে সাহস পাননি। তিনি ছিলেন দাগি চোর, চোরের যা স্বভাব, জেল থেকে বের হয়ে এলেই আবার জেলে যাবার ইচ্ছে, কিন্তু সেবারে কি হল বাবার. বাবা বললেন, জব্বার তুই আমার এখানে থাকবি। খাবি। উদখলে ওষুধ বানাবি। জেলে যাবি না।

—আমার বিবি কি খাবে?

—তুই যা খাবি।

—বাচ্চাটা।

—বাচ্চাটাও তাই খাবে।

—অষুধপত্র। বিবির হাত পা ফোলা।

—হারামজাদা! অষুধপত্র নিয়ে তুই কবে পয়সা দিয়েছিস!

আসলে জব্বার কাকার সঙ্গে বাবার কি একটা আতাঁত ছিল।

শিশু বয়েস থেকে, থেকে গেলে যা হয়, কেয়ার জন্য এ সংসারে প্রথম প্রথম বেশ ভিন্ন ব্যবস্থা ছিল। তার আলাদা ঘর, সে এ-সব ঘরে ঢুকতে সাহস পেত না। সে সব সময় বাইরের মানুষের মতো এ-বাড়িতে থাকত। কিন্তু অবনী কি বুঝেছিল, এটা বুঝি ঠিক না, কেয়াকে তো আর আলাদা করে ভাবা যায় না। সে বেশ আছে এ-বাড়িতে। নিজের মতো করে যখন আছে তাকে দূরে ঠেলে ফেলে দেয়া কেন।

যেহেতু গ্রামটা ছিল নির্জন, জব্বার কাকা ছিল সমাজের বাইরের মানুষ তাই বোধ হয় বশির মিঞা কিংবা অন্য মাতব্বরদের পাশাপাশি গাঁয়ের তেমন মাথাব্যথা হয় নি। স্কুলে যাবার সময় কেয়া ছিল মঞ্জুর সঙ্গী। ওরা দুজনে কথা বলতে বলতে চলে যেত এক মাইলের মতো রাস্তা। আবার ফিরে আসত। যতদিন রাস্তাটা পাকা হয়নি ততদিন এমনটা ছিল। কেয়াকে মঞ্জুর দরকারও ছিল। এমন মেয়ের একা এমন বাড়ি থেকে এতটা পথ স্কুল করতে যাওয়া অসুবিধাই ছিল। বরং কেয়াই ছিল তখন তার নির্ভর করার মতো মেয়ে। মঞ্জুর সব সময় যেন একটা চারপাশ থেকে ভয় ছিল। বাবা মরে গেলে অবনী তো আর তেমন দাপট নিয়ে কবিরাজী করে যেতে পারেনি।

এসব কথা মঞ্জুব মনে হচ্ছিল। কারণ সকাল হলেই অজু নানা-ভাবে তাকে ভিন্ন ভিন্ন প্রশ্ন করে যাবে। তার প্রত্যেকটা জবাব সোজাসুজি হওয়া চাই। কারণ মঞ্জু এটা ভেবে থাকে সে অজুর মতো মানুষের সঙ্গে কোন ছলনা করতে পারবে না। আর ছলনা করার কি আছে! অবনী বেঁচে নেই ওর এমনিতে বোঝা উচিত ছিল। অবনী ওর স্বামী, এটা অজু জানে না, সে জানত না। নানা-ভাবে দেশের মানুষের সঙ্গে দেখা হয়ে যাবার কথা। কেউ না কেউ খবর ওকে পৌঁছে দিয়েছে এমন ধারণা ছিল মঞ্জুর। অজু যে একেবারে অন্ধকারে ছিল, আর অজু যে মনে মনে এখনও সেই টানে

পড়েই চিঠি পাওয়া মাত্র ছুটে এসেছে সে সেটা বুঝতে পেরে প্রথম বিস্মিত হয়েছিল।

সে এবার উঠে দাঁড়াল। দরজা পার হয়ে জানালায় দাঁড়ালে একটা বাঁধানো সিঁড়ি পূবের ঘাটের। অব্যবহারে ঘাটে শেওলা জমেছে। দুপাশে জঙ্গল। সেখানে একটা আলো জ্বালা থাকে। আলোটা বেশ উজ্জ্বল। এতদিন সে জানালায় এসে দাঁড়াতে পর্যন্ত ভয় পেত। এমন একটা ঘটনা জীবনে ঘটে যাবার পর চারপাশে কেমন তার ভয়াবহ সব ছবি সব সময় ঝুলে থাকে। অন্ধকার দেখলেই সে দূরে সরে দাঁড়ায়। আজ অনেকদিন পর এখানে আলো জ্বলছে, চারপাশটা কি সুন্দর দেখাচ্ছে, দূরের আকাশটা পিটকিলা গাছের ভেতর দিয়ে দেখা যায়—এবং এমন যখন নিরিবিলি আকাশ তখন সে এত একা, আর সারাজীবন এ-ভাবে কেটে যাবে সে ভাবতে পারে না। সে কেন যে অজুকে লিখেছে আসতে! ওর নিজেরই তো সংকোচ হবার কথা। অজু শৈশবে বলেছিল, মঞ্জু আমি বড় হলে তোকে বউ করব। তুই রাজী।

কাল ওর একটা কথাই হবে অজুর সঙ্গে, অজুর মনে আছে কিনা সেই কথাটা। পরশু সে মুর্শিদের সঙ্গে দেখা করিয়ে দেবে। যদি অজুর মনে থাকে কথাটা তবে অজুর ওপর প্রথম ভার—তুমি অজু ওকে পৌঁছে দাও। ওকে এমনভাবে কলকাতায় নিয়ে যাও, যেন সে তোমার নিজের কেউ। এখন ইণ্ডিয়া থেকে লোক প্রচুর আসছে। এতটা কড়াকড়ি নেই। ওকে তুমিই নিয়ে যেতে পার। সে এখন নিরুপায়। বোকার মতো কাজটা করে সে ভেবে পাচ্ছে না ঠিক করেছে কি বেঠিক করেছে। কেন যে সে আমার জন্য নিজের জীবনে এমন একটা বিপদ ডেকে আনল!

অজু, আমার আর ঘুম আসবে না। তোমার চোখ দেখে আমি বুঝতে পেরেছি তুমি আমাকে ভুলে যাওনি। তুমি আমার সেই শৈশবের অজু। তোমাকে আমি লুকিয়ে চা খাইয়েছিলাম। আজকে দেখার পর মনে হয়েছে, লুকিয়ে তুমি সব কিছু করতে পছন্দ কর।

মঞ্জুব এই সেপ্টেম্বরের রাত্রিতে বেশ শীত শীত করছিল। সেপ্টেম্বরের এটা প্রথম সপ্তাহ। এখন এ-অঞ্চলে আর পূজো হয়না। সাত আট মাইল দূরে পানামের পোদ্দারেরা এখন পূজা চালিয়ে যাচ্ছে। আগে ভুইঞাা বাড়িতে পূজো হত, পূজো হলে এটা মহালয়া-টয়া হোত। তার এখন হিসেব পর্যন্ত নেই কবে মহালয়া—তবে জব্বাব কাকা সব মনে করি[illegible]দেয়। ডিসপেনসারিতে একটা পাঁজি থাকে, সেটা দেখে যখনকার যা করার তিনি কবেন। জব্বার কাকা এ-বাড়ির এতদিনের আচার অনুষ্ঠান বন্ধ হয়ে যাক চান না।

মঞ্জুব সব ব্যাপারটাতেই ছিল ভীষণ আলগা আলগা ভাব, অবনীর মৃত্যুব পর এটা তার হয়েছিল। কিন্তু পরে যখন, মেজর সাবেব কাছে পৌঁছে দেওয়াব দায়িত্ব দিল মুর্শিদের তখন বোধহয় মনে হয়েছিল, এ-ভাবে বাঁচলে, সব নষ্ট হয়ে যাবে তার! মঞ্জু জানালায় দাঁড়িয়ে মনে করতে পাবল, প্রথম দিন প্রায় সে সংজ্ঞা হারিয়ে ফেলেছিল। বাড়িতে তাকে পৌঁছে দেওয়া হয়েছিল ভোর রাতের দিকে। নীলুর ঘুমেব ভেতর সে গেছে, নীলু টেব পায়নি, তার মা বাড়ী নেই। মাইল পাঁচেক দূবে কোম্পানী কমাণ্ডারের ওপর তার ভার। তাকে নিয়ে যাওয়া কারো কাছে, আবার রাত পোহাতে না পোহাতে পৌঁছে দেওয়া। সে বেশ চতুর, সেখানে কোথাও কেয়া আছে, থাকতে পারে এমন ধারণা। কেয়াকে মেরে ফেলতেও পারে। কেয়ার জন্য যতনা, তার কষ্টেব কথা ভেবে আরও বেশি, মেয়েটা এখনও এ-সবেব কিছু জানে না, সে সংজ্ঞা হারিয়েছিল, আর মেয়েটা হয়ত মরেই যেতে পাবে, মবে যাওয়া খারাপ না, সে নিজেও তা কবলে পাবত, কিন্তু আকাঙ্ক্ষার ভেতর আছে এক কঠিন কামনা, সে অবনীর মৃত্যুর পর পাঁচ সাত মাসও যায়নি, ভেতরে ভেতরে কোন সুপুরুষের জন্য তার ভীষণ লুলুপতা ছিল—তাকে সেখানে নিয়ে যেতে থাকলে সে বেশ চতুর রমণীর মতো মেজরকে নিজের মানুষ করে এক আশ্চর্য গোপনীয়তা ভেঙ্গে কেয়াকে পরে ফিরিয়ে এনেছিল। এ-ব্যাপারে মুর্শিদ ছিল তার একান্ত সহায়। মুর্শিদের

ঋণ সে কিছুতেই শোধ করতে পারবে না। নিজের কথা সে এখন যত না ভাবে—এই মানুষ মুর্শিদের জন্য এখন তার বেশি ভাবনা।—সে জানালা থেকে সরে এসে ভাবল, কাল অজুকে এই অভিযানের কথা হুবহু সে বলে যাবে, বলে যাবে না, যা লিখে রেখেছিল প্রতিদিন, সেটা ওর কাছে ফেলে দেবে। সেতো মেয়ে, সেতো সব তাকে বলতে পারবে না। তারপর আবার একদিন খোঁজ হয়েছিল কেয়ার। সে অন্য মেজর। মুর্শিদ এলে বলেছিল, সে নেই, আমি আছি।

মঞ্জুর সকালবেলা ঘুম ভাঙতে একটু দেরি হয়ে গেল। সে উঠে দেখল, বারান্দায় অজু বসে রয়েছে। মঞ্জু যে দরজায় দাঁড়িয়ে আছে সে লক্ষ্য করছে না। সামনে ঘাসের লন, জব্বার কাকা ঘোড়া বের করে নিয়ে যাচ্ছে। জব্বার কাকার এখন অনেক কাজ। অজু জব্বার কাকার সঙ্গে দুটো একটা কথা বলছিল। জব্বার কাকা এখন এ-দেশে মাছ আর দুধের কি যে আকাল তাই বোঝাচ্ছেন অজুকে।—আর সে কাল নাই। এমন বলছেন। জব্বারকাকা তারপর ডাক-ঘরের তালা খুলে দিলেন! মাস্টার সাহেব এখুনি এসে যাবেন। তার আগে মেলব্যাগ নিয়ে আসে ইসমাইল। দরজা খোলা না পেলে সে বাইরে দাঁড়িয়ে থাকে। ডাকঘরের ভেতরে পার্টিশান করা। মাস্টার সাহেব এসে পার্টিশানের দরজা খোলেন। এ-পাশে তখন ইসমাইল। সে একটা টুলে বসে থাকে। যতক্ষণ মাস্টার সাহেব না ডাকবে ততক্ষণ সে এভাবে বসে থাকবে। বোধহয় অজু সবই দেখছিল বসে। সে কি কি পরিবর্তন, হয়ত এখন লক্ষ্য করছে। অথবা সে হয়তো ভাবছে সেই পুরোনো ট্রেডিশানই চলছে। যেমন চশমাটা খুলে প্রথম পোষ্টমাস্টার চাবি দিয়ে গোনে গোনে সিল বের করে দিতেন এখনও সে দেখতে পাবে তেমনি আতাউর সাহেব খুলে দিচ্ছেন সিল, রেজিস্টার খাতা, স্ট্যাম্পের হিসাব। টাকার হিসাব যেমন যেভাবে হরেন মাস্টার করত, এও তেমনি করে যাচ্ছেন।

অজু সিগারেট খাচ্ছিল। এখন শরতের সকাল বোঝাই যায়।

শেফালি গাছটা কতকালের। নাকি পুরোনো গাছটা মরে গিয়ে নতুন একটা হয়েছে! ডাকঘরের পেছনে গাছটা তেমনি দাঁড়িয়ে আছে। সকালে ফুল তোলার কথা মনে হলে নিশ্চয়ই অজু গাছটার নিচে কিভাবে সে ফুল তোলার জন্য ছুটে আসত মনে করতে পারবে। আসলে সে কি আর তেমন আছে! তার কি এসব এখন আর ভাল লাগবে! মঞ্জু এবার বলল, কি ব্যাপার খুব সকাল সকাল উঠে বসে আছ?

—তুমিও তো বেশ সকালে ওঠো দেখছি।

—আরও সকালে ওঠার অভ্যাস, আজ বরং দেরি হয়ে গেছে।

—আমার অনেক দেরি করে ওঠার অভ্যাস মঞ্জু। কিন্তু খুব সকালে কেন যে ঘুম ভেঙ্গে গেল!

—মঞ্জু বলল, ঘুরে ফিরে ছাখো—বিকেলে তোমাকে নৌকা করে নিয়ে যাব। গ্রামের চারপাশটা ঘুরে দেখতে পাবে!

অজু বলল, ঘুম থেকে উঠেই কিন্তু আমার চা লাগে।

—হাত মুখ ধোবে না?

—পরে।

—কেয়াকে ডেকে দিচ্ছি। ও তোমার ব্রাস টুথপেস্ট বের করে দিক।

—আরে না, তোমার ব্যস্ত হতে হবে না। স্নান করার সময় আমার দাঁত মাজার অভ্যাস।

—শহুরে মানুষেরা বুঝি এ-ভাবে তবে সকালে দাঁত না মেজে থাকে।

সেই অনেক দিনের পুরানো স্মৃতি মনে হয় কিনা অজুর, অজু এমন কথায়, সেই আশ্চর্য দিনগুলো ফিরে পায় কিনা দেখার জন্য যেন মঞ্জুর এমন বলা। অজু হাসতে হাসতে বলল, শহরে থাকলে বুঝি ছোট ছোট মেয়েদেরও চা খেতে হয়।

—তোমার সব মনে আছে অজু।

—সব।

মঞ্জুর মুখ হাসিখুশি দেখাল। সকালবেলাতে মঞ্জুর মুখ আরো তাজা লাগল দেখতে। মঞ্জু উঁচু লম্বা মেয়ে। ওর চুল এত বেশি যে খোলা রাখলে পিঠ দেখা যায় না। অবনীর মৃত্যুর পর সে বেশি দামের শাড়ি পরে না। খুব সাধারণ শাড়ি, সাদা জমিন, নীল পাড়, খুব উজ্জ্বল সাদারঙ অথবা হলুদ রঙের পাড় এখন মঞ্জুর পছন্দ। সে কাল একটু হলুদ রঙের পাড় দেয়া শাড়ি পরেছিল! এমনিতেই মঞ্জুর রঙ আশ্চর্য রকমের উজ্জ্বল, তার ওপর সাদা শাড়ি ওকে ভীষণ পবিত্র করে রাখে। মঞ্জু বলল, আমার এখনও হাসি পায়।

—কি হাসি পায়?

—ঐ যে তোমাকে ডেকে বললাম, অজু কাকা চা!

—তখন আমাদের ছোট বয়সে চা খাওয়া বারণ ছিল মঞ্জু।

—কি গোপনে, যেন তুমি চুরি করে একটা ভীষণ অপরাধ করছ।

অজু বলল, তাই মঞ্জু। তুমি চা খাও শুনে মনে হয়েছিল, শহরে থাকলে এসব হয়। গ্রামের ছেলেদের এসব মানায় না।

তারপর মঞ্জু কি বলতে বলতে চলে গেল, সে বুঝতে পারল না। ঘোড়াটাকে নিয়ে অর্জুনগাছের নিচে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। এখন চারপাশে জল বলে ঘোড়াটা বাড়ির চারপাশেই ছাড়া থাকে। কোথাও যেতে পারে না ঘোড়াটা। সে চারপাশে ঘাস খেয়ে পেট ভরে গেলে অর্জুনগাছটার নিচে এসে শুয়ে থাকে। জব্বার কাকা এমন সব বলে সেন বাড়ির সব খবর যেন অজুকে দিচ্ছিলেন।

মঞ্জুর চলে যাওয়ার ভেতরও এক ভীষণ টান থাকে। যেন যতক্ষণ মঞ্জু ফিরে না আসবে ততক্ষণ সে ওর আসার আশায় বসে থাকবে। মঞ্জু এখন চা করতে গেছে। ওর উচিত ছিল প্রথম জিজ্ঞাসা করা নীলু কেমন আছে। রাতে ওর ভাল ঘুম হয়েছে কিনা। হার্টের অসুখে ঘুম ঠিক হয় কিনা, না রাত জেগে কষ্ট পায়—এসব সে অনভিজ্ঞ মানুষের মতো জানতে চায়। অথচ

সে এ-সব না বলে স্বার্থপরের মতো বলল, আমার চা। আর আশ্চর্য মঞ্জুও ছেলেবেলার কথা মনে করতে পেরে খুশি—তার মুখে এই সকালে নীলুর জন্য সত্যি কোন দুঃখ জেগে ছিল না। সে যেন আবার আগের আমাদের মঞ্জু হয়ে গেছে।

অবনী বলত, ওর বাপটাই বুঝলি যত নষ্টের গোড়া। টের পেয়েছে মঞ্জু এলে আমরা বাড়িটার চারপাশে ঘুর ঘুর করি।

সে বলছিল, তোর মাথায় বুদ্ধি বটে অবনী! আমাদের ভয়ে সেন কাকা মঞ্জুকে আসতে বারণ করেছে, আর মানুষ পেলি না!

অবনী বলত, তোরা সেন দাদাকে বলবি, ওকে তো নাগাল পাব না, ওর ঘোড়ার ঠ্যাঙ ভেঙ্গে দেব। কেউ টের পাবে না।

তার পক্ষে সেন দাদাকে কিছু বলা সম্ভব ছিল না। স্কুলে সেন দাদার সুপারিশে বিনা বেতনে সে পড়ত। সেনদাদা মাঝে-মাঝে তাকে ডেকে পড়াশুনা কেমন হচ্ছে জিজ্ঞাসা করতেন। ভাল রেজাল্ট না করতে পারলে বিনা বেতনে পড়া সম্ভব হবে না এসব বলতেন। যেন ভাল ফল হয়, সেজন্য সে খুব মনোযোগ দিয়ে পড়াশুনা করত। সেনদাদা মানী লোক তার মান থাকবে না ভাবতে ভীষণ খারাপ লাগত ওর।

কখনও কখনও ডেকে সেনদাদা ওর হাতে টাকা দিতেন, বলতেন, চা আনবি। ব্রুকবণ্ড চা। ওর স্কুল ছিল গঞ্জের মতো জায়গায়। মাইল তিনেক দূরে স্কুল। সে যখন লাফিয়ে লাফিয়ে নেমে যেত, কাঁধে ব্যাগের ভিতর বই, তখন আবার সেনদাদা হাসতেন।—কত আনবি শুনে গেলি নাতো। সে নিচ থেকেই বলত হাফ পাউণ্ড।

—হাফ পাউণ্ড হলে চলবে না। এক পাউণ্ড আনবি। মঞ্জু, মঞ্জুর কাকারা এসেছে। সে তখন পেছন ফিরে ভাল করে তাকালেই বুঝতে পারত, ডানদিকের ছোট্ট ঘরের জানালাতে মঞ্জু উঁকি দিয়ে আছে। মঞ্জুকে দেখলেই ওর বুকটা ধড়াস করে উঠত।

স্কুল থেকে ফেরার পথে ওর হাতে থাকত হলুদ রঙের প্যাকেট।

হলুদ জ্যাকেটে মোড়া। রূপোলি রাংতায় মোড়া, ভেতরে অদ্ভুত অলিভ ওয়েলের মতো রঙের পাতা বুঝি। মাঝে মাঝে নাকের কাছে নিয়ে এলে কেমন একটা সুন্দর গন্ধ। ওর কাছে গন্ধটা ছিল তখন রোদের ভেতর কলমিলতার ঘ্রাণের মতো। অবনী ঘোড়াটার পা ভাঙতে না পেরে রাগে দুঃখে ওর হাত থেকে একবার প্যাকেটটা থাবা মেরে ফেলে দিয়েছিল। তারপর প্যাকেটটা নিয়ে ফুটবল খেলার মতো খেলতে গেলে ওর প্রাণে কি যে ভয়। তাড়াতাড়ি সে লাফিয়ে ওর পায়ে পড়ে দুটো পা জড়িয়ে ধরেছিল, যেন দ্বিতীয়বার আর পা ছুড়তে না পারে অবনী।

অবনী তখন মাঠে চিৎকার করে বলেছিল, তুই একটা চাকর অজু। তোর জন্য আমাদের মান সম্মান থাকবে না।

ওর মনে আছে, তারপর থেকে সেনদাদা চা আনতে দিলে, সে কিছুতেই অবনীর সঙ্গে ফিরত না। সে একা একা মাঠ পার হয়ে চলে আসত।

অথচ এক আশ্চর্য বিকেলে চায়ের প্যাকেটটা এনে সেনদাদার হাতে দিলে কে যেন ফিসফিস গলায় ডেকেছিল! খুব ইসারায়। সেনদাদা খড়ম পায়ে হেঁটে যাচ্ছিলেন বলে শুনতে পাননি। সে চারপাশে তাকিয়ে দেখেছিল, না কেউ নেই, সে তখন বারান্দা থেকে নেমে আসবে, আবার ডাক, এই অজু শোনো। সে দেখেছিল, সামনেই আছে মঞ্জু। আমলকি গাছটার নিচে দাঁড়িয়ে আছে। রোদের ভিতর এক রঙ থাকে, গন্ধ থাকে, সময় সময় তা ধরা যায়— মঞ্জুর চোখ মুখ দেখে সে তেমন কিছু যেন ধরতে পেরেছিল। সে কিছুতেই তাকে পার হয়ে আসতে পারেনি। কারণ সে মঞ্জুর এমন মুখ দেখলেই টের পায়, আবার নিশ্চয় কিছু মঞ্জুর মাথায় দুষ্টু-বুদ্ধি খেলছে। সে তাকে নিয়ে কোথাও যাবে। তাকে নিয়ে যেমন শিশুরা নিজের খুশিমতো পুতুলের বিয়ে দেয় তেমনি তাকে নিয়ে মঞ্জু যা খুশি করবে। বোকার মতো একটা সামান্য পুতুল হয়ে যাবে মঞ্জুর কাছে।

মঞ্জু বলেছিল, হাতে করে চা এনেছো, একটু চা খেয়ে যাবে না! এস ভেতরে বসবে।

চা খাওয়া ছিল তখন ওদের বারণ। চা খেলে অজীর্ণ রোগ হয়। ওর ঠাকুর্দা চা সম্পর্কে এমন একটা ফিরিস্তি দিয়েছিল, চা মানে সিগারেটের সমতুল্য। চা একটা পাজি নেশা। প্রায় যেন এটা গ্যাঁজাব নেশার কাছাকাছি। এত বড় একটা পাপ কাজ মঞ্জু তাকে করতে বলছে। অবশ্য সে জানে মঞ্জুর জন্য নানাভাবে অনেক পাপ কাজ সে করেছে। মঞ্জুর জন্য তখন সে সব করতে পারত। তবু যেন একটা নিষিদ্ধ ব্যাপার ঘটতে যাচ্ছে, ওব আর মঞ্জুর মধ্যে। মঞ্জুকে সে খুব ধীরে ধীরে বলেছিল, ছোটরা চা খায় না মঞ্জু।

মঞ্জু বলেছিল, ছোটরা অনেক কিছু খায় না। তুমি আর ছোট নও। ছোট থাকলে খেতে বলতাম না। বলে মুচকি হেসেছিল মঞ্জু।

কি যে এক অতীব ভালবাসার রঙ তখন মঞ্জুর চোখে মুখে। সে তখন সব টের পেত। সে যে বড় হয়ে গেছে, আশ্চর্য, মঞ্জু তা কিভাবে যে বুঝে ফেলেছে। মঞ্জু বলেছিল, তুমি একটু বোস অজু। তারপর হাত ধরে বলেছিল, ভেতরে এস না, লজ্জা কি। বলে মঞ্জু ওর ছোট্ট সাজানো ঘরটাতে নিয়ে গিয়েছিল! বলেছিল, এখানে এলে আমি থাকি। এই আমার খাট। আমি একা শুই। আমার একা শুতে এখন ভয় করে না। একটু থেমে আবার মঞ্জু বলেছিল, তুমি রাতে একা শোও।

সে বলেছিল, না।

– কে থাকে?

—মা।

মঞ্জু কেমন বিস্মিত হল। চোখ ওপরে তুলে বলল, অমা! তুমি এখনও মার সঙ্গে শোও।

সে বুঝতে পারেনি, মার সঙ্গে শুলে কি অপরাধ! কেন যে মঞ্জু এ-ভাবে চোখ কপালে তুলে বিস্ময় প্রকাশ করছে! সে বলেছিল, মার সঙ্গে শুয়েছিতো কি হয়েছে।

—বড় হলে মার সঙ্গে আর শুতে নেই।

—মাকে ছাড়া শুলে আমার ঘুম আসে না। অজু তখন সোজা-সুজি কথাটা না বলে পারেনি।—মাকে বাদে শুলে মনে হয়, আমি একা। মা আমার পাশে নেই, কেমন ফাঁকা ফাঁকা লাগে। আমার তখন ভেতরে ভেতরে কান্না পায়।

—তুমি মাকে ছেড়ে কোথাও গিয়ে থাকোনি ?

—থেকেছি। কিন্তু খুব খারাপ লেগেছে। বাড়ি না ফেরা পর্যন্ত আমার মনটা ভাল হতনা।

সহসা মঞ্জু কি ভেবে বলেছিল, দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কথা বলছ কেন ! আমার বিছানায় উঠে বোস না। লজ্জা কি। বোস না।

চারপাশে নানারকমের ছবি। দেয়ালে ব্যাডমিণ্টনের র‍্যাকেট ঝুলছে। শীতকালে অঞ্জু পিসি, মঞ্জু এবং ঢাকা থেকে মণ্টু, দেবী এলে ওরা সামনের লনে খেলা করে। অজুর মনে হত তখন কি আশ্চর্য খেলা। ওরা সাদা পোশাক পরে সবুজ লাল একটা সাদা নেট টানিয়ে সাদা কর্কে খেলা করত। কি সুন্দর যে লাগত তখন গোটা বাড়িটা। এমন সুন্দর লাল রঙের ইটের বাড়ি, সামনে সবুজ লন, লনে দুটো মেয়ে সাদা ফ্রক গায়ে দিয়ে দুটো ছেলে সাদা কেড্‌স পরে অনবরত ছোটাছুটি করছে। অজুরা কাছে পর্যন্ত যেতে সাহস পেত না। শহরে যারা থাকে তারা খুব অহংকারী হয়। অজুরাও কম যায় না এ ব্যাপারে। ওরা দূরে তখন ফুটবল এ ওর কাছে ছুড়ে মারত। আসলে তখন অজুদের ইচ্ছা ছিল, ওরা কে কতটা বল ছুড়ে দিতে পারে মঞ্জু অঞ্জু দেখুক। ওরা বাড়ির ভেতরে না গেলেও কাছাকাছি থাকতে ভালবাসত।

মঞ্জুর মার ছবি দেয়ালে। মুখে খুব একটা ঘোমটা নেই। বিয়ের পরে পরেই ছবিটা তোলা হয়েছিল বোধ হয়। মঞ্জুর মা বয়সকালে ঠিক মঞ্জুর মতোই দেখতে ছিল। ছবিটা দেখলে ওর তখন এমন মনে হত। মঞ্জুদের পুরোহিত বংশের ছেলে সে। সব সময় সম্মান দিয়ে কথা বলার স্বভাব মঞ্জুর মার। মঞ্জু ওর মার সামনে তাকে নাম ধ'রে

ডাকছিল বলে এক ধমক, তুমি ওকে কাকু ডাকবে মঞ্জু। তোমার কাকু হয়।

মঞ্জু তাকে চা দেবার সময় বলেছিল, কাকু তোমার চা।

মঞ্জুর হাত থেকে চা নেবাব সময় বলেছিল সে, এই মঞ্জু তুমি কিন্তু বলে দিও না কাউকে, আমি চা খেয়েছি। মা বাবা জানলে ভীষণ বাগ করবে।

—এত ভয় কেন তোমার কাকু? মঞ্জু চোখ তুলে বলেছিল। তারপর কথা নেই বার্তা নেই সে ওর পাশে গা লাগিয়ে বসেছিল। পা দুলিয়েছিল। কি যেন কথা ভাবছিল মঞ্জু। আর মঞ্জুর গায়ে সেই গন্ধ। মঞ্জু পাশে বসে ওর চা খাচ্ছে। ওর ভেতরটা কেমন যেন করছিল। এখন আর এ-বয়সে ভেতরটা তেমন করে না কেন? মঞ্জু চা খেতে খেতে বেনী দুটো একবার কাঁধে এনে ফেলল, আবার পিছনে, সে তাব চুল নিয়ে কি করবে যেন ঠিক করতে পারছিল না। আর কেবল ওব মুখের দিকে তাকিয়ে খুক খুক করে হাসছিল। বোধহয় ওব মুখ দেখে মঞ্জুর ভীষণ মায়া হচ্ছিল। সে যে সত্যি চুরি কবে একটা ভীষণ কিছু ক'ে ফেলেছে সেটা বোধ হয় মুখে চোখে ধরা পড়ছিল। হাতে ছিল ওর সোনালি রঙের কাপ, কেমন গোলাপ জামেব মতো রঙেব চা। কি সুন্দর ঘ্রাণ চায়েব। চা খেতে খেতে সারাদিন পর সুন্দর এক জ্যোৎস্নার কথা মনে পড়েছিল তাব। যেন মঞ্জু আর সে সেই সাদা জ্যোৎস্নায় ঘোড়ায় চড়ে কোথায় যাচ্ছে। মঞ্জুর মুখটা মসলিন দিয়ে ঢাকা। অথবা ঘোড়াটার মতো কপালে বড় চাঁদমালা। সাদা পোষাকের ওপর জরির কাজ। সোনালি ঝালরে ঢাকা তার মুখ। সে আর মঞ্জু ঘোড়ায় চড়ে যাচ্ছে। যাচ্ছে। কেবল যাচ্ছে। সে আগে, মঞ্জু পেছনে। মঞ্জু ওর কোমরে এক হাত রেখেছে। অন্য হাতটা ওর চুলেব ভেতর। সুন্দর সুদৃশ্য হাতে ওর চুলে বিলি কাটার মতো কবে যেন বলছে, কাকু তোমার চুলে ফুলের গন্ধ কেন?

সে কোন উত্তর দিয় নি। সে সামনে ঘোড়া দ্রুত ছুটিয়ে

দিয়েছে। কারা যেন পেছনে আসছে ছুটে। কারা যেন হাজারে হাজারে ঘোড়ায় চড়ে ওকে ধরার জন্য ছুটছে। যে সবার আগে ছিল, তার মুখ অবনীব মতো। অবনী তাকে ধরতে আসছে।

কিন্তু সে তখন অনেক দূরে। কোথায় পাবে অবনীরা তাকে আর মঞ্জুকে। ঘোড়াটা তখন তাদের নিয়ে যেন কোথায় কোন বড় পাহাড় আছে, চারপাশে নানাবর্ণের ফুল ফুটে আছে, ঝর্ণা নামছে জলের, সোনার চাঁপা ফুল ভেসে যাচ্ছে, সে আর মঞ্জু সেই সোনাব চাঁপার সন্ধানে চলে যাচ্ছে। কেউ এ-পৃথিবীতে থাকবে না, তাদের তখন বাধা দিতে পারে। সোনার চাঁপা ফুলটা সে সবাব আগে মঞ্জুর খোঁপায় গুঁজে দেবে ভেবেছিল।

অজু তখনই দেখল মঞ্জু সেই সোনালি কাপে ওর জন্য চা এনেছে। চায়ে ঠিক সেই আগের মতো গোলাপ জামেব রঙ।

মানুষ এ-ভাবে একটা রহস্যের ভেতর পড়ে যায়। অজু এসেই কি যে রহস্যেব ভেতর পড়ে গেল। এক এক কবে মঞ্জু ওকে অবাক করে দিচ্ছে। যেন মঞ্জু এখনও কিছু ভোলেনি, ভুলতে পারেনি। এমন কি সে দেখল, সেই চায়েব কাপটা পর্যন্ত হুবহু এক। সে কিছুক্ষণ কেবল মঞ্জুকে দেখছিল। চা যে ঠাণ্ডা হয়ে যাচ্ছে খেয়াল নেই।

আর মঞ্জুও ভাবি উদাসীন মুখে অজুকে দেখছে। ওরও মনে হচ্ছে না একবার মনে করিয়ে দেওয়া দরকার, অজু তোমার চা ঠাণ্ডা হচ্ছে। তুমি এ-ভাবে বসে থাকলে চা ঠাণ্ডা হয়ে যাবে। ঠাণ্ডা চা মানুষ কখনও খেতে পারে না।

ঘাটের কাঞ্চন গাছটার ফাঁক দিয়ে এলোমেলো সূর্যের আলো এসে পড়েছে বারান্দায়। বেশ দুটো একটা ডাহুক পাখির সাড়াশব্দ এখনও পাওয়া যাচ্ছে। বেলা হলেও ওরা ঝোপের ভেতর আশ্রয় নেয় না, বরং মনে হয় এখানে এরা নির্ভাবনায় আছে। কোন ভয় নেই এদের। মঞ্জু থাকলে বুঝি কারো কোন ভয় থাকতে নেই।

গত রাতে কি যে একটা হয়েছিল, সে এখনও যেন বিশ্বাস করতে পারে না, বাতাসে এমন হয় এবং মঞ্জুর মুখ দেখে এখন সাহসও হচ্ছে না, মঞ্জু তুমি সত্যি করে বলতো কাল রাতে ঠিক ঠিক কি হয়েছিল! কারণ মঞ্জুব মুখে ভারি আশ্চর্য কঠিন হাসি এখন, সে বুঝি আর কিছুক্ষণ এ-ভাবে চুপচাপ হাঁ করে তাকিয়ে থাকলে হেসে দেবে জোরে।

সে তাড়াতাড়ি চায়ের কাপটা তুলে নিল। এবং দেখল, বেশ তাজা চা। সুন্দর গন্ধ। মঞ্জুর শাড়িতে এখনও বাসি গন্ধ জেগে থাকতে পারে, কিন্তু দেখেতো মনে হয় না, মঞ্জু এখন শাড়ি না পাল্টে থাকতে পারে। সে বরং এতসব ভাবনা থেকে নিজেকে একটু স্বাধীন রাখতে চাইছে। মঞ্জু আরও কাছে এসে দাঁড়াল। কি দেখল যেন মাথায়, বলল, তোমার দুটো একটা চুল পেকেছে অজু।

অজু বলল, তা পেকেছে। বয়স হয়েছে, চুলেব কি দোষ বল।

—চুল পাকার তোমার বয়স হয়নি। আমার তো তুমি যতই খোঁজো একটাও পাকা চুল পাবে না।

—তোমার বয়সে মেয়েদের চুল পাকে না। মেয়েদের একটু বেশি বয়সে পাকে।

—কি যে বল অজু! চাটা কেমন হয়েছে বললে নাতো?

—খুব ভাল। এখানে এখনও তাজা চা পাওয়া যায় ভাবতে অবাক লাগে।

—চা ভালই পাবে। কিছুতো বাইরে যাচ্ছে না। চা তো আমাদের ফরেন আর্নিংস গুডস্। এখন তাও বন্ধ। আমরা খেয়ে ফুরোতে পারছি না।

অজু বলল, তোমার ছেলে কেমন আছে?

—ভাল। কাল ওর ভালো ঘুম হয়েছে।

—ওকে নিয়ে তুমি একবার কলকাতায় ঘুরে এলে পার!

—কি হবে?

—ওখানে ভাল ব্যবস্থা আছে। বড় ডাক্তার আছে।

—এখানে নেই তোমাকে এমন কে বলেছে।

—থাকতে পারে। কিন্তু আমার ভরসা কম।

—তুমি চলে গেছ বলে এটা হয়েছে।

—চলে যাওয়ার কথা না মঞ্জু, তোমার কোনো কোনো ব্যাপারে আমার মনে হয় খুব একটা একগুঁয়েমি আছে। ওটা মেয়েদের থাকা খুব ভাল না। কলকাতা অনেক বড় শহর। অনেক সুযোগ-সুবিধা, ঢাকাতে তেমন সুযোগ-সুবিধা হয়েছে বলে আমার ধারণা হয় না।

মঞ্জু হাসল।—তুমি দেখছি এসেই খুব অস্বস্তি ফিল করছ!

—অস্বস্তি কি এটা?

—অস্বস্তি না! তুমি ওর অসুখের দুঃখটা সহ্য করতে পারছ না। আমার খুব ভাল লাগছে ভেবে!

—এখানে তো অনেক দেখলে, ওখানে অন্তত কেউ কেউ দেখুক।

এবার ভীষণ সিরিয়াস হয়ে গেল মঞ্জু। সে বলল, অজু তুমি জাননা এখানে ভিজিটিং ডাক্তার মাঝে মাঝে এসে থাকেন। বিখ্যাত হার্ট স্পেশালিষ্ট ডাঃ রাইম এসেছিলেন। তিনি শুধু বলেছেন, ওটা পাল্টে না ফেললে কিছু করার নেই। আর একটা হার্টের দরকার। অবশ্য সেটা আমার আছে। বলে মঞ্জু থামল। কি বলতে গিয়ে সে থেমে গেল। যেন বাকিটা এই সকালে বলা কিছুটা বাড়াবাড়ি হবে। অজুব দিকে সে মুখ না তুলে বলল, এসব কথা থাক। এটা আমার খুব ব্যক্তিগত চিন্তা। এতে তোমাকে জড়াতে এখানে ডেকে আনিনি। অনেক কথা জমা হয়ে আছে। তোমাকে বাদে আর কাউকে বলা যাবে না অজু। না বলতে পারলে আমি মরে যাব।

কি এমন কথা অজু বুঝতে পারে না। কখন যে ওর সময় হবে! তবু কিছু বলতে হবে বলে বলা, তুমি সকালে এখন চা খাওনা মঞ্জু?

—খাবনা কেন?

—আমাকে দিলে, অথচ তুমি নিলে না।

—আমারটা হচ্ছে। হলেই কেয়া নিয়ে আসবে।

—তোমারটা আবার আলাদা নাকি ?

—তা একটু আলাদা বৈকি।

—সেটা খেয়ে দেখতে হয়।

—দেখাতে দিলে তো! বলে প্রায় দৌড়ে ঘরে চলে যাবে এমন ভাবে তাকাল অজুর দিকে।

অজু বলল, তুমি আমাকে এখন কি বলবে বুঝতে পারছি না। আমার খুব ভয় হচ্ছে। সেই লোকটার কথাও অজুর বলতে ইচ্ছা হ'ল! কিন্তু কেয়া দুঃখ পাবে। সে বলতে বারণ করেছে।

—ভয় পাবার মতো আমি তোমাকে কিছু বলব না।

—এখন তো ইচ্ছা করলে বলতে পার মঞ্জু। কেউ তো কাছে নেই।

—তোমার কি মাথা খারাপ। হাতে আমার এখন কত কাজ। ছাখো না, বলেই সে কাঞ্চন গাছটার ফাঁক দিয়ে কি দেখল, ঐতো আসছে। জব্বার কাকা আসছে।

হঠাৎ এ-সকালে জব্বার কাকা আসছে, কি ব্যাপার! এখানে যেন মঞ্জু এতক্ষণ জব্বার কাকার জন্যই দাঁড়িয়ে আছে। জব্বার কাকা না ফিরলে সে ভেতরে যেতে পারে না ভেবে, অজু বলল, জব্বার কাকা বাদে চারপাশে আর কেউ নেই! বলে ঠাট্টার মতো জোরে হাসার চেষ্টা করল।

—থাকবে না কেন। আছে, থাকবে। কিন্তু জব্বার কাকা এলে ঠিক হবে সেটা। থাকবে কি যাবে।

—মানে।

—মানে ওকে আসতে দাও।

অজু দেখল জব্বার কাকা লগি মেরে নৌকা এদিকে নিয়ে আসছেন। এখন শরৎ কাল, এবং এসময় এ-অঞ্চলে জল কমতে আরম্ভ করে। জলের একটা ঘাস-পচা গন্ধ ওঠে চারপাশে। জলের সব জলজ ঘাস জলের ওপর ভেসে ওঠার স্বভাব। জল বাড়লে যতটা সহজ নৌকা চালানো, জল কমলে ঠিক ততটা সহজ হয় না

চারপাশের জলজ ঘাস ভেসে উঠলে নৌকা তাড়াতাড়ি চালানো যায় না।

জব্বার কাকা জলের ঘাস, শাপলা পাতা ঠেলে ঠেলে আসছে। বুড়ো মানুষ। একটা গামছা পরেছেন। এবং সে, নৌকার গলুইতে কটা চাঁই পড়ে আছে দেখতে পেল। তাহলে জব্বার কাকা সকালে মাছের সন্ধানে বের হয়েছেন। গতকাল চাঁই পেতে রেখেছিলেন জলে, এখন সেগুলো তুলে আনছেন। মঞ্জু এবং একটু পর কেয়া এসে পর্যন্ত দাঁড়িয়ে গেছে বারান্দায়। জব্বার কাকা কি মাছ পেলেন সেটা খুব সকালে ওদের দেখার কৌতূহল। এমনকি সেই রুগ্ন ছেলেটার পর্যন্ত। তাকে জানালায় মাছ তুলে দেখিয়ে আনতে হবে হয়তো।

—অজু বলল, জব্বার কাকা মাছ না পেলে আমাকে বাজারে পাঠাবে ভাবছ!

—দেখা যাক্। মঞ্জু ঠোঁটে বেশ সামান্য হাসি টেনে বলল।

অজু ভেবে পায় না, মেয়েটা এখনও এত বেঁচে থাকার প্রেরণা অথবা সব কিছু উপভোগ করার বাসনা জীবনের ভেতর টিকিয়ে রেখেছে কি করে! একটা তছনছ জীবন, মেয়েদের যা কিছু দুঃখের, সব কিছুর সে অংশীদার, অথচ মুখেচোখে এতটুকু সেজন্য হীনতার ছাপ নেই! সরল, অনাড়ম্বর, ঠিক সেই আগের মঞ্জুর মতো। কথায় কথায় হেসে যেতে পারে অথচ সব সময় কেমন একটা উদাসীন-ভাব। অজু বলল, যাই বল, বাজারে আমি যেতে পারব না।

—জব্বার কাকা এলে সেটা ঠিক করবে।

আসলে জব্বার কাকা এলে কিছুই ঠিক হল না। অনেকদিন পর এত মাছ দেখে অজু কি করবে ভেবে পাচ্ছিল না। বারান্দায় এসেই জব্বার কাকা চাঁইগুলো খুলে ঝাঁকিয়ে ঝাঁকিয়ে সব মাছ বের করে দিলেন। কত মাছ! বড় বড় গলদা চিংড়ি, বেলে মাছ, কটা আশ্চর্য লাল নীল রঙের কই এবং বড় ট্যাংরা, পাবদা। একটা মাছও মরেনি। এবং মাছগুলো সারা বারান্দায় যেন এখন ছড়িয়ে যাবে। কেয়া লাফিয়ে লাফিয়ে সব মাছ তুলছে। অজুও দাঁড়িয়ে থাকতে

পারল না। সে পর্যন্ত ছুটে গিয়ে একটা চিংড়ির মাথা চেপে ধরেছে। মঞ্জু দরজায় দাঁড়িয়ে আছে কিছুটা অভিজ্ঞ মানুষের মতো। কেয়া এবং অজুর ছেলেমানুষী দেখে মনে মনে বোধ হয় হাসছে।

এবং এই সকালের সূর্য বেশ তখন হলুদ আলো ছড়িয়ে যাচ্ছে পাশে। বাঁ দিকে ডাকঘর, ডানদিকে ডিসপেনসারি, সামনে ঘাসের লন, লন পার হলে নানাবর্ণের ফুল নিয়ে বাগান, এবং সকাল বলেই ঘাসে ঘাসে এখন কুয়াশার জল। শরতের বিন্দু বিন্দু আকাশ ধোয়া শিশির দানার মতো শিশিরেব বিন্দু খেলা করে বেড়াচ্ছে ঘাসে ঘাসে। দূবে কোথাও কোন মোরগের ডাক। ঘোড়াটা, সময় হলে ডেকে উঠতে পারে, আব পুকুরেব পাড়ে পাড়ে যে সব গাছ আছে তার ভেতর লুকিয়ে থাকে সব ছোট ছোট পাখিরা। ওরা কিচ কিচ করছে এখন। চাবপাশের কলরবের ভেতর এমন একটা ছবি দেখতে মঞ্জুব ভীষণ ভাল লাগছে। কি সুন্দর লাগছে সকালটা। ওর একমাত্র যে ছেলে, যে আজ কাল অথবা পরশু মরে যেতে পারে মঞ্জুর চোখ দেখে তা মনেই হয় না। যেন মঞ্জু এমন সকাল অনেক-দিন পব, ঠিক অনেকদিন পব বললে ভুল হবে, যেন দীর্ঘদিন সে এমন একটা সকালের প্রতীক্ষায় সারাজীবন বসেছিল। সে এবং অজু এক নির্জন মাঠের ভেতর দাঁড়িয়ে, ঈশ্বরের অনন্ত রহস্য আবিষ্কার করে ফেলে অবাক হয়ে গেছে। যেন বলছে, যা, কি যে হয়ে গেল!

আসলে মঞ্জুব চোখদুটো দেখলে বোঝা যায় সে এখন খুব সুদূরে চলে গেছে। জব্বার কাকা এখন ওদেব মাছ তুলে দিতে সাহায্য করছেন। মাছগুলো একটি ঝুড়িতে তুলে তিনি চাইগুলো পরিষ্কার করে ফেললেন। তারপর মুখ বেধে শেফালীগাছের নিচে রেখে দেখলেন বেলা কত হল। ডিসপেনসারির দরজা খুলে দিচ্ছে অলিমদ্দি। সকালের রোদ ঘাসের ছায়া পার হয়ে লম্বা হয়ে ঢুকে গেছে জানালায়। বড় বড় কাচের আলমারিতে রোদের ছায়া চিকমিক করছে। ওঁর নমাজের সময় চলে যায়। তাড়াতাড়ি অজু করে ডিসপেনসারি ঘরের লম্বা চকিতে ছোট একটা গামছা

পেতে, তিনি সেই যে পৃথিবীর নিয়ামক অথবা আরও সব কি আছে, পৃথিবীর বাইরে যা সূর্যের মতো তেজী এবং অনেক দূরের সব গ্রহ নক্ষত্র মিলে যে অনন্ত লোক সেখানে যেন কোন খবর পৌঁছে দেবার জন্য সামনে দুহাত প্রসারিত করে দিতে চান।

কেয়া ভেতরে যাবার সময় ফিসফিস গলায় বলল, মুর্শিদ উঠে বসে আছে। জানালা দিয়ে দুবার মুখ বার করেছে।

—গলা শুকিয়ে গেছে। তাড়াতাড়ি চা দিয়ে আয়।

কেয়া বলল, এখনতো অজুদা এসেছে। ও অজুদার সঙ্গে এসেছে এমন চালিয়ে দিলে কেমন হয়।

—মন্দ হয় না।

—তবে মুর্শিদকে বলি বের হয়ে আসতে। দাদার সঙ্গে আলাপ করিয়ে দি।

—এত তাড়াতাড়ি করিস না কেয়া। আগে যে মানুষটা এল তাকে ছাখ সে কোন জাতের।

ওরা কথা বলতে বলতে, ও-পাশের উঠোনের দিকে চলে যাচ্ছে। ওরা ঘরের ভেতর দিয়ে বেশ হালকা পায়ে চলে গেল যেন। যাবার সময় না মঞ্জু, না কেয়া কোন কথা বলে গেল! যেন ওরা কি গোপনে সলা পরামর্শ করতে চলে গেল। অজু ঠায় আবার বসে থাকল। কিন্তু হাতটা মাছের, হাতটা ধোয়া দরকার। না হলে আঁসটে গন্ধ উঠছে। সে উঠে দাঁড়াল। ভাবল একবার বাথরুমে যাবে। কিন্তু মনে হল, বাথরুমে না গিয়ে সে কেয়াকে বলবে, একটু জল দিতে। আসলে ওর এখন এই বারান্দায় একা একা বসে থাকতে ভাল লাগছে না। সে ইচ্ছে করলে, একটু ঘুরে বেড়াতে পারত। এবং দত্তদের বাড়ির পাশ দিয়ে টক অড়হর গাছের নিচে গিয়ে দাঁড়াতে পারত। সে অবশ্য জানে না গাছটা বেঁচে আছে কি নেই। অথচ এই সকালে কেন যে গাছটার কথা মনে পড়ে গেল।

সে এভাবে যখন নানারকম ভাবতে ভাবতে ও-দিকের বারান্দায় গিয়ে দাঁড়াল, তখন সে দেখে অবাক, কেয়া চা নিয়ে আবার সেই

পুরোনো ঘরটার দিকে যাচ্ছে। এবং এ-সময় এ দিকটায় অজু আসবে মঞ্জু যেন ভাবতে পারেনি। মঞ্জু তাড়াতাড়ি এলোমেলো কথা আরম্ভ করে দিল। বলল, কেমন লাগছে সকালটা!

—ভাল না।

—ভাল না কেন!

—ধ্যাৎ একেবারে কিচ্ছু নেই।

—কি থাকবে আবার।

—সব কেমন চুপচাপ। কোনো লাইফ নেই।

—কেয়াকে নিয়ে একবার ঘুরে এস না!

—কোথা থেকে ঘুরে আসব?

—তোমাদের বাড়ি থেকে!

অজু ঠাট্টা করে বলল, কেয়ার বুঝি খুব লাইফ আছে!

—ভীষণ

—ভীষণ মেয়েটা ও-দিকে বন জঙ্গলে ঢুকে গেল কেন?

—ওই ওর অভ্যাস। ও চা বসে খেতে পারে না। কিছু শাক তুলতে বললাম, বললাম চা-টা খেয়ে যা, কিছুতেই খেয়ে গেল না। পুকুর পাড়ে সুন্দর গিমাশাক হয়েছে। শাকও তুলবে, চাও খাবে। তুমি তো গিমাশাক খেতে খুব ভালবাসতে।

অজুর আবার বলার ইচ্ছে হল, আচ্ছা মঞ্জু কাল রাতে দেখলাম কে যেন একজন মানুষ ঐ বনজঙ্গলের দিকে······তোমাদের পুরোনো আমলের বেহারাদের ঘরটা আছে সেদিকে হেঁটে যাচ্ছে। বেশ লম্বা, তাজা মানুষ। এবং ওকে সুপুরুষই বলা যায়। বলতে গিয়েও সে থেমে গেল। কেমন যেন এ বাড়িতে সব কিছুই এখন রহস্যে ঘেরা। আসলে কেয়া যাচ্ছে সেই ঘরটার দিকে। সেই ঘরটায় যে মানুষটা থাকে তার জন্য কেয়া চা নিয়ে যাচ্ছে। সে এ-সব বলে দিতে পারত। বলে দিতে পারত, মঞ্জু তুমি আমার সঙ্গে মিথ্যা কথা বলছ। তুমি মিথ্যা কথা বললে ভীষণ খারাপ লাগে। সে বস্তুত মঞ্জুর মুখের দিকে তাকিয়ে সত্য কথাটা বলতে

পারল না। মঞ্জুকে যেন অযথা একটা কষ্টের ভেতর ফেলে দেওয়া হবে।

আর সে লক্ষ্য করছিল, মঞ্জু ভীষণ অস্বস্তিতে আছে। সে যেন এখানে দাঁড়িয়ে থাকলে মঞ্জুর অস্বস্তি আরও বেড়ে যাবে। কারণ একটা মিথ্যাকে ঢাকতে গিয়ে আরও দশটা কথা বানিয়ে বলতে হবে। কারণ কেয়া এখনই ফিরে আসতে পারে। ওর হাতে চায়ের কাপ নাও থাকতে পারে। কোঁচড়ে গিমাশাক না থাকলে মঞ্জু বানিয়ে বানিয়ে আর কি বলতে পারে, এ-সব মনে হলে অজু আর দাঁড়াল না। সে সোজা করিডোর দিয়ে ঢুকে রুগ্ন ছেলেটার ঘরে এসে দাঁড়ালে দেখল, জানালা দিয়ে রোদ, পাশে কাট-মালতি গাছ, ছুটো একটা ফুল, অসময়ের ফুল কিনা সে জানে না। কারণ কখন কোন গাছে কি ফুল ফোটে কলকাতায় থেকে তা প্রায় ভুলতে বসেছে। সে দেখল, সুন্দর ছুটো পাখি, কি যে রঙ-বেরঙের পাখি, আহা, ছেলেটির চোখ মুখ এখন একেবারে সাদা। এমনকি অজু যে এ-ঘরে এসেছে, ছোট্ট ছেলেটা চোখ মেলে যেন দেখতে পাচ্ছে না। ওর বুকের ভেতরে ভীষণ কষ্ট পুরে রেখেছেন ঈশ্বর। যখন চারপাশে সব গাছ গাছালি এমন সুন্দর শরতের রোদ, নীল আকাশ, এবং মাছেরা জলের নিচে ঘোরাফেরা করছে তখন এক রুগ্ন বালক চুপচাপ শুয়ে থাকলে ভীষণ খারাপ লাগার কথা। অজু এ ঘরে এলেই মঞ্জুর কষ্ট কি যে তীক্ষ্ণ, এবং কত সহজে মঞ্জু সব ভুলে থাকার চেষ্টা করছে বুঝতে পারে। এবং তখনই মনে হল সে মঞ্জুকে কখনও সেই মানুষটার সম্পর্কে কোন প্রশ্ন করতে পারবে না। মঞ্জু না বললে, সে নিজে জেনে নিতে পারবে না। সে নিজে বলতে চাইলে যেন মঞ্জুকে খুব ছোট করা হবে।

মুর্শিদ লাফ দিয়ে উঠে বসল। তারপর ছুটে গিয়ে দরজা খুলে দিলে, এক ঝলক হাসি কেয়ার। সে বলল, মিঞার আর তর সইছে না।

—ছোটবিবি সত্যি বলছি, তর সইছে না।

—আবার ছোট বিবি।

মুর্শিদের মনে হল অনেক দিন হল সে কেয়াকে ছোটবিবি ডাকছে না। বিশেষ করে যেদিন থেকে ঢাকায় ইণ্ডিয়ান আর্মি মার্চ করে ঢুকে গেল সেদিন থেকে। আগে সে কথায় কথায় বলত, ছাখো ছোট বিবি তোমার ভয় নেই। তখন কেয়া ছিল কতকটা মুর্শিদের আণ্ডারে। যদিও মুর্শিদের তেমন ক্ষমতা ছিল না, তবে কেয়াকে নিয়ে মোটামুটি মেজর সফিকুল সাহেব খুশিই ছিলেন। ওর কাছে কেয়াকে খুব একটা নাস্তানাবুদ হতে হয়নি। অন্ততঃ মেজরের হাতে পড়ে কেয়ার প্রাণের আশঙ্কা ছিল না। একটু কাছাকাছি খুব সুন্দরী মেয়ে নিয়ে বসে থাকার স্বভাব ছিল সফিকুলের।

তবু কি করে যে কি হয়ে যায়। মুর্শিদ সেই বিরল জনহীন প্রান্তরে একা একদিন কেয়াকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখেছিল। মেজরের যে কোথায় গণ্ডগোল তার জানা ছিল না, কেয়াকে মুর্শিদের আণ্ডারে না রেখে আবার তাকে অন্য একজন সুবেদারের কাছে পৌঁছে দেওয়ার হুকুম হয়েছিল। মুর্শিদের ওপর শুধু ভার কেয়াকে ঠিকমতো পৌঁছে দেওয়া। কেয়ার জন্য মুর্শিদ তখন চুপচাপ বন্দুকের নলে হাত রেখে বসে থাকত। এবং কখনও কখনও কেয়াকে খুব কাতর দেখালে ওর কেন জানি মিনারের চোখ দুটো ভেসে উঠত। মনে হত ইণ্ডিয়ান আর্মি সারা পাকিস্তানে ঢুকে গেছে। টেবর তারা। যেন একটা মরুভূমির ওপর দিয়ে হাঁটিয়ে নেওয়া হচ্ছে, ওর বিবি মজিনাকে। অনেক দূরে উটের ওপর সে দেখতে পেত একজন ভারতীয় সৈন্য, এবং ওর কাঁধে লুটিয়ে পড়ে আছে মিনার। সে তখন ভয়ে রাতে ঘুম যেতে পারত না। দুঃস্বপ্ন থেকে আঁৎকে উঠলে সে ভাবত, কেন এ-ভাবে মানুষেরা যুদ্ধে আসে, সেতো একজন ভারতীয় হতে চায় না—কিন্তু সেই যে তার বাল্য স্মৃতি—ফুলবাগান পার হয়ে কেবল সামনে নলখাগড়ার বন, কাঠের গোলা, এবং উল্টোডাঙার খাল বরাবর গেলে এক বিস্তীর্ণ মাঠ। নীচু

নাবাল জমি, কতরকমের পাখি উড়ে আসত। ভেড়িগুলোতে অজস্র মাছ। সে কতদিন খুব সকালে মাছের আশায় হাঁটতে হাঁটতে উল্টাডাঙার পুল পার হয়ে নিচু নাবাল জমিতে নেমে গেছে। বড় বড় পাবদা, অথবা কখনও কখনও গলদা চিংড়ি সে ধরে আনত, অথবা পুলের নিচে এক মসজিদ, সেখানে সকাল সকাল বাপজি চলে যেত আজান দিতে। বাড়ির চাতালে আম্মা বদনা থেকে পানি ঢেলে বলত, ওঠ মুর্শিদ, সবের হয়ে গেল। পড়তে বোস।

কেয়া দেখল, মুর্শিদ খুব নিবিষ্ট মনে চা খাচ্ছে। সে কেয়াকে আর কিছু বলছে না। এমন কি কেয়া যে সামনে দাঁড়িয়ে আছে সে যেন বেমালুম ভুলে গেছে। কেয়ার তখন ভারি রাগ হয়। সে না বলে পারে না, মিঞার ছোট বিবির কথা আবার মনে আসে কেন?

—মনে আসে, এই এমনি, মানে চলে যাবতো। অনেক কথা মনে পড়ছে।

কেয়া ভয় দেখাবার মতো বলল, কে বলছে তুমি চলে যাবে।

—কেন মঞ্জু।

--মঞ্জুদি বলেছে তুমি চলে যাবে?

—না, ঠিক না বললেও, ঐ যে কে এসেছে, আমাকে নিয়ে যাবে কথা আছে, আমি তার সঙ্গে চলে যাব।

—সব গণ্ডগোল হয়ে গেছে!

—তার মানে!

—মানে ভীষণ পাকিস্তানী বিদ্বেষ তার। তোমার কথা শুনে ভীষণ ক্ষেপে গেছে।

—মানে! তুমি কি বলছ কেয়া?

—বলছে, এতবড় একটা রিস্ক তোমরা ঘাড়ের ওপর রেখেছ। পুলিশে এতদিন খবর দাওনি!

কেয়া দেখল, ভীষণ চোখমুখ শুকিয়ে গেছে মুর্শিদের। এমনি লম্বা মত মানুষটা। গাল সাফ-সোফ রাখার স্বভাব। রঙ ভীষণ উজ্জ্বল। চোখ বেশ বড়। নাক উঁচু। একজন ভাল মানুষের স্বভাবে

যা যা থাকে, মুর্শিদের মুখ দেখলেই বোঝা যায় সব তার আছে। সে এখন চুপচাপ পাশে চায়ের কাপটা রেখে দিয়েছে। মাথা নিচু করে রেখেছে এবং মনে হয় ভীষণ কিছু ভাবছে। মুর্শিদের এমন করুণ চেহারা দেখে কেয়ার ভীষণ মায়া হল। সে রসিকতা করতে গিয়ে কেমন একটা ভীষণ ছেলেমানুষী করে ফেলেছে। এটা করা ঠিক হয়নি। সে এবার বেশ জোরে হেসে দিল, আরে সাহেব না। ছোটবিবি থাকতে তোমার ভয় নেই। মঞ্জুদি এখনও কিছু বলেনি। অজুদা ভীষণ ভাল মানুষ।

মুর্শিদ যেন এখনও ভরসা পাচ্ছে না।

কেয়া বলল, চা খাও। কাপ প্লেট নিয়ে যাব। তোমার দুধ আসবে আবার।

মুর্শিদ বলল, মঞ্জু এখনও বলেনি!

—না! বলবে, তুমি ব্যস্ত হবে না, মঞ্জুদি, ঠিক সময় হলেই বলবে।

সে এবার কেমন চোখ উদাস করে ফেলল। সামনের জানালার একটা পাট খোলা। সে বলল, আমার কিছু ভাল লাগছে না কেয়া। তারপরই কি মনে হলে বলল, নালু কেমন আছে?

কেয়া বলল, ভাল না সাহেব।

—আমি কখন যাব ওর কাছে?

—বলতে পারছি না।

অজুদা আসায় এখন একটা মুশকিল দেখা দিয়েছে, যখন তখন কেয়া নিরিবিলি ওকে ঘরের ভেতর নিয়ে আসতে পারছে না। কখন অজুদা বাইরে থাকবে, অথবা অজুদাকে কিছু সময়ের জন্য বাইরে নিয়ে যেতে হয়, না হলে অজুদা টের পাবে, টের পেলে অজুদা কি-ভাবে নেবে, একজন ডেজার্টার মানুষ, ধরা পড়লে ভীষণ হাঙ্গামা এবং নানাভাবে উৎপীড়ন আসতে পারে—এতবড় একটা দায়িত্বের কথা হয়তো সেজন্য মঞ্জুদিও চট করে বলতে পারছে না। তবু মুর্শিদ এখানে যতদিন আছে, অর্থাৎ সেই ঐতিহাসিক দিনগুলির

প্রায় প্রথম থেকেই, এবং কি করে যে অবনীদার সঙ্গে ওর আলাপ, হয়তো অষুধের জন্য প্রথম মুর্শিদ অবনীর কাছে এসেছিল। একটা কলিক পেন টেন হবে। কবিরাজী প্রায় ধন্বন্তরির সামিল। এবং এক সময় নিরাময় হলে, মুর্শিদ প্রায় বুক আগলে রাখত ওদের। অথচ মুর্শিদ তখন জানত না, সে এ-ভাবে বেশিদিন তাদের রাখতে পারবে না। শান্তি কমিটির মানুষেরা ক্রমে মেজরকে নানাভাবে উৎসাহিত করত, অবনীবাবু কলাবরেটর। ওর দ্বারা সব হতে পারে। ক্রমে এ-ভাবে একটা সাংঘাতিক অবিশ্বাস এবং পরে মুর্শিদের সঙ্গে আরও দুজন এসেছিল—মুর্শিদ একজন ডিসিপ্লিনড মিলিটারি পার্সন, সে আজ্ঞাবহ দাস মাত্র। সে চুপচাপ হেঁটে হেটে অবনীবাবুর পাশাপাশি হেঁটে হেঁটে তার কঠিন শক্ত হাত ধরে যেন বলার ইচ্ছে ছিল, অবনীবাবু আমাকে মাপ করবেন। আল্লার কাছে কি জবাব দেব জানি না, আপনি আমার দোস্ত। আমার কাছে আপনি বড় কাছের মানুষ অবনীবাবু—কিন্তু আমি একজন মিলিটারি পার্সন। আমার কোন ব্যক্তিগত ইচ্ছে অনিচ্ছে বলে কিছু নেই। শুধু হুকুম তামিল করতে পারি। হুকুম তামিল করা আমার ধর্ম।

অথচ আগের দিনগুলো কি যে ভীষণ ভালো ছিল। সে বিকেলে ফল-ইনের আগে, অথবা সন্ধ্যার রোল কল হয়ে গেলে একটা টর্চ নিয়ে বের হয়ে পড়ত। একটা সাইকেলে চলে আসত অবনীবাবুর ডিসপেনসারিতে। এখানে নানারকম গল্পগুজব, মাঝে মাঝে জব্বার চাচা চা নিয়ে আসত ভেতর থেকে। যাবার সময়, সে ডাকত মঞ্জু বৌদি, কেয়া, কেয়া কোথায় মঞ্জু বৌদি, আমার ছোট বিবি।

আর এই নিয়ে ছিল ভীষণ হাসাহাসি। কেয়া ভীষণ ক্ষেপে যেত। সে বলত, মুশিদ তোমার মাথায় নারকেল ভাঙব!

মুর্শিদ হাসতে হাসতে বলত, ছোট বিবি, তরমুজ। তরমুজ তুমি, কেটে কেটে চিনি দিয়ে খেতে ও কি যে আরাম। একেবারে চিনির রস! টুই টুম্বুর।

—মুর্শিদ ভাল হচ্ছে না।

মাঝে মাঝে তখন মঞ্জু ধমক দিত, কেয়া এটা কি হচ্ছে? অসভ্যতা। সাহেব তোর ছোট না বড়।

কেয়া তখন কথা না বলে চুপচাপ পা ফেলে ভিতরে চলে যেত।

এ-ভাবে মুর্শিদ এ-বাড়িতে আত্মীয়ের মতো ছিল। সে সাইকেলে মাঠের ওপর দিয়ে গান গাইতে গাইতে চলে যেত। কখনও গোপের বাগান পার হয়ে দেখতে পেত সেখানে নদীর চর সামনে, ধূ ধূ বালিরাশি, এবং চাঁদ উঠলে ওর বিবির কথা মনে পড়ত। বিবির কথা মনে পড়লেই মঞ্জুদির কথা মনে পড়ত, মঞ্জুদির কথা মনে হলে কেয়ার কথা, অবনীবাবুর কথা—সব কথা, এবং বর্ডার পার হয়ে গেলে সেই উল্টাডাঙ্গার মাঠ, কবরখানা, তারপর পুরোনো বাড়ি, একটা বিরাট দেশের সে মানুষ, অথচ কেন যে সে নিজেকে আলাদা ভাবতে ভালবাসে—ঠিক বুঝে উঠতে পারে না। শৈশবে সে এমন কখনও ভাবতেই পারেনি। কেউ তাকে তার শৈশব থেকে নির্বাসনে নিয়ে যাবে।

কেয়া দেখল জানালা দিয়ে মুর্শিদ তাকিয়ে আছে। কথা বলছে না। অবনীদার জামা প্যান্ট অথবা পাজামা পাঞ্জাবি সব ছোট ছোট। সে-সব পরে থাকে বলে ওকে কিছুটা জোকারের মতো লাগে। কখনও কখনও এই নিয়ে ভীষণ হাসাহাসি। মুর্শিদ তখন ছেলেমানুষের মতো আরও সব হাঁটাহাঁটি, চোখের ইসারা, কখনও বেঁকে, কখনও লম্বা হয়ে যাওয়া সে একেবারেই তখন জোকার সাজতে ভালবাসে। আসলে তখন কেয়া বুঝতে পারে এ-সবের ভেতর মুর্শিদ তার ছেলেমেয়েদের ভুলে থাকতে চায়। এবং যখন চুপচাপ থাকে, কথা বলে না, দশটা কথা বললে, একটা কথার জবাব দেয় তখন কেয়া কি করবে ভেবে পায় না।

এবং এই মানুষ সব নিশিদিনে, একটা পায়রার মতো ছিল ওদের সঙ্গী।

কেয়া বলল, আমি গিয়ে অজুদাকে কোথাও পাঠিয়ে দিচ্ছি।

-কোথায় পাঠাবে!

—দেখি !

আবার সেই করুণ চোখ। কেয়া হেসে দিল, আরে তোমার কাছে ওঁকে পাঠাচ্ছি না। তোমার যেমন ছেলেবেলা কলকাতার কোন ডাঙ্গায় না বাজারে কেটেছে, অজুদার তেমনি এখানে কেটেছে। অথচ ছাখো তোমরা তুজনই তুদেশের মানুষ। বলে কেয়া কি ভাবল। বলল, আমি এখন এ-দেশের। আমরা এখন তিনটা দেশ। তুমি আমি অজুদা তিন দেশের মানুষ। ভাবা যায় না।

মুর্শিদ বলল, সত্যি।

কেয়া বলল, অথচ ছাখো তোমরা আমাদের কি না করেছ।

মুর্শিদ চুপ করে থাকল।

—কি কথা বলছ না কেন ?

—কি বলব বল !

—জবাব দাও।

কেয়ার চোখ মুখ দেখলে মনে হবে সত্যি সে জবাব না নিয়ে ছাড়বে না। তারপর কেয়া খুব একটা সরল মেয়ের মতো বলল, কিগো মুর্শিদ মিঞা, কোন জবাব দিতে পার না। এত দূর থেকে ধর্মের নামে দেশ শাসন করলে এই হয়। মানুষের সুখ দুঃখ বুঝলে না, কেবল শাসন করে গেলে। তারপর কেয়া খুব বক্তৃতা দিচ্ছে ভেবে বলল, অজুদাকে পাঠিয়ে দেব! তুমি সোজা কথার মানুষ না!

—এই কেয়া! প্লিজ।

—প্লিজ-ফ্লিজ না।

কিন্তু তবু কেয়া ছুটে বের হয়ে যেতে চাইলে মুর্শিদ বলল, আল্লার কসম!

কেয়া হা হা করে হেসে উঠল। এবং ঘাসের ওপর বসে পড়ল হাসতে হাসতে। কেমন ভয় পাইয়ে দিয়েছে! সে মানুষটাকে ভীষণ ভয় পাইয়ে দিয়েছে। অজুদার নামে কি ভয়!

কেয়া এসে দেখল, অজুদা বাইরে চুপচাপ বসে রয়েছে। মঞ্জুদি কাছে নেই। বা'জান হাম্বল দিস্তায় শুক্‌নো লতাপাতা গুঁড়ো করছে। এবং ঘোড়াটা গাছের নিচে ঘাস খাচ্ছে।

কেয়ার কেন জানি এমন লম্বা বারান্দায় সকালের রোদে এ-ভাবে দাঁড়িয়ে থাকতে ইচ্ছে করছে। এটা শরৎকাল। জল ক্রমে কমে যাচ্ছে। জলে এবার একটা ঘাসপচা গন্ধ উঠবে। এবং এখন যেন এ-বারান্দায় দাঁড়ালে টের পাওয়া যায়, কেমন এক নির্জনতা চারপাশে। কোন ভয় লাগছে না। উদবিগ্ন হবার কোন কারণ নেই। অথচ এমন এক নির্জনতা এক সময়ে ওদের কাছে কি যে নিদারুণ ছিল। ওরা রাতে ভয়ে ঘুম যেতে পারত না। তারপর···না, এমন সকালে কে তারপর···আর ভাববে না। ভাবলে হয়তো এখুনি মাথা ঘুরে পড়ে যাবে। মুর্শিদ ভাগ্যিস ফের হাত বদল করে নিজের হাতে নিয়ে এসেছিল তাকে! তা না হলে!

সে ডাকল, অজুদা চা খেয়েছ?

—কখন!

—আবার দেব।

—দাও।

—কতবার দিনে চা খাও?

—যতবার দেবে।

—এখানে তো তা হবে না। চিনি পাওয়া যায় না। গুড় নেই। সব আকাল।

—তবে যা দেবে।

—সব সময় দেওয়া নাও হতে পারে।

—দিও না।

—তুমি একবার ওদিকটায় যাবে?

—কোনদিকটায়!

—তোমাদের বাড়ির দিকে।

—চল।

বারান্দায় দাঁড়িয়ে ডাকল, মঞ্জুদি, আমরা যাচ্ছি।

—কোথায়!

—অজুদাদের বাড়ি।

—এখন যাচ্ছিস! মাছ কে কাটবে।

—এসে কাটব।

আসলে এই যে জোরে জোবে কথা, সব মুর্শিদকে যেন শুনিয়ে দেওয়া, আমরা যাচ্ছি। তুমি এখন নীলুর কাছে এসে বসতে পার।

কেয়াকে মুর্শিদ জানালায় বসে দেখতে পেল। ডিসপেনসারি পার হয়ে এখন বড় অর্জুন গাছটার নিচ দিয়ে কেয়া আর সেই মানুষটা যাচ্ছে। সে তখন বের হয়ে একটু ঝোপজঙ্গল পার হয়ে খুব কাছে গিয়ে সেই বিদেশী মানুষটাকে দেখার চেষ্টা করল। ইণ্ডিয়ার মানুষ। এখানে এসেছে। কলকাতায় থাকে। কলকাতা মানে তার কাছে, ষষ্ঠীতলা, চণ্ডিতলা, বাগমারি, অথবা সেই সব জলা, যার পাড়ে পাড়ে সে নিত্যদিন শৈশবে ঘুড়ি ওড়াতো অথবা সব কাঠের গুদাম পার হলে শুধু মাঠ, ঘাস, কবরভূমি এবং নিশিদিন ওর কাছে ছিল সব কিছু অত্যন্ত কাছের, সেখানে কি সেই মানুষ যায়! সে কি বলতে পারে, মসজিদের পাশে সেই পীরের দরগা এবং একটা কাঞ্চন ফুলের গাছ ছিল, অথবা, সেই তুরুল মিঞার দোকান, মোহরমের দিনে যে লোকটা রাংতার টুপি, রাংতার তরবারি বিক্রি করত। তুরুল মিঞা ছিল ওর কাছে দুনিয়ার সব চেয়ে আশ্চর্য মানুষ। সে তো সব সময় মক্কা অথবা মদিনার গল্প, সব নাবিকের গল্প, যেন ওর গল্প শুনলে মনে হয় সে নিজের চোখে সব দেখে এসেছে!

এবং মুর্শিদ জানে, লোকটার কোনো এমনিতে সঠিক ব্যবসা ছিল না। সে আমের দিনে আম, জাম জামরুলের দিনে জাম জামরুল অথবা মেলার সময় আতাফল, এবং নানারকমের মালি শোলার পাখি, হরিণ হাতি এ-সব বিক্রি করত। আর মনে আছে, লোকটা বিক্রি করত মোহরমের দিনে রাংতার টুপি, রাংতায় মোড়া কাঠের তরবারি ঢাল। সেই মানুষটাকে কি এখনও ষষ্ঠীতলার মাঠে বসে থাকতে

দেখা যায়! অথবা সেই লোকটা, যে আসত শীতে বহুরূপী সেজে। সে সকালে এসেই ঢোল পেটাত। আর বস্তির সব ছেলেমেয়েরা ছুটত ঢোলের শব্দ শুনে। ওরা ঘিরে দাঁড়াত। সাদা রঙের ঘোড়া, আসলে ওটা ঘোড়া ছিল না, মানুষটার নাম ছিল মনসুর, সে থাকত মাঝে, সামনে ঘোড়ার মুখ, পিছনে লেজ, কাপড় দিয়ে ঢাকা। এবং নিচে কি যে থাকে কে জানে, সে হাতে রাখত চাবুক, সে লাফালে-ঝাঁপালে ঘোড়াটাও লাফাত ঝাঁপাত। এমন একটা কাপড়ের ঘোড়া তার কাছে কখনও মনে হয়নি, কাপড়ের। জ্যান্ত ঘোড়াটা চড়ে এলেও সে মনসুরকে তার চেয়ে বেশি আশ্চর্য মানুষ ভাবত না। সে নেচে নেচে গান গাইত। যেন ঘোড়ায় চড়ে গাইছে। তুল হন্ যায়। আর কি সব, সাদি সমন্দের গান, তার মনে নেই। তবু সে যেন ভাবে, মনসুর যে জগত নিয়ে বেচে ছিল, তার প্রাণে, এবং এখনও সে যখন মিনার অথবা মজিনাকে গল্প করতে বসে, বার বার ঘুরে ফিরে আসে সেই দুটো মানুষ, একজন নুকল, অন্যজন মনসুর। এই ভারতবর্ষ বাদে সে দুটো মানুষকে পৃথিবীর আর কোথাও আবিষ্কার করা যাবে না সে জানত। ওর বুক থেকে তখন সামান্য দীর্ঘনিঃশ্বাস উঠত। শৈশবে সে কেন যে এ-ভাবে বার বার ফিরে যেতে চায়। সেই মানুষটা হেঁটে যাচ্ছে। যে কেবল বলতে পারে, ভারতবর্ষে ওরা এখনও বেঁচে আছে কি না।

মুর্শিদের ভারি লোভ হচ্ছিল, কেয়া এবং সেই মানুষটার পাশে পাশে হেঁটে যায়। কিন্তু পারে না। কারণ মঞ্জু এখনও কিছু বলছে না। মঞ্জু না বললে সে কিছু হুট্ করে করতে পারে না। মানুষের মনে কি থাকে কেউ কখনও সঠিক বলতে পারে না।

সে ঝোপ থেকে এবার উঠে পড়ল। ওরা বড় আমগাছটার নিচ দিয়ে একটা ছাড়াবাড়িতে উঠে গেল। ওর পরে পুকুর। পুকুর হাজা মজা। এখন বর্ষাকাল বলে সেটা ঠিক বোঝা যাচ্ছে না। এবং একটা বাস পাকা রাস্তা ধরে চলে যাচ্ছে। এটা আটটার বাস। আটটা বেজে গেছে তবে। এবং ওরা যখন একটু ঘুরতে গেছে, সে এই

ফাঁকে নীলুর ঘরে যেতে পারে। নীলু ওকে দেখলে ভীষণ খুশি হয়। আর শিশুর মুখের সঙ্গে কেন যে সে সব শিশুদের মিল খুঁজে পায়। সে তখন আর কেন জানি ওর পাশ থেকে উঠতে পারে না, কেবল বসে থাকতে ইচ্ছে হয়। শিশুরা পৃথিবীতে একই রকমভাবে বাঁচে।

সে বারান্দায় এসে দেখল, মঞ্জু একটা বড় থালায় চিংড়ি মাছ, বেলে মাছ, পাবদা মাছগুলো ঢেকে রাখছে। যে কাজ করে দেয়, সে অন্য কাজ করছে। সে এখন এদিকে নেই। এবং সে দেখেছে মঞ্জু, ওর সামনে মুর্শিদকে বের হতে বারণ করে না।

এ-ভাবে মুর্শিদ ঘরে ঢুকে দেখল, জানালা খোলা নেই। সে নীলুর মাথার সামনে জানালা খুলে দিল। হয়তো কেয়ার কাজ। সকালের দিকে সে খুলে দিয়েছিল হয়ত। আবার যাবার সময় বন্ধ করে রাখতে পারে। সে এ-সব ভাবল। আর বেশি সে এখন সামনের দিকে যেতে পারবে না। কারণ একটু পরেই সামনের ঘর পার হলে বার-বাড়ির বারান্দা, মাঠ, বাঁ দিকে নীল ডাকবাক্স।

সে চুপচাপ নীলুর পাশে বসল। নীলু ওকে দেখে একটু হেসেছে। নীলুতো জানে না, যে তার বাবাকে এক বিকেলে না সেটা সকালই হবে, ঠিক যেন সে মনে করতে পারে না, কাকে কখন, কোন সময়ে বড় মাঠে নামিয়ে হত্যা করেছে। শুধু অর্ডার—কিল। সমস্ত কলাবরেটরদের খুঁজে বের কর। যারা দেশের স্বাধীনতা বিপন্ন করছে, যাদের জন্য আমাদের আজ গৃহযুদ্ধ, তাদের খুঁজে বার কর। য়্যাণ্ড স্যুট দেম আনটীল দেয়ার ডেথ।

হায় সে তো একজন আজ্ঞাবহনকারী মানুষ। সে এ-ভাবে মেরে গেছে, তা কত, সে এখন সংখ্যা নিরূপণ করতে পারে না। কেবল নীলুর সামনে বসলেই সে কেমন বোকা হয়ে যায় যেন নীলু ইচ্ছে করলে ওর বোকামির জন্য ওঠ-বোস করাতে পারে। এবং এ-ভাবে সে মাঝে মাঝে কেন যে নীলুকে ভীষণ ভয় পায়। নীলু হাসলে, সে তখন আর কিছুতেই হাসতে পারে না। মুখ গোমড়া করে বসে থাকলে, নীলু বলবে, মুর্শিদ চাচা তুমি কাঁদছ।

কেয়া বলল, অজুদা ওটা কাদের বাড়ি ছিল বলতো ?

—দত্তদের।

—দত্তরা ক'ভাই ছিল ?

—ওরা ছিল চার ভাই। নিবারণ দত্ত, প্রফুল্ল দত্ত, অবনী দত্ত, জগদীশ দত্ত।

—কেউ নেই এখন। ওরা কোথায় গেছে জানো ?

—না।

—আন্দামানে।

—একটা দ্বীপে সবাই চলে গেল !

—বা'জান তাই বলেছেন, ওরা জমি-জমা বিক্রি করতে তোমার বছর দশেক আগে এসেছিল। বা'জানকে ওরা বলেছিল, এমন।

—কে কোথায় গেছে তুমি সব জান ?

—আমি কিছুই জানি না। বা'জানের একটা খারাপ স্বভাব আছে।

কেয়া এবং অজু পুকুর পাড়ে এসে সেই বড় অড়হর গাছটার নিচে দাঁড়াল। দত্তদের বাড়িতে আলতাফ আর তার বিবি থাকে। ওর দুই ছেলেকেই খানেদের সেনারা ধরে নিয়ে গেছিল। ওরা আর ফিরে আসেনি। কোথাও আশেপাশে কেউ এসে দাঁড়ালে আলতাফ ভেবে থাকে, ওর দুই ছেলে ফিরে এসেছে। আলতাফ এমনিতেই চোখে ভাল দেখে না, ছেলে দুটো নিখোঁজ হবার পর একেবারে দেখতে পায় না। আলতাফের পরিবার ফল-পাকুড়, কিছু জমির ফসল দেখাশোনা করে তুলতে পারলে ওদের মোটামুটি চলে যায়। কেয়া বাবার কথা সহসা থামিয়ে আলতাফের কথা বলছিল, আর আলতাফ বারান্দায় বসে হুঁকা খাচ্ছে, কে-ডা। তোমরা কে-ডা ? আলি, বরকত ! তরা আইলি !

কেয়া বলল, চাচা আমরা।

—তরা কে-ডা ?

—আমি আর অজুদা। কেয়া জানে অজুদা বললে আলতাফ চাচা কিছু বুঝবে না। সে অজুর পরিচয়, কার ছেলে, কেন এসেছে সব বললে আলতাফ কেমন যেন চুপ করে গেল। ওর ভেতরে কোন উৎসাহ নেই। সে ছেড়া শীতলপাটিতে বসে তামাক খাচ্ছে। দুঃখে মানুষটা সব পূর্বস্মৃতি ভুলে গেছে।

কেয়া বলল, মাথা ঠিক নেই।

কেয়া এমনভাবে কথা বলছিল, যে, সে এ-সবের ভেতর ছিল না। অন্য কোথাও ছিল। ফিরে এসে সব শুনেছে। আসলে, এই যে গাছপালা, অথবা ঝোপ জঙ্গল সর্বত্র, এখন এখানে এক নিদারুণ হাহাকারের ছবি। কেয়াকে দেখলে এখন বোঝা যায় না, কিন্তু ভেতরে ভেতরে কেয়া কোথায় যেন একটা ভীষণ সংকোচের ভেতর মাথা গুঁজে রেখেছে। মাঝে মাঝে কেয়া অন্যমনস্ক হচ্ছে অজু সেটা ধরতে পারে।

অজু বলল, তুমি তো সেদিনের মেয়ে। এত জানো কি করে!

—বা'জান সব বলে যায়। বা'জানের কোন কাজ না থাকলে বলে যান। যখন খেতে বসেন, কথায়, কথায় কার বাড়ি কত বড় উৎসব হত সব বলেন। কোন বাড়ির কি মাহাত্ম্য ছিল বলেন। কে তাঁকে কি ভাবে কতবার জেল থেকে বাঁচিয়েছে বলতে বলতে চুপ করে থাকেন।

অথবা যেন এখন কেয়ার বলার ইচ্ছে, বা'জান যখন এ-গ্রামের ওপর দিয়ে হেঁটে বেড়ান তিনি যেন দেখতে পান, কত মানুষ, তারা, এই জল-হাওয়ায় নিঃশ্বাস ফেলেছে, একসঙ্গে বড় হয়েছে, সহসা দেশে যে কি এল, কেন যে দেশ থেকে সবাই চলে গেল—এসব পূর্বস্মৃতি বা'জানকে ভীষণ দুঃখিত করে রাখে। বা'জানের শরীর ভাল না থাকলে চুপচাপ শুয়ে থাকেন। তখন ওঁকে বার্লি খাওয়াতে এলে এ-গ্রামের বৈভবের কথা বলেন।

অজু বলল, মঞ্জুরা বাদে আর কেউ নেই এ-গাঁয়ে ?

—আছে। পশ্চিম পাড়াতে ক'ঘর। সিং-এরা আছে। ফণী দফাদার গত সালে মারা গেছে।

—দেশের স্বাধীনতা দেখে যেতে পারল না।

—না।

কেয়া পরেছে একটা হলুদ শাড়ি। ওর চুল বেশ আঁট করে বাঁধা। কেয়ার পায়ে নীলরঙের শ্লিপার। সে আগে, অজু পেছনে। অজু এ-বাড়িতে এলে নানাভাবে সব আত্মীয়-স্বজনের মুখ দেখতে পায়। ওদের পৈতের সময় অনেকে খেয়েছিল, পৈতের সময় সে পালকিতে চড়ে গ্রাম ঘুরেছিল। মঞ্জুকে সে সেদিন দেখতে পায়নি। মঞ্জুদের সবার নেমন্তন্ন ছিল, কিন্তু মঞ্জু খেতে আসেনি। আর সে দেখেছিল, সে যখন পাল্কি চড়ে চলন দিচ্ছিল, তখন অনেক দূরে মনে হয়েছিল সাদা ঘোড়ায় মঞ্জু কোথাও যাচ্ছে। এখানে এসে সে মঞ্জুর ঘোড়ায় চড়ে বেড়ানো আবিষ্কার করতেই দেখতে পেল, সেই চালতা গাছ, সেই লটকন গাছ, সেই তালগাছ এবং সেই সব এক রকমের পাখি। রাঙ্গাকাকার বিয়েতে এই পুকুরে তিনটে তিনমাল্লা নৌকা এসেছিল। অজু সেবারেই প্রথম বরযাত্রী যায়। বরযাত্রী যাবার আর কোন পূর্ব অভিজ্ঞতা ছিল না।

অজু বলল, কেয়া, মানুষ যে দেশে থাকে, তার সেটাই দেশ হয়ে যায়।

—সে হয়তো ঠিক। তবু মায়া থাকে। শৈশবের জন্য মায়া থাকে। আপনি যেখানে ছোট বয়সে থেকেছেন, কখনও তাকে ভুলতে পারেন না।

—হয়তো হবে। হয়তো এজন্যই মঞ্জুর চিঠি পেয়ে একদিনও দেরি করতে পারিনি, কিন্তু এখানে আসার পর মঞ্জু চিঠিটা সম্পর্কে সঠিক কিছু বলছে না। কেমন গোপন করে যাচ্ছে সব।

—এইতো এলেন। ক'দিনতো থাকবেন। একদিন বললেই হল। বলেই কেয়া সামনের ঝোপ লাফ দিয়ে পার হল। কেয়া পার হতে গিয়ে একটু শাড়ি তুলে ফেলেছিল। ওর হলুদ পা দেখা

যাচ্ছিল, আর ওর পা এবং হলুদ রঙের শাড়ি কোথায় যেন রঙে রসে মিলে গেছে। সে তাকাতে গিয়ে কেমন লোভে পড়ে গেল।

অজু বলল, এখানে এই বন জঙ্গলে ঘুরে কি হবে! চল বরং নৌকা নিয়ে জলে ভেসে পড়ি।

কেয়া বলল, মঞ্জুদি বলেছে যাবে। বিকেলে আমরা বিলে শাপলা তুলতে যাব। আপনি নৌকা বাইতে পারেন তো। ভুলে যাননি তো সব।

—ভুলে যাইনি। তবে অতদূর যেতে পারব না। অভ্যাস নেই।

—অভ্যাস না থাকলে সাহস কেন জলে ভাসার।

অজু কোন কিছু ভেবে বলেনি, আসলে মেয়েটি ঠিক বাংলা দেশেরই মতো। জলহাওয়ায় সজীব। ফুল ফলের মতো তাজা। কেয়ার এ-বয়সে, যে কোন মানুষের পক্ষে লোভ হওয়া স্বাভাবিক। সে কথার কথা বলেছে। তাছাড়া ভালই লাগে, জলে ভেসে গেলে। যুবতী মেয়ে পাটাতনে। চারপাশে বর্ষাকাল। চারপাশে শাপলা শালুকের পাতা, ফুল। ফড়িং উড়বে। প্রজাপতি বসবে গলুইয়ে আর অজস্র পাখি বাংলাদেশের। কতরকমের পাখা, কতরকমের চোখ। ওরা যখন মাথার ওপর উড়ে যাবে, তখন এ-পৃথিবীতে কেউ মেয়াকে না ভালবেসে পারবে না। সেতো অজু। বয়স বেশি। সরল চেহারা। চোখে ভারি চশমা। সে কালো রঙের দামী টেরিলনের প্যান্ট, আর সাদা জামা পরেছে, সে পরেছে কোলাপুরি চটি। সে সব সময় শু পরে বলে, পা একেবারে মাখনের মতো লাবণ্যময়। চটির ভেতর পা দুটো ভারি সুন্দর লাগছিল।

কেয়া বলল, ওদিকটাতে একটু বসি।

অজুর কি মনে হল। সে বলল মঞ্জু আবার আমাদের জন্য ভাববে নাতো।

—মঞ্জুদি তো আপনাকে চেনে।

অজু আর ওর সঙ্গে না গিয়ে পারল না, অজু ভাবল, সে খুব ভীতু মানুষ। কেয়া সেটা টের পেয়ে গেছে। এ-ব্যাপারে ভীতু

মানুষদের মেয়েরা ভয় পায় না। বরং করুণা করে থাকে। কেয়া হয়তো ওকে করুণাই করছে।

অজু বসে বলল, এমন একটা নির্জন জায়গায় তোমরা সেই কঠিন দিনগুলোতে কি করে যে ছিলে! ভাবলে অবাক হয়ে যাই।

—এ-সব জায়গা নির্জন ছিল কে বলেছে আপনাকে!

—কে বলবে! দেখে শুনে মনে হচ্ছে।

—এ-রাস্তায় কত সব যুদ্ধের গাড়ি গেছে জানেন?

—কি করে জানব!

—তবে যে বলছেন! এদিকে সব সময় একটা মহামারীর মতো ব্যাপার ছিল। এখন বর্ষাকাল। পানিতে সব ভেসে গেছে, শীতকালে এখানে কোথাও এতটুকু পানি থাকে না। মাঠে যে সব পরিখা খুঁড়েছিল ওরা, দুঃখের বিষয় একটিও আপনাকে দেখাতে পারছি না। তবে একদিন গোপের বাগ আপনাকে নিয়ে যাব। ঐ তো, চেনেন না?

—খুব চিনি।

—একটা বড় আমবাগান ছিল না!

—হ্যা। ওটার ওপর দিয়ে আমরা পানাম স্কুলে যেতাম।

—সেখানে একটা অস্থায়ী ঘাঁটি ছিল। এখন গেলে শুধু কিছু ভাঙা ইট কাঠ, এবং লোহা লক্কড়, চোখে পড়বে। আর কিছু না। কে বলবে, ওখানে ন দশ মাস আগেও রোজ প্যারেড হত। গাড়িতে সারি সারি খান সেনা কেবল আসছে তো আসছেই। মাঝে মাঝে অন্ধকার রাতে শুনতে পেতাম, দূরে কারা মেশিন গান দাগছে। আমাদের তখন দিনগুলো পাখির ডানায় ভর করা ছিল, যে কোন মুহূর্তে টুপ করে ঝরে পড়তে পারতাম। এটুকু বলেই কেমন কেয়া বিষণ্ণ হয়ে গেল। কথা বলতে পারল না। সে কি যেন গোপন করার চেষ্টা করছে ভীষণভাবে। অজু কেয়ার এমন মুখ, অনেকবার দেখেছে। সকালে মেয়েটা তাকে বিশ্বাস করেছিল, এখন দেখে মনে হয়, আবার চোখে ভয়, অবিশ্বাস। এ-সময় অজু

কেন যে কিছু বলতে পারে না। সে বলল, কেয়া চল ওঠা যাক, মঞ্জু এবার আমাদের জন্য সত্যি ভাববে।

তখন মঞ্জু এসে দেখল মুর্শিদ নীলুব সঙ্গে বেশ গল্প জুড়ে দিয়েছে। যেমন মুর্শিদ বলছিল, আমরা ষষ্ঠীতলার মাঠে ঘুড়ি ওড়াতাম। আমাদের ছিল নুকুল মিঞা, আমাদেব ছিল এক মানুষ, ঘোড়ায় চড়ে আসত, আমরা ঈদের দিনে, চিৎপুব পাব হয়ে চলে গেছি, বড় মসজিদে নামাজ পড়েছি, আমাদের রাজাবাজাবে ঈদেব দিন, কি বড় জলসা হত, কত মানুষ! রঙ বেবঙেব টুপি, পোশাক। বর্শা, তরবারি। মহরমেব দিনে, নানাবকম সাজে সাজতাম। ইন্টালিব পীবের দবগা থেকে হাতে কবে নিতাম তাজিয়া। কি যে বড়, একেবাবে ট্রাম লাইনের তার ছুঁয়ে যেত। বড় বড় ঘোড়ায় সব পুলিশেব দল যেত আগে—আর কি বড়। বুক থাবড়ে বলতাম হায় হাসান, হায় হোসেন।

নীলু, মুর্শিদ বুক থাবড়ে কথা বললে মজা পায়। আসলে সে নীলুকে দেখলেই ছেলেমানুষ হয়ে যায়। সে নীলুব সামনে, একজন মোহরমের দিনের মানুষ হয়ে, পৃথিবীর মঙ্গল আকাঙ্ক্ষায় ছেলেমানুষের মতো বুক থাবড়ে বুঝি কাঁদতে ভালবাসে। অথবা মুর্শিদ বুঝি মনে করতে পারে সেই শৈশবের দিন সে আর ফিবে পাবে না। তার বার বার এখন আকাঙ্ক্ষা, ঐ যে একটা লোক এসেছে, সে এখনও জানেনা সে কে, কিন্তু কলকাতা থেকে এসেছে, যেন প্রথম দেখা হলেই জিজ্ঞাসা কববে আচ্ছা অজুবাবু, পুলের পাশে পীরের দরগা আছে? সেই ষষ্ঠীতলার মাঠ আছে? সেই জলাভূমি সেই কববখানা, ওখানে একটা চাঁপা ফুলের গাছ ছিল, গাছটা আছে? আমরা রোজ চাঁপা ফুল চুরি করতে যেতাম। অথবা সেই পাঁচিল টপকে একটা ফলের বাগান ছিল। কত রকমের ফল, আতা যে কত রকমের ছিল, আম জামরুল ছিল। আম ছিল অনেক রকমেব। খুব বড়, চারপাশে পাঁচিল, টপকে ভিতরে ঢুকে গেলে কেউ টের

পেত না, বাগানে একজন মানুষ হারিয়ে গেল। ভেতরে ঢুকলে অন্য একটা পৃথিবী মনে হত। মাঝে মাঝে সেই পৃথিবীটার স্বপ্ন আমি দেখি। কাউকে বলতে পারি না, বর্ণনা দিতে পারি না। মিনার কত যে বলে, তুমি না নিয়ে গেলে বুঝতে পারব না। তুমি দেশটাকে এত ভালবাস যে কিছুতেই মুখে বলে তা প্রকাশ করতে পার না।

মঞ্জু তখন বলল, নীলু, চাচাকে এমন করতে নেই।

মুর্শিদ নীলুকে খুশি রাখার জন্য দুহাতে বুক থাবড়ে, যেন সে মিছিল নিয়ে যাচ্ছে মোহরমের. হায় হাসান, হায় হোসেন করছে। আসলে সে বুক থাবড়ে এমনভাবে ঘুরে বেড়ালে মনে হয় শৈশবে সে ফিরে গেছে। মঞ্জু দেখল, মুর্শিদ ভীষণ ঘামছে। সে কাছে যেতেই মুর্শিদ কেমন শিশুর মতো হেসে দিল, নীলু বলল···। আর কিছু না বলে শিয়রে ওর বসে পড়ে সে মঞ্জুকে দেখতে থাকল।

মঞ্জু বলল, কিসব ছেলেমানুষী হচ্ছিল! ঘরে বুক থাবড়ে দাপাদাপি করছিলে!

মুর্শিদ মাথা নিচু করে বসে থাকল। এখন বুঝতে পারছে সে খুব ছেলেমানুষী করে ফেলেছে। একেবারে শৈশবে ফিরে গেলে এটা হয়।

মঞ্জু বুঝতে পারছে, মুর্শিদ নিজের ছেলেমানুষীর জন্য নিজেই অবাক হয়ে গেছে। নীলুর বিছানার চাদর একটু উঠে গেছে, মঞ্জু টেনে ঠিকঠাক করে দিল। সে রান্নাঘরে সব ঠিক করে রেখেছে। একদণ্ড সে বসতে পায় না। মুর্শিদ যখন দেখতে পায়, সকালে উঠে সব সময় কাজ করছে মঞ্জু তখন সে মর্জিনার সঙ্গে মঞ্জুর কোন তফাৎ খুঁজে পায় না। সব চেয়ে ওর কষ্ট হয় যখন সারা সকাল খেটে এবং এগারোটায় প্রায় রান্না শেষ করে মঞ্জু স্নান করতে যায়। স্নান সেরে এসে সে নিজের জন্য সামান্য ডাল, ভাত একটু তরকারি করে নেয়। মঞ্জুকে মুর্শিদ কতদিন বলেছে, কেয়া করে নেবে, জব্বার কাকা কতদিন বলেছেন, মা মঞ্জু ওডা ইবারে কেয়ার

হাতে দিয়া দ্যাও। মঞ্জু হাসত। বলত, চাচা কেয়া ছেলেমানুষ, ও পারবে কেন!

আসলে মঞ্জু বুঝি বুঝতে পারে, কেয়ার রান্না ওরা খেতে পারবে না। মেয়েটা এখনও নুন ঝালের পরিমাণ ঠিক বোঝে না। এক মাছই মঞ্জু কতরকমের যে রান্না করে। এখানে এসে এমন স্নিগ্ধ খাবার মুর্শিদকে ভীষণ পারিবারিক করে রেখেছে। কখনও কখনও মুর্শিদ মাছগুলোর পাশে বসে, যেন রোদ পিঠে লাগিয়ে বসে থাকা অথবা বলা, বড় পাবদা মাছ, মঞ্জু বেশ বেগুন দিয়ে জিরে বাটা দিয়ে একটা পাতলা ঝোল। কৈ মাছ হলে বলবে, সরষে আদা পেঁয়াজ। ভাল বেলে মাছ হলে বলবে, পাতুড়ি, অথবা লাউ-পাতার ভেতরে মাছ আর পেঁয়াজ রসুন পুরে চপ। এবং মঞ্জু এই ক'মাস এ-ভাবেই খাইয়েছে। আর মুর্শিদ খেতে বসলে কেমন আনমনে খায়। সে তাকায় না মঞ্জুর দিকে। সে প্রথম মঞ্জুকে মঞ্জুবৌদি বলত, তারপর যখন সে গাড়িতে সন্ধ্যায় নিয়ে যেত এবং সকাল হবার আগে আবার রেখে যেত বাড়ি তখন ডাকত মঞ্জু। আবার কখনও কখনও সে মঞ্জুকে, মঞ্জু না বলে মঞ্জুদি ডাকত। আসলে মঞ্জুর চোখে মুখে এমন এক চেহারা আছে, তাকে বুঝি কখনও এক সম্পর্কে ডাকা যায় না। খুব গম্ভীর থাকলে, মুর্শিদ মঞ্জু ডাকতে পারে না। ওর চেয়ে মঞ্জু বেশ ছোট। তবু সে ডাকে তখন, মঞ্জুদি।

কখনও খেতে বসলে মনে হয় মুর্শিদের, সব কেমন উগলে আসছে। এটা রোজ হয় না। কখনও কখনও হয়। যেদিন খুব বেলা হয়ে যায় রান্না করতে করতে অথবা যেদিন মঞ্জু মুর্শিদকে খাইয়ে আর সময় পায়না রান্নাব, নিজের জন্য তাড়াতাড়ি স্নান সেরে সামান্য সেদ্ধভাত করে নেয়, তখন মনে হয় যা খেয়েছে সব উঠে আসবে। এতদিন এ-ভাবে সে এখানে থাকত না। কিন্তু মঞ্জু বলেছে, যে-করে হোক ওকে ইণ্ডিয়াতে পাঠিয়ে দেবে। সেখান থেকে সে হোসেনিয়ালার কাছে ঠিক পার হবার মতো দেশের বর্ডার পেয়ে যাবে।

মাঝে মাঝে কিন্তু মনে হয়, এটা ঠিক না। এতদিন কেউ এমন একটা সামান্য মুখের কথায় জীবনের ঝুঁকি নিয়ে থাকে না। আসলে কি মুর্শিদ এই মেয়ে মঞ্জুর ভেতর কখনও কখনও মজিনাকে আবিষ্কার করে ফেলে অথবা মনে হয়, স্বামীর মৃত্যুর পর, এবং যে মৃত্যু সে নিজে দাঁড়িয়ে···, সে এখনও ভাবলে কেমন অসহায় বোধ করে। ধরে নিয়ে যাওয়া, জানালায় মঞ্জু দাঁড়িয়েছিল, চোখে জল ছিল না, কেমন অসহায়, নিষ্ঠুর এবং দুঃখজনক পরিস্থিতিতে শক্ত হয়ে দাঁড়িয়ে থাকা, না কি মুর্শিদ অতদূর থেকে মঞ্জুর সঠিক মুখ দেখেনি, চোখের জল কি অতদূর থেকে দেখা যায়! আর খেতে বসলেই এবং মঞ্জুদির এটা ওটা এগিয়ে দেওয়া দেখলেই সে শুনতে পায় এক রেলগাড়ি যাচ্ছে। দ্রুত এক রেলগাড়ি চলে যাচ্ছে বুকের ওপর দিয়ে। এবং সবুজ ঘাসে রক্ত। টপ টপ ঝরছে। সে তখন আর কিছুতেই কিছু খেতে পারে না। কিছু না খেয়ে উঠে পড়লেই মঞ্জুর ছুটে যাওয়া, এই মুর্শিদ কি হচ্ছে! খাও।

—আমি খেতে পারছি না।

—কেন কি হল! রান্না ভাল হয়নি! নুন বেশি হয়েছে?

—না মঞ্জুদি, এমন রান্না আমি কোথাও কখনও খাইনি। ও-জন্যে নয়। খেতে ভাল লাগছে না।

—আমিতো চিঠি লিখেছি কাল। সে ঠিক চিঠি পেলে চলে আসবে। ঠিকানা সংগ্রহ করতে দেরি হয়ে গেল।

মঞ্জুদি তুমি অত ভাববে নাতো!

—না না, আমিতো বুঝি, তোমার এখন যাওয়া দরকার। কিন্তু যা সব ধর পাকড় হচ্ছে, যাকে তাকে মারছে, খুন করছে, আবার একটা কি না হয়, কিন্তু তুমি এ-ভাবে না খেলে বাঁচবে কি করে!

মুর্শিদ হাসত। আর তখনই সে তাকাত নীলুর দিকে। নীলুর অসুখ, নীলু মরে যাবে। অবনীকে সে মেরে ফেলেছে, অবনীকে সে ভেবেছে কলাবরেটর। এখন অবনী এ-দেশের শহীদ। অবনীকে যেখানে মেরে রেখেছিল, সেখানে কখনও কখনও সে গিয়ে রাতের

অন্ধকারে বসতে ভালবাসে। আকাশে নক্ষত্র জ্বলে। জোৎস্নারাত থাকলে সে শিশিরের শব্দ শুনতে পায়। বর্ষাকালে জলে ভেসে গেছে জায়গাটা। সে আর এখন সেখানে যেতে পারে না। সে বলল, মঞ্জুদি, তোমার সেই লোকটা কেয়াকে নিয়ে কোথায় গেল।

—ওরা গেছে ওদিকটায়।

—তুমি কিছু বলেছ?

—না।

- কবে বলবে?

—আজই বলব ভাবছি।

তারপরই কেমন আবার ছেলেমানুষ হয়ে যায় মুর্শিদ। কেয়া বলছে, ও আমাকে ধরিয়ে দেবে।

নীলু বলল, কে তোমাকে ধরিয়ে দেবে মুর্শিদ চাচা।

—কেয়া। কেয়া আমাকে ধরিয়ে দেবে।

—পিসি ধরিয়ে দেবে না। পিসি তোমাকে ভয় দেখায়।

এবং মুর্শিদ কখনও কখনও এমন ছেলেমানুষ হয়ে যায় যে সে নীলুকেই একমাত্র বিশ্বাসী ভেবে ফেলে। সত্যি যেন কেয়া ওকে ধরিয়ে দিতে পারে। কেয়ার মুখ মাঝে মাঝে প্রতিশোধের স্পৃহায় লাল হয়ে যায়। তখন মুর্শিদ কিছুতেই বুঝতে পারে না, এটা ঠাট্টা।

মঞ্জু নীলুকে অষুধ দেয় তখন। জলটা তখন মঞ্জুর হাতে থাকে।

মুর্শিদ ডোবাকাটা জামা পা-জামা, গালে বাসি দাড়ি, বাসি দাড়ি সকালে মঞ্জুর খুব খারাপ লাগে। সে বলল, যাও দাড়ি কামাও গে। কেয়া ধরিয়ে দিলে দেবে। কি করবে। মঞ্জুও রাগে অথবা ওর ছেলেমানুষীতে বিরক্ত হয়ে এমন ..ল ফেলল।

কেয়ার ভীষণ ভাল লাগছিল অজুদাকে নিয়ে ঘুরতে। মানুষটা লম্বা মানুষ। চোখে ভারি চশমা। মাথায় ঘন চুল। বয়স অনুপাতে ছেলেমানুষী মুখ। আর কলকাতায় থাকে বলে কেন

জানি মানুষটা সম্পর্কে ভীষণ বড় ধারণা। কলকাতা যখন খুব বড় শহর, এবং কলকাতায় যখন বাংলাদেশের অনেক মানুষ অনায়াসে মাস কাল কাটিয়ে দেশ স্বাধীন হলে ফিরে এল, তখন কেয়ারও ভীষণ স্বপ্ন ছিল, সেও একবার কলকাতা শহর দেখে আসবে। আরও যে বাংলাদেশ আছে, ঠিক এ-দেশেরই মতো ঘর বাড়ি, কথাবার্তা এবং তেমনি হয়তো আজানের সময় মোরগের ডাক শোনা যায়। এবং তেমনি চারপাশে সব ফুল ফল, যা এ-দেশে সে নিত্য দেখে থাকে। পঁচিশ বছর এভাবে একটা দেশ কত দূরত্বে ছিল! যখন নিমেষে দেশটা বাংলাদেশ হয়ে গেল তখন অজুদার সঙ্গে ঠিক সে কখনও কলকাতা দেখতে চলে যেতে পারবে। মঞ্জুদিকে একবার বলতে হবে এই যা।

কেয়া বলল, এত তাড়াতাড়ি উঠবে! এখানে তোমাদের ঠাকুর ঘর ছিল না?

—তুমি কি করে জানলে।

—সব জানি।

—নিশ্চয় কেউ বলেছে!

—এই যেমন, এখানে ঠাকুর ঘর, পাশে ডানদিকে গুলঞ্চ ফুল। পুকুর পাড় ধরে উঠে এলে দুটো লাল রঙনের গাছ। কি ঠিক না মশাই!

—খুব ঠিক। কিন্তু দেশভাগের সময় তো তুমি জন্মাওনি'

—এই যে ঠাকুর ঘর, তার পেছনে পুকুরের পাড়ে পাড়ে ঝুমকো লতার গাছ।

—তাও ঠিক।

—এই কোণে দুটো তালগাছ ছিল।

—সে তো বললাম।

—এখানে তোমাদের উঠোন।

—বেশ, কিন্তু তুমি তো কিছুই দেখোনি। জব্বারকাকা নিশ্চয় সব বলেছে।

কেয়া বলল, না। বা'জান একমাত্র দেখেছি সব সময় দুটো বাড়ি সম্পর্কে চুপ থাকত।

-কোন কোন বাড়ি বলতো?

—এই সেনেদের বাড়ি আর তোমাদের বাড়ি। বা'জানকে কিছু বললে, শুধু তামাক খায়। যেন বা'জানের বলার ইচ্ছে, যা বলব, তা ঠিক হবে না। দু বাড়ির পূজা পার্বণ, মানুষগুলো, তাদের ব্যবহার আমি ঠিক ঠিক বলতে পারব না। ওদের বলতে গিয়ে ছোট করে ফেলব।

— ঠিক মঞ্জু বলেছে।

কেয়া বলল, মঞ্জুদি এ-বাড়িতে সময় পেলেই চলে আসত।

—এখন আসে না।

— কম।

—কেন কম আসে বলতে পার।

—জানিনা অজুদা।

—আগে খুব আসত।

—খুব। সবনাদা ঘোড়ায় চড়ে রুগী দেখতে চলে গেলেই বলত, চল কেয়া অজুদের বাড়ি থেকে ঘুরে আসি।

—অজুদের বাড়ি বলতে তো সব বনজঙ্গল।

—ঐ মঞ্জুদির স্বভাব। মঞ্জুদি বলত, এদিকে ওদের বড় ঘর, ওদিকে দক্ষিণের ঘর, কাঁঠাল গাছটার নিচে ছিল পূবের ঘর, উত্তরের ঘরে থাকত ভবানী দাদু। কেবল খক খক করে কাসত।

অজু বলল, ওসব কিছু নেই। কেবল দেখছি আছে কাঁঠাল গাছটা, কিছু আম গাছ। জামরুল গাছটাও নেই, খালে কত মোত্রা-ঘাস ছিল। আর সঙ্গে সঙ্গে অজু কি দেখে সহসা চিৎকার করে উঠল। জঙ্গলের ভেতর প্রকাণ্ড সাপ। জিভ বের করে হিস হিস করছে।

কেয়া হেসে দিল।—অজুদা তুমি কি ভীতু! ওটা সোনালী। রূপালীকে দেখা যাচ্ছে না।

অজু যেন কি সব পুরানো কথা মনে করতে পারে। সে এতবড় গো-সাপ কবে যেন কোন জঙ্গলের ভেতর অথবা নালা ডোবার ধারে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখত। যেন সেই নামাকরণ করেছিল, এবং মঞ্জুও যখন শহর থেকে ফিরে আসত তখন সে অনেকদিন বিকেলের হলুদ রোদের ভিতর সোনালী রূপালীকে খুঁজে বেড়িয়েছে। এবং আশ্চর্য অজু দেখেছে, মঞ্জু যেই ডাকত, সোনালী, রূপোলী তখনই ওরা ঝোপের ভেতর থেকে অতিকায় দুটো কুমীরের মতো বের হয়ে আসত, অথবা জলে থাকলে ভেসে উঠত। মঞ্জু বোধ হয়, শহরে থাকত বলে, গ্রামে এলে আশ্চর্য এক ঘ্রাণ পায়, সে টের করতে পারে, অথবা চোখ বুজে যেন বলতে পারে কোন গাছের ছায়ায় সে হেঁটে যাচ্ছে। গাছের নাম, ফলের নাম, ফুলের নাম সে চোখ বুজে বলে দিতে পারে। এমন মেয়ে যখন মঞ্জু তখন এই সোনালী রূপালী যেখানেই থাকুক না, সাড়াতো দেবেই।

অজু আমলকি গাছটার নিচে এসে দাঁড়িয়েছিল। সে গাছের নিচে ছুটে এসেই যেন অনেকদিন আগের একটা দৃশ্য দেখতে পেয়ে থমকে দাঁড়াল। কেয়া কিছু গাছপালা ঝোপ জঙ্গলের ভেতর বেশ নির্ভাবনায় দাঁড়িয়ে আছে। বর্ষাকালে ঝোপ জঙ্গল ঘন হয়, চার-পাশে আগাছা, লতাপাতায় জড়াজড়ি করে আছে বড় বড় গাছ, অথচ কি আশ্চর্য অজু দেখতে পায়, সব ঝোপ জঙ্গলের ভেতর দিয়ে যেন পায়ে হাঁটা একটা পথ রয়ে গেছে। অজুর মনে হল, সবাই ঘুমিয়ে পড়লে সাদা জ্যোৎস্নায় এই ছাড়া বাড়িতে মঞ্জু বোধ হয় এখনও কাউকে খোঁজে। ছায়া ছায়া অন্ধকারে ডাকে, সোনালী, রূপোলী, তোরা আয়।

অত আগের সেই বড় গো-সাপ দুটো এখনও তবে বেঁচে আছে! ঠিক বেঁচে আছে বললে ভুল হবে, যেন এই বাড়ির পাহারাদার হয়ে আছে।

কেয়া বলল, মঞ্জুদি রোজ একবার এখানে আসে। ওদের খেতে দেয়। মঞ্জুদি, ওরা যতক্ষণ খাওয়া শেষ না করে দাঁড়িয়ে থাকে।

—কি খায় ?

—সব। ভাত মাছ, যা দেবে হুঁস-হাঁস খেয়ে নেবে। কি মজা লাগে না দেখতে।

—আজও দেবে ?

—দেবে না মানে ঠিক দেবে।

ওর বলতে ইচ্ছে হচ্ছিল, অবনীর মৃত্যুর দিনে ওদের খাওয়াতে নিশ্চয় মঞ্জু ভুলে গিয়েছিল। কিন্তু এমন কথা বলতে কেমন সংকোচ বোধ করল। সে বলল, ওরা আমাকে দেখছে।

—মনে হয়। বলে পাশে এসে দাঁড়াল কেয়া।

—আমাকে চিনতে পারছে মনে হয় কেয়া।

—আমারও মনে হচ্ছে।

—দ্যাখো কি লম্বা জিভ! বাবা! না দেখলে বিশ্বাস করা যায় না।

—কেমন দ্যাখো লাল চোখ। আর দ্যাখো কেমন লেজ নাড়ছে।

অজু বলল, কি সোনালী রূপোলী চিনতে পারছিস ?

ওরা তখন বেশি করে লেজ নাড়ছিল।

অজু বলল, আমি কিছু খাবার আনিনি। কি করে বুঝব, তোরা বেঁচে আছিস। তোরা আমাদের বাড়িটা পাহারা দিচ্ছিস।

কেয়া বলল, এবার যা। আমরা আবার আসব।

ওরা গেল না। কুমীরেরা যেমন রোদ পোহায়, ঠিক পায়ের কাছে নয়, তেমনি একটু দূরে চোখ বুজে শুয়ে থাকে ওরা। নড়ল না।

কেয়া বলল, এই যা বলছি!

ওরা তবু গেল না।

—ভারি বেহায়া তো। দেখেই একেবারে গলে গেছে।

অজু বলল, তোমার বুঝি ভীষণ রাগ হচ্ছে কেয়া।

আর সঙ্গে সঙ্গে কেয়ার মুখ কেমন সহজে লাল হয়ে গেল। চোখে তার মায়া মাখানো। সে আর যেন দাঁড়াতে পারে না। চারপাশে যে গাছপালার সজীবতা আছে তার ভেতর নিজের

সজীবতা বুঝি ধরা পড়ে যাবে। সে আর হয়তো ঠিক থাকতে পারবে না। কারণ কখনও কখনও, দূরের নক্ষত্রে যেন কেউ থেকে যায়, মনে হয় নাগালের বাইরে, সেখানে যা কিছু সবই কেমন মহিমময়। কাছে এলে কিছুতেই সহজে আর কথা বলা যায় না। গতকাল থেকেই অজুদাকে মনে হচ্ছিল, পৃথিবীতে সে সেরা মানুষ। পৃথিবীতে এর চেয়ে সেরা মানুষ আছে সে যেন আর তখন জানে না। এবং এটাই স্বভাব মানুষের, কখন কিভাবে যে ভেতরে কিছু হয়ে যায়।

কেয়া আর কথা বলছে না দেখে অজু বলল, সে হয়তো না জেনে খারাপ কথা বলে ফেলেছে। এবং এই যে একটা সময়, এখন সকাল শেষ হয়ে যাচ্ছে, রোদ ক্রমে মাথার ওপর, ডাকঘরের তালা খুলে গেছে, ঘোড়াটা অর্জুন গাছের নিচে বাঁধা, ঘাটে এসে এক দুই করে নৌকা লাগছে, ওরা খবর নিতে আসবে, এই গাঁয়ে পোষ্টঅফিসে ওদের জন্য কি খবর আছে, এখন তো আর একে গ্রাম বলা যায় না, একেবারে শুধু ছাড়াবাড়ির পর ছাড়াবাড়ি, এবং ছাড়াবাড়ি বলেই মনে হয় এক অরণ্য সৃষ্টি হচ্ছে ক্রমে চারপাশে, তার ভেতর একটা শুধু বাড়ি, লাল ইটের বাড়ি, কোন দূর পাহাড়ের কোলে অথবা সমতলভূমিতে গভীর অরণ্য সৃষ্টি হলে যা হয় তেমনি, কেবল যেন মানুষেরা কৃত্রিম কিছু করে রেখেছে, যা দেখলে ভাবা যেতে পারে, মানুষেরা এখানে থাকে। মঞ্জু অথবা কেয়ার মতো মেয়েরা, জব্বার কাকার মতো মানুষেরা এখানে থাকতে পারে।

অজু বলল, এই কেয়া।

কেয়া কথা বলল না।

—আরে আমি ঠাট্টা করেছি। এস। ওরা যাবে না। ওরা একবার চিনতে পারলে সহজে যায় না।

কেয়া শুধু হাঁটতে লাগল। অজু আগে, কেয়া পেছনে। আর আশ্চর্য, সেই কুমীরের মতো বড় গো-সাপ দুটোও এগিয়ে আসছে। কেয়া পাতায় খস খস শব্দ এটা বুঝতে পারছিল।

কেয়া উঠোনে এসে বলল, এটা উঠোন। বোঝা যায় না। কত রকমের গাছ দেখুন। সে বসে পড়ল। একটা ছোট্ট আগাছা তুলে বলল, এর নাম আপনি জানেন না।

—না।

—এরা কিন্তু আপনারা যখন ছিলেন তখনও হত।

—হবে হয়ত।

—না হলে, এতদিন পর ওরা হত না।

—তা, ঠিক বলতে পারব না।

—মাটির গুণ তো পাল্টে যায় না। এ-মাটিতে যা হয় তাই হবে। এখানে আপনি কোন বিদেশী গাছ খুঁজে পাবেন না। লাগালেও বাঁচবে না।

—তা অবশ্য ঠিক। এবং এ-ভাবে অজু বুঝতে পারছে না, কেয়া কি বলতে চায়। ওর কি বলার ইচ্ছে, ওকি অজুকে এখন অপমান করবে, আপনার আস্পর্ধা ভীষণ। যদি এমন বলে, তবে সে সহজেই ক্ষমা চেয়ে নিতে পারবে। অজু নিজের ছেলেমানুষীর জন্য ভীষণ লজ্জা পেল। সে ঠিক কিছু ভেবেও বলেনি এটাও আর বোঝাতে পারছে না। কি যে করে এখন!

কেয়া আগাছা ফেলে দিয়ে হাত ঝাড়ল। একটু মাটি লেগেছিল। দু আঙুলে ঘসে ঘসে মাটি আঙুল থেকে তুলে ফেলল। বর্ষাকাল। চারপাশে মাথার ওপর আমলকি গাছ, কাঁঠাল গাছ। এ-সব নানা-রকমের গাছ ছায়া মেলে থাকলে নিচের মাটি ভেজা থাকে। কেয়া বলল, আপনারা চলে গিয়ে ভুল করেছেন অজুদা।

অজু বলল, কেন?

—দেখলেন তো এ-মাটিতে অন্য গাছ হয় না। মাটির যা স্বভাব তাই হবে। আপনারা কেন যে চলে গেলেন!

—সে তো বাবা জ্যাঠা বলতে পারে। তখন তো আমি ছোট।

—সে, যেই গেছে, ভাল করেনি। নিজের মাটিতে বড় হওয়াই ভাল।

অজু বলল, দেখ কেয়া, সব মাটিই সবার। তুমি যদি ধর্ম মানো, তবে দেখবে, মানুষের জন্য এ-পৃথিবী। মানুষ এখানে আছে থাকবে। তাকে তাড়ালে সে যাবে না। সে তার ঠিক আস্তানা তৈরি করে নেবে।

—আমি ঠিক বুঝতে পারছি না।

—বলতে চাইছি, যারা চলে গেছে, তারা আর ফিরবে না। কারণ, মানুষ যেখানে বাস করে, বড় হয় সেটাই তার বাসভূমি। যেমন আমি কিছুতেই ভাবতে পারি না, এখানে ফিরে এসে আমাকে বাঁচতে হবে। অথচ ছাখো শৈশবের জন্য এক মায়া থাকে, ঘুরে ফিরে সেই মায়া আমাকে আচ্ছন্ন করে রাখে। কিন্তু যখন চোখ মেলে ভালভাবে তাকাই, বুঝতে পারি আমি ভীষণ বদলে গেছি। এমন নির্জনতা, আমাকে ভয় পাইয়ে দেয়।

—তা হলে আপনি আমাদের ঠিক মানুষ ভাবেন না!

—তার মানে!

—আমরা এখানে বনে-জঙ্গলে থাকছি।

—তুমি কেন যে কেয়া ঝগড়া করতে আরম্ভ করলে বুঝি না!

—আপনার সঙ্গে আমি ঝগড়া করতে যাব কেন?

—কি জানি, আমিও ভেবে পাচ্ছি না তুমি ঝগড়া করতে যাবে কেন?

—এখানে আপনি ছুলে ছুলে পড়তেন।

—হ্যা। ও-জায়গায় ছিল দক্ষিণের ঘরের বারান্দা। অবশ্য তুমি না দেখালে আমি চিনতে পারতাম না। একটা তক্তপোষ ছিল, বড় তক্তপোষ। আমরা সব ভাইবোনেরা গোল হয়ে পড়তে বসতাম। মাস্টারমশাই মাঝখানে বসে পড়াতেন। আমরা অনেক ভাইবোন ছিলাম, বাবা আমার তেমন ভাল কাজ করতেন না বলে সংসারে মা আমার ভীষণ দুঃখী ছিল।

কেয়া বলল, আমি সব জানি। মঞ্জুদি বলেছে।

অজুর খারাপ লাগছিল ভাবতে, সে যা বলতে যাচ্ছে, দেখছে,

সবই মেয়েটা জানে। সে বলল, আমি তোমাকে দেখছি নতুন কিছু শোনাতে পারছি না। সুতরাং চল। আর না। বলে সে তালগাছ দুটো পার হয়ে চলে এল। কেয়া পেছনে পেছনে আসছে তেমনি। গো-সাপ দুটো আর আসছে না। পাশের পুকুরে ওটা বোধ হয় ভেসে গেছে।

এক সময় বাড়ির কাছাকাছি এলে অজু বলল, কিছু আজেবাজে কথা বলে ফেলেছি কেয়া, তুমি মনে কিছু কর না।

—আমিও তো কি সব মাথা মুণ্ডু বললাম। দেখাতে গেলাম, কত কিছু জানি মানুষ সম্পর্কে। একটা গাছ তুলে কত কি বললাম। আসলে আমি কিছুই জানি না অজুদা। কেন যে আপনার ওপর এমন রেগে গেলাম বুঝতে পারলাম না।

—কিছু হয়তো এমন বলে ফেলেছি যা তুমি শুনতে চাও না।

কেয়া সামনে এসে দাঁড়ালো। ওর চুল কি ঘন! মুখ কি লাবণ্যময়! চোখ কি বড়! যেন সে সহসা আশ্চর্য এক যুবতী হয়ে গেছে এবং ক্রমে ভীষণ সাহসী হয়ে যাচ্ছে। সে দুপায়ে ভর করে অজুর মতো লম্বা হতে চাইছে, পারছে না, কষ্ট। সে বলছে, অজুদা না ভেবে চিন্তে পাগলের মতো কি সব বলেছি। আপনি কিন্তু মঞ্জুদিকে আবার এ-সব বলতে যাবেন না। মঞ্জুদি জানতে পারলে কষ্ট পাবে। আমার রক্ষে থাকবে না।

মুর্শিদ ফিরে এসে চুপচাপ কিছুক্ষণ বসে থাকল। মঞ্জু তাকে ধমকেছে। মঞ্জু বলেছে, কেয়া ঠিকই বলেছে। এবং এমন মনে হলে সে দেখতে পেল, সামনের জানালা খোলা। কিছু বড় বড় রসুনগোটার গাছ, ডানদিকে কিছু ড্যাফল গাছ, আরও গভীরে বেতের ঝোপ, শরতের রোদ ঝোপের ফাঁকে-ফোকরে বেশ ছোট ছোট সাদা কবুতরের মতো যেন বসে আছে। সে এ-সব দেখলে মঞ্জুর ওপর রাগ অথবা চাপা অভিমান নিয়ে বসে থাকতে পারে না। অথচ

আজ সে কেন যে সত্যি সবকিছু অবিশ্বাস করছে। লোকটা কে! সে কেন এখানে এসেছে মুর্শিদ যতদূর জানে, মঞ্জু তাকে চিঠি দিয়েছে। মঞ্জু বেশ ক'মাস কাটিয়ে দিয়েছে, অথচ কিছু তার জন্য করতে পারেনি। মঞ্জু কি ভেবেছিল, এই যে আত্মসমর্পণ সব সেনাদের, তা শেষ পর্যন্ত টিকে নাও থাকতে পারে। এখন কি মঞ্জু ভাবছে, সত্যি দেশ স্বাধীন। মুর্শিদ থাকল কি গেল আসে যায় না।

সে বের হয়ে গেল। দরজা ভাঙ্গা। ধরলে হাতে ময়লা উঠে আসার কথা। ওকে, কেয়া মঞ্জু এ-ঘরটায় পালিয়ে রেখেছে বলে পেছনের দিকটা, পেছনের দিকটা বলতে মঞ্জুদের ভেতর বাড়ি থেকে যা চোখে পড়ার কথা, সে সবে একেবারে হাত দেওয়া হয়নি। সামনের দরজা, অর্থাৎ ঝোপ জঙ্গলের মুখে যে দরজা-জানালা, সে-সব কেয়া মুছে তকতকে করে রাখে। সে এক জামা কাপড়ে বের হয়ে এসেছে। কেউ ওকে এখন দেখতে পাবে না। এবং ডান দিক ঘুরে গেলে পুকুর পড়বে। পুকুরের পাড়ে সব সময় ভারি নিজনতা থাকে। মাঝে মাঝে খালে নৌকার শব্দ হয়। সে ভাবল, যাই হোক, সে যদি সামান্য পানি ভেঙ্গে কাছারি বাড়ি উঠে যেতে পারে, তবে পালাতে তার অসুবিধা হবে না।

আসলে এই মঞ্জুদির এখন মাথা ঠিক নেই। ক্রমে সে এমনিতেই বিশ্বাস হারিয়ে ফেলছিল। মঞ্জু তার জন্য কিছু করছে না। সে মঞ্জুকে বলেছে, তুমি আমাকে নারাণগঞ্জে রেখে এস, সেখান থেকে আমি ঠিক বাংলাদেশের বডার পার হয়ে চলে যাব।

—তোমার কি পরিচয় হবে!

—নাম একটা বলব।

—মুর্শিদ তুমি ভীষণ ভাতু মানুষ। এক ধমক লাগালে তুমি বলে দেবে, স্যার, আমি আর্মি থেকে ডেজার্টার। তুমি তোমার কোম্পানীর নম্বর, সেকশান, প্লেটুন কত, তোমার নম্বর কত সব বলে দেবে। তখন আবার ক্যাম্পে পাঠালে কে তোমাকে রক্ষা করবে! আর তুমি যদি এভাবে চলে যাও, রাতে মেজরকে কে খুন করেছিল

কেউ জানবে না। তখন তো একটা ভীষণ অসময়, কেউ জানে না কি হবে, কি ভাবে সব যে ধর পাকড় হচ্ছে, সবাই পালাচ্ছিল ঘাঁটি ছেড়ে, তখন তোমার এমন ঘটনায় আর সাক্ষী থাকছে কে। তুমি কোন রকমে ভারতবর্ষে অজুদার সঙ্গে চলে গেলে, সে একটা ব্যবস্থা করতে পারবে।

আবার আবদার, কৈ চিঠি দিলে অজুদাকে।

—ওর ঠিকানা যোগাড় করতে পারছি না।

—সে কোথায় থাকে জান না?

—না, মুর্শিদ। সে তো আমার সঙ্গে বিশ বাইশ বছরের ওপর কোন সম্পর্ক রাখে নি।

—কেন!

—কি করে রাখবে, দুটো দেশ, দুটো আলাদা দেশ, কেউ কাউকে চিঠি দিতে পর্যন্ত পারত না।

—তবে কি হবে!

—আমি যাদের ঠিকানা জানি, তাদের চিঠি লিখেছি, বলেছি, অজুদার ঠিকানা জেনে পাঠাবে।

—পাঠাচ্ছে না কেন?

—কেউ লিখেছে, ওরা জানে না, ওরা আবার কাউকে লিখেছে, ওরা জানালে, ঠিক তারা আমাকে জানিয়ে দেবে।

এ-ভাবে সময় যাচ্ছিল, আর মুর্শিদ মনে মনে কেমন অসহিষ্ণু হয়ে উঠছিল। এবং আজ কেন যে মুর্শিদের মনে হল, মঞ্জুদি ভীষণ ক্ষেপে গেছে, ক্ষেপে গেলে মাথা ঠিক থাকে না। মেজরের মুখে সে চোখের ওপর মঞ্জুদিকে দেখেছিল মদের গ্লাস ছুঁড়ে দিতে। কেমন পাগলের মতো করত মঞ্জুদি। এবং এক জ্যোৎস্না রাতে সে দেখেছে মঞ্জুদি একেবারে উলঙ্গ। পাঁচিলের পাশে দাঁড়িয়ে পাগলের মতো মুখে যা আসছে বলে যাচ্ছে। সে ভেতরে ঢুকেছিল, সে পাহারায় থাকত। বয় বাবুর্চিদের এদিকে আসার নিয়ম নেই। আর্দালিটাকে ছুটি দেওয়া হয়েছে। সে ভেতরে ঢুকে দেখেছিল, মঞ্জুদির সব শাড়ি

শায়া খুলে মানুষটি দরজা বন্ধ করে দিয়েছে। মঞ্জুদিকে ঘর থেকে বের করে দিয়েছে। নেশার ঘোরে এটা হয়েছে সে বুঝতে পেরেছিল, সে ডেকেছিল মেজর সাব, জরুরী ফোন। এবং এ-সব না বললে ঠিক হুঁশ ফেরে না। দরজা খুললে, সে দেখেছিল মেজর সাব পাগলা কুকুরের মতো তাকাচ্ছে। মঞ্জুদির শাড়ি শায়া সব ভিজানো। কাচের গ্লাস ভেঙ্গে চুরমার। রক্ত পড়ছে গাল থেকে। সে মোটা তোয়ালের গাউন শরীরে জড়িয়ে রেখেছে। প্রায় বেহুঁশ। তখন ভীষণ সময়, কেবল ম্যাসিনগান আর মর্টারের শব্দ। জরুরী ফোনে মেজর সাবের চোখ গোল গোল। কথা আড়ষ্ট। টলতে টলতে বের হতে যাবেন, তখন মুর্শিদ বলেছিল, সাব সব ঠিক হ্যায়। হাম জলদি মোকাবিলা করেঙ্গে। সে আসলে, এসেছিল ঘরে মঞ্জুদির পোশাক নিতে। সে দূর থেকে, অর্থাৎ পাঁচিলের ও-পাশ থেকে মঞ্জুদির ওপরে সব ছুঁড়ে দিয়ে বলেছিল, চলিয়ে। জলদি।

সকালে হুঁশ ফিরলে মানুষটাকে বোঝাই যেত না, রাতে পাগলা কুকুর হয়ে যায়। সকাল আটটার আগে তখন তার ঘুম ভাঙছে না। সামরিক কেতা কানুন কিছু মানছে না। কেমন নিজেই অধীশ্বর হয়ে গেছে এ-অঞ্চলের। আবার রাত বাড়লে চঞ্চলতা বাড়ে। এখানে, ওখানে শব্দ শোনা যায়। হু কামস্ দেয়ার। কাঁটাতারের বেড়ার ওপাশে জোনাকির আলো পর্যন্ত ভয়াবহ। এ-সময় কেউ কাছে না থাকলে মেজর সাব মেজাজ পান না। তারপর রাত বাড়লেই হুকুম, মুর্শিদকো বোলাও।

মুর্শিদ এলেই, এক আদেশ।

মুর্শিদ এ-ভাবে তারপর একটা জিপ নিয়ে যাওয়া আসা করেছে। মঞ্জু তখন জিপের আওয়াজ পায়। কেমন অভ্যাসে দাঁড়িয়ে গেছে। কেয়া রাতে ফিরে আসে তখন। দিনের বেলায় সে বনে জঙ্গলে আশ্রয় নিয়ে থাকে। আসলে লোভ ছিল কেয়ার ওপর। একবার কেয়াকে ওরা তুলেও নিয়ে গিয়েছিল, এবং কি করে যে পরে, একটা সামান্য কুমারী মেয়ে অভ্যাস নেই, অভ্যাস থাকলে

সহজে অন্তত মোকাবেলা করা যায়, মঞ্জুর বোধ হয় তাই মনে হয়েছিল, মুর্শিদ এলে বলা, কেয়া পালিয়েছে !—পালিয়েছে ! কখন ! সেই সকালে। কেয়া, জব্বার কাকা সব।

—তুমি একা !

—একা।

—না, নিয়ে যেতে পারলে আমাকে ঠিক গুলি করবে। এখানে এসে ওর লোকজন তোমার বাড়ি পর্যন্ত জ্বালিয়ে দিতে পারে মঞ্জুদি।

মঞ্জু বলেছিল, চল। শক্ত গলা। যেন মোকাবেলা করতে চায়। এবং সে চুপচাপ ছিল। একটা কথাও না। অবনী দশমাসের ওপর মারা গেছে। সে শরীরে সব দুঃখ ধরে রেখেছে এতদিন। এবং ভেতরে উষ্ণতা কিছু জমে যায় এ-ভাবে, সে ভয় পায় না। কারণ সে জানে এ-ভাবে মঞ্জুদি বোধ হয় অনেকদিন পথ হেঁটে দেখেছে, অবনী অথবা মেজর সাব, সব একরকমের নিষ্ঠুরতার ভেতর বেঁচে থাকে। মঞ্জুদি কিছুই হয়তো মনে করেনি তখন। মেয়েটা অনভ্যাসে মরে যাবে ভেবে বুঝি মঞ্জুদি ঝাঁপিয়ে পড়েছিল।

কিন্তু মঞ্জু দেখেছে শুধু টরচার। তোমার কি আছে আমি জানি হে বুড়বক। কিন্তু তুমি আমাকে টরচার করছ কেন। মানুষটার উর্দু ভাষা সে একবিন্দু বুঝত না। কারণ মেজর সাবের প্রায়ই ইচ্ছে হত, বনের ভেতর কোন মেয়েমানুষ নেংটা হয়ে ঘুরে বেড়ালে, সে ইজিচেয়ারে বসে তখন মদ্যপান করবে। এবং তখনই বোধ হয় মঞ্জু ক্ষিপ্ত হয়ে উঠত। যেবার পারে সে যেন পারলে মর্শিদের গলা কামড়ে ধরতে চায়। আর মঞ্জু হয় তো সুযোগ বুঝে এখন তার বদলা নেবে। সে তাড়াতাড়ি লাফ দিয়ে জলে নেমে পড়ল। এখানে কোমর জল। জলটা পার হয়ে গেলে কাছারি বাড়ি। এখানে আগে হিন্দু জমিদারদের কাছারি ছিল। এখন ভাঙ্গা চালাঘর, উঁচু ঢিবি, পরে খাল, খালে এখন নানারকম শাপলা ফুল ফুটে আছে।

সে জলার ধারে দাঁড়িয়ে থাকল। জলে নেমে যেতে সে সাহস পেল না। সে সামান্য সাঁতার জানে। সে খাল পার হয়ে

সামনের আমবাগান পর্যন্ত উঠে যেতে পারে। তারপর যা কিছু সামনে, শুধু বর্ষার জল। সাঁতার জল। সে এতটা সাঁতরে যেতে পারবে না। পাকা সড়কে সে পালাতে পারে। কিন্তু এমন একটা পোশাকে অথবা ওর ধারণা, সে যে পোশাকেই পাকা সড়কে হেঁটে যাক না, এ-অঞ্চলের মানুষেরা তাকে চিনে ফেলবে। এ-ই যে সেই মানুষটা, সেনেদের বাড়ি যে যেত, সময় পেলেই টর্চ হাতে যে মানুষ সিভিল ড্রেসে ঘুরে বেড়াত সাইকেলে, সেই মানুষকে কে না চেনে। তা ছাড়া সকালের বাস চলে গেছে, বাসে উঠতে গেলে পয়সা লাগে, তার কাছে একটা পয়সা নেই। সে যে কি করে!

মুর্শিদ ভাবছিল। তার ছায়া জলে ভাসছে। সে দেখছে, সে ভীষণ ভাবে একা। এখানে যার আশ্রয়ে সে আছে, তাদের কাছে আর কোন মানুষজন নেই ভেবে সে বসে থাকল। ওদিকটায় খাল। খালের এ-ধারে প্রচুর কলাগাছ, এবং পাখির ডাক শোনা বাদে সে এখন আর কিছু করতে পারছে না। যাই করুক, হুম করে কিছু করে ফেলতে পারে না।

সে কিছুক্ষণ বসে থেকে বুঝতে পারল, ওর বেশ খিদে পেয়েছে। গ্রামে মানুষ জন নেই বলে, বাড়িগুলো থেকে মানুষ জন চলে গেছে বলে, কাছারি বাড়ি পার হয়ে গেলে ঘোষেদের লিচু বাগান, বাগানে ঝোপ জঙ্গল, সে ইচ্ছা করলে কিছুক্ষণ এখানে পালিয়ে বসে থাকতে পারে। এবং রাত হলে পাকা সড়কে হেঁটে যাবে অথবা যদি সিঙপাড়ায় সে যায়, সেখানে একটা ডিঙ্গি পেয়ে যেতে পারে।

নানারকমের ভাবনা মাথায়। কেয়ার ভয় দেখানো, মঞ্জুর বিরক্ত মুখ সব ওর কাছে ভয়াবহ ভাবে দেখা দিচ্ছে। এটা ওরা করতে পারে। ওদের এমন একটা কাজ করতে কষ্ট হবে না। কেনই বা ওরা এত করবে! সে তো ওদের জন্য কিছু করতে পারে নি। ওর হাতে অবনীর মৃত্যু, পরবর্তী ঘটনাগুলোর সাক্ষী সে, নিয়ম মতো কাজ চালিয়ে সহসা এমন যে কেন হলো তার। কি দরকার ছিল, মেজর সাবকে গুলি করার। সে তো অনেক অসহনীয় মৃত্যু দেখেছে,

সে তো দেখেছে, কত সুন্দর সুন্দর যুবকদের ধরে আনা হয়েছে, তারপর লাথি মেরে কথা বের করার জন্য সে নানারকম যন্ত্রণার ভেতর ওদের নিয়ে গেছে এবং পরে ওদের মৃত্যু। বিকৃত মুখ ওদের। থেঁতলে থেঁতলে যুবক মানুষগুলোর মুখে ধোঁয়া দিয়েছে। ওরা যদি এখন বদলা নেয়, যেন কোন দোষের নয়। ওর মনে হল, এটাই স্বাভাবিক। তাকে নিজেই পালাবার একটা পথ খুঁজে নিতে হবে।

তারপর সে ভাবল, এতদিন আসলে মঞ্জুদি ওকে ধোঁকা দিয়ে রেখেছে। যার জন্য অপেক্ষা করতে বলা, আসলে সে মঞ্জুর নিজের মানুষ। বোধ হয়, এমন একটা কাজ মঞ্জুর একার করতে সাহসে কুলায় নি। নিজের মানুষ কাছে না থাকলে সে ঠিক বদলা নিতে সাহস পাবে না।

একটা ছোট গাছ এখন মাথার ওপর। মঞ্জুদি একদিন গাছটা ওকে চিনিয়েছিল। একটা লটকন গাছ। অনেক ফল। ফল খেতে বেশ মিষ্টি। কিন্তু অবিশ্বাস তার ভেতরে। সে একটা ফল তুলে খেতে পর্যন্ত সাহস পাচ্ছে না। আসলে ফলগুলো ফল না। বিষাক্ত ফল হতে পারে। সেতো কখনও খেয়ে দেখেনি। যখন গাছটা দেখিয়েছিল, তখন গাছে ফল ছিল না। মঞ্জু কেবল বলেছিল, বর্ষায় ফল হয়। ফল খেতে খুব সুস্বাদু।

খিদের সময় এ-সব অবিশ্বাস থাকা ঠিক না। সে গাছের ডাল থেকে এক থোকা ফল পেড়ে দেখতে থাকল। না, খেতে সত্যি ভাল। এমন ফলতো আছে, খেতে ভাল, পরে অনিষ্টকারী। ভেদবমি হলে সে যাবে কোথায়। কিন্তু খিদের সময় সে-সব মনে থাকে না। ফল খেতে খেতে সে পালাবার কথা ভাবছে। এবং মনে হল তার রাত না হলে, সে কিছু করতে পাবে না। যেদিকে যাবে সেদিকে যেন তার চেনা মানুষ মিলে যাবে। আরে এ-যে সুবাদার সাব, কখনও সুবাদার সাব ছিল সে, কখনও সে নিজেকে মেজর সাব বলেও বর্ণনা করত। যার কাছে যা দরকার। ওরা ওর ইউনিফরম দেখে চিনতে পারত না আসলে সে কি!

এখানে বসে থেকে সে তার মজিনার কথা কিন্তু মনে করতে পারল না। নিজের জীবন নিয়ে সে ছিনিমিনি খেলছে। মঞ্জুর যখন সব গিয়েছে, তখন বা কটুকু রেখে কি লাভ হল। সে এখন মনে করতে পারছে না, আত্মসমর্পণের আগে মেজর সাব কেন যে এত অস্থির হয়ে উঠেছিল। প্রত্যেক রাতে মঞ্জুকে মেজরের ইচ্ছায় পুতুল সেজে থাকতে হয়েছে। যখন যা খুশি। গভীর রাতে সে যখন জিপ চালিয়ে আসত, কখনও মঞ্জুকে মনে হয়নি, সে ব্যভিচারে লিপ্ত থেকেছে। বরং সাফ গলা মঞ্জুর। মঞ্জু যেমন বলত, কাল একটু দেরি করে যেতে হবে। সকাল সকাল এলে আমি যেতে পারব না মুর্শিদ।

—কেন?

—নীলু না ঘুমালে আমি যেতে পারব না। ওর আজকাল কি যে হয়েছে! রাতে ঘুমাতে চায় না। বোধ হয় টের পেয়েছে মা কোথাও যায়।

—কিন্তু মেজর সাব...।

—ওকে বলেছি।

—ও কি বলেছে?

—বলেছে। ফেরার সময় তোমাকে বলতে বলেছে।

—তখন হুঁশ ছিল।

—ও আজ একেবারেই খায়নি। বোধ হয় কোথাও কিছু হচ্ছে। আমরা তো বুঝতে পারছি না। কেবল শুনছি, খানসেনারা কলকাতায় ঢুকে বোমা ফেলছে। হাওড়া ব্রীজ উড়িয়ে দিয়েছে। কাল থেকে তো ঢাকা রেডিও পর্যন্ত পাওয়া যাচ্ছে না।

—আমারও মনে হয় কিছু হয়েছে। আমরা কিছুই জানতে পারছি না। কি যে হবে!

মঞ্জুর কথা শুনে মনে হত তখন, কিছু হলে, ওর এমন একটা সুখের সময় নষ্ট হয়ে যাবে। মেজর সাব পাঞ্জাবী এবং উঁচু লম্বা, তিনি তাঁর মাতৃভাষা পর্যন্ত ভাল করে বলতে পারেন না। ইংরেজি

উচ্চারণ ওর খুব ভালো। এবং ভাল ক্যাডেট হিসাবে তিনি খুব কম বয়সে উঁচু জায়গায় চলে গেছেন। কিন্তু কি যে হয়ে যায় মানুষের, শেষ দিনগুলোতে মেজর-সাব বেপরোয়া, উচ্ছৃঙ্খল, কোন এক কঠিন দুর্যোগের সামনে প্রাণ হাতে দাঁড়িয়ে থাকলে মানুষের যে শৃঙ্খলার অভাব ঘটে তেমনি মেজর সাব, চিৎকার করতে থাকেন, কিল দেম। স্যুট্ দেম। অল কলাবরেটরস্। এবং একদিন সে দেখেছে একজন ভিখারী মানুষকে ওরা টানতে টানতে এনে ওর পায়ের কাছে ফেলেছিল। মুর্শিদ ওকে চিনত। সে মুসকিলাসান হাতে নিয়ে কালো জোব্বা গায়ে বাড়ি বাড়ি ঘোরে। গলায় লাল নীল কড়ির পাথরের মালা। ওকে একজন স্পাই ভেবে, গলায় গুলি ঝুলিয়ে দিল। এমন কি মুর্শিদ বলতে সাহস পায়নি, মানুষটা ভিখারী, সে তাকে চেনে।

তখন মঞ্জুর এমন কথা শুনে তাকে ব্যভিচারিনী না ভেবে যেন মুর্শিদের উপায় ছিল না। মঞ্জুদিকে কখনও অনুতপ্ত মনে হত না। কেবল শেষদিকে যখন মেজর সাব ক্রমে ক্ষেপে যাচ্ছিলেন, কিছুই আর বিশ্বাসের অবশিষ্ট ছিল না, এবং এক রাতে যখন, বনের ভেতর হাঁটিয়ে নেবার বাসনা, একেবারে উলঙ্গ মানবীর পাশে সে ওরা হাতে সারি র পায়ে পায়ে নতজানু, তখন মুর্শিদ দেখেছিল, মঞ্জুদি গাছের নিচে চুপচাপ দাঁড়িয়ে আছে। একেবারে খোলা আকাশের নিচে মঞ্জু বোধ হয় এ-সব সহ্য করতে পারেনি।

এ-ছাড়াও সে ব্যভিচারিণী ভেবেছে এখন বার বার অবনী কবিরাজের মুখ মনে হয়েছে। কবিরাজকে কখনও দাদা, কখনও বাবু. কখনও কবিরাজ বলত। মঞ্জু কবিরাজের সুন্দরী বৌ, শুধু সুন্দরী বললে ভুল হবে, মঞ্জু এবং কেয়ার লোভে মুর্শিদ যেন এমন একটা সুন্দর বাড়িতে আসত। নাল জানালার ভেতরে মঞ্জুর মুখ ওর কাছে অনেক দূরে মজিনার ছবির মতো। সে এসে একবার দেখতে পেলেই খুশি অথবা কেয়াকে নিয়ে সামান্য হাসি ঠাট্টা। অবনীকে মেরে ফেলার পর কিছুদিন যেতে না যেতে মঞ্জুকে কেমন স্বাভাবিক দেখাচ্ছে

থাকল। এত কম সময়ে স্বামীর এমন নৃশংস মৃত্যু কেউ ভুলে যায়, ভাবতে কেমন কষ্ট হত। অথবা যখন ওকে নিয়ে যাওয়া হল, সেতো আত্মহত্যা করতে পারত। হিন্দু মেয়েদের এমনতো কত ঘটনা ইতিহাসে পাওয়া যায়। মঞ্জু জহর ব্রত করতে পারত। না, তা না, যেন কেয়াকে রক্ষা করার জন্য বনে গমন। ও-সব বুজরুকি। মুর্শিদ ক্ষেপে লাল এখন। সে গাছের নিচে বসে ঘাস ছিঁড়ছে আর মনে মনে মঞ্জুকে ছেনাল বলছে। মর্জিনা কখনও এটা করত না। সে ঠিক আত্মহত্যা করত। মঞ্জুকে এ-সময় মুর্শিদ ব্যভিচারিণী বাদে আর কিছু ভাবতে পারল না। অনর্থক সে মেজরসাবকে গুলি করে মেরে ফেলল। কপাল দোষে সে আজ আর্মি থেকে ডেজার্টার। দুনিয়ার সব মানুষ তার বিরুদ্ধে।

সে যে এখন কি করে!

তার তখন মনে হচ্ছে গুলি মেজর সাবকে না করে মঞ্জুকে করা উচিত ছিল। অবনী কবিরাজকে গুলি করার পর, সে দীর্ঘদিন এদিকটায় আসেনি। কেমন সংকোচ। শুধু সংকোচ নয়, ভয়, সে বোধ হয় আর আসতই না, কি করে যে তখন সেই মিলিটারি ক্যাম্পে কেয়ার খবর হয়ে গেছে! কি করে যে খবর চলে গেছে, এখানেই আছে মুর্শিদ, ও-পরিবারের সঙ্গে তার মেলামেশা অনেক দিনের। এ অঞ্চলে আর আপনার ভোগে লাগার মতো মেয়ে কোথায়। সব কথাই একটু বাংলা মেশানো ছিল। মুর্শিদ মনে করতে পারে সব। শান্তি কমিটির মানুষেরা তখন নানাভাবে লুট-তরাজ চালিয়ে যাচ্ছে। এবং ওরা ভেট দিতে চায় কেয়াকে। কারণ এ-সব লুট-তরাজ হত্যা নারীধর্ষণ সব কিছুতে মেজর সাব হাতে না থাকলে চলে না। তার এক লাইন লেখাতে খোদার খোদগারি চলে যায় যখন তখন সামান্য মেয়ে কেয়া।

মুর্শিদ হুকুম তালিম করার মানুষ। সে স্যালুট করে দাঁড়ালে, কি বিনীত কথা, যেন মেজর সাব মেয়েমানুষ বলে দুনিয়াতে কিছু আছে জানেন না। কেয়াকে একটু দেখা, গল্প করা, কেয়াকে নিয়ে অবসর

সময় সামান্য ঘুরে বেড়ানো, বিবি দেশে চলে গেছে, একা দিন কাটে না, কেয়া থাকলে বিকেলটা এত একঘেয়েমি লাগবে না।

এবং তারপরই যা হয়ে থাকে, নানাভাবে দুনিয়ার মুল্লুকি চাল চালায় মেজর। দিন যত যায়, তত সে কেমন অমানুষ হয়ে যেতে থাকে। ঘাটিতে যত খবর আসতে থাকল, তত এমন একজন ভাল মানুষ অমানুষ হয়ে যেতে থাকল। তত মঞ্জুর ওপর অত্যাচার বাড়তে থাকল। মুখে গ্লাস ছুড়ে মারল মঞ্জু। বোধ হয় মেজর সাব আর মঞ্জুর শরীরে জোনাকি পোকা জ্বলে ওঠার সময় দিত না। তার আগেই পাখা ছিঁড়ে দিত।

আর এ-ভাবে, সেটা শেষদিনই হবে, কে যেন এসে মুর্শিদকে খবর দিয়েছিল, মেজর মঞ্জুকে চুল ধরে টেনে নিয়ে যাচ্ছে।

—কোন দিকে!

—ওদিকটাতে।

ও দিকটা মানে, ঘাঁটির পেছন দিক। আসলে ঘাঁটিটা ছিল একটা প্রকাণ্ড আমবাগানের ভেতর। সবটা জুড়ে ঘাঁটি, পেছনটাতে শুধু আমের গাছ, জলপাইর গাছ, নানা রকম লতাপাতা, ঝোপ জঙ্গল, এবং হেঁটে গেলে আবার বেশ নিরিবিলি গাছের ছায়ায় অনেক দূর যাওয়া যায়। মুর্শিদ ছুটে বের হয়ে গেল তাবু থেকে। সে ওদের আনতে বারণ করে এল। মেজর সাবের এ-সব ব্যাপারে দেখাশোনার ভার তার। কারণ সমস্ত ঘাঁটিতে বিকেল থেকেই থমথমে ভাব। কেবল ট্রান্সমিটারে কি খবর আসবে সেই আশায় বসে রয়েছে সবাই। জেনারেল নিয়াজি ওদের রাতে বেতার ভাষণ দেবেন, এবং বেতার ভাষণের পরে সে শুনেছিল, ওদিকটায় মঞ্জুকে মেজর সাব টেনে নিয়ে যাচ্ছে।

ওদিকটায় কেউ যেতে পারে না। সে আর মেজর সাবের খাস-আর্দালি কেবল যেতে পারে। খাস আর্দালি ভয়ে জবুথবু হয়ে বসে রয়েছে। কিন্তু এই ঘাঁটিতে এমন সুন্দর একটি যুবতী মেয়েকে মেরে ফেলা হবে ভাবা যায় না।

তারপর বনের ভেতর মুর্শিদ জানে, সে আর মেজর, মঞ্জু একটা ভীতু খরগোসের মতো মাঝখানে। মেজর জানে না, ছায়া ছায়া জ্যোৎস্নার পাশাপাশি আর একজন মানুষ হাঁটছে। মঞ্জু পাশে হেঁটে যাচ্ছে, মাঝে মাঝে গাছের কাণ্ডে বাধা পাচ্ছে। মুর্শিদ ও-পাশে। মঞ্জুর বরাবর মেজর সাব। ওর হাতে ছোট ম্যাচ-বাকসের মতো রিভলবার। ওটা সে লাইটারের মতো আগুন জ্বালাবার ভঙ্গীতে মঞ্জুর সামনে ধরে রেখেছে। 'আর ইংরেজিতে অজস্র কথা। যেন সে এইমাত্র ট্রেনসমিটার খবর পেয়েছে কিছু। অথবা টেলি কমিউনিকেশানে সে জেনে ফেলেছে সব। যেমন বীর যোদ্ধা, পরাজয়ের আগে ভাল ভাবে স্নান করে নেয়, ভাল পোশাক পরে নেয়, তারপর অনুগামীদের কাছে পরাজয়ের সরকারী স্বীকৃতি দেয় তেমনি সে, শুনেছি, মঞ্জুকে ফের নিয়ে এসেছে, সামনে বসে গ্লাসের পর গ্লাস ঢেলেছে, কারণ বোঝাই যায় মঞ্জুর শরীরে কোন পোশাক নেই. সব কাজ শেষে, যা সে সঙ্গে নিয়ে যেতে পারবে না, অর্থাৎ সে যেন বলতে চাইছে মঞ্জুকে, দুনিয়াতে অন্য কোন মানুষ তোমার ফের সতীত্ব নষ্ট করবে, আমি চাই না। পুরুষেরা মেয়েদের সতীত্ব নষ্ট করতে ভাল-বাসে। আমরা কাল এখান থেকে চলে যাব। আমাদের আত্মসমর্পণ করতে বলা হয়েছে। ওরা তোমাকে ডার্লিঙ আমার সঙ্গে যেতে দেবে না। এবং এই বলে যখন হাউমাউ করে কাঁদছিল, যেন কি কষ্ট মেজর সাবের তখন এতটা ভণ্ডামী কিছুতেই কেন যে মুর্শিদ সহ্য করতে পারল না। সে একেবারে মুখের সেই কান্নার গহ্বরে এক বিন্দু শক্ত লোহার যবনিকা পুঁতে দিল। সে আর মানুষটাকে ফিরে যেতে দেয় নি। বলার সুযোগ দেয়নি, মাই ফ্রেণ্ডস্ উই আর ডিফিটেড্।

তবে সে এখন মনে করতে পারে না, সেটা মুখে, গলায় না বুকে। কোথায় যে সে যবনিকা পুঁতে দিয়েছিল মনে করতে পারে না। তবে এতটুকু তার মনে আছে, হাউ মাউ করে কাঁদলে মুখের হাঁ মাঝে মাঝে ভীষণ বড় হয়ে যায়, সে তার ঠিক ভেতরে যবনিকা ফেলে দিতে চেয়েছিল।

আর এখন মনে হচ্ছে, আসলে সে যবনিকা মেজরের না হয়ে মঞ্জুর হওয়া উচিত ছিল। কারণ মঞ্জু জহর ব্রত না করে ওর কাছে খুব ছোট হয়ে গেছে। জীবনের জন্য মঞ্জুর ভীষণ মায়া! জীবন না লোভ, কোনটা, সে ঘাস ছিঁড়তে ছিঁড়তে ঠিক করতে পারছে না।

আর তখনই মনে হল কেউ ডাকছে। ওর নাম ধরে ডাকছে, যেমন বাপজান ডাকত, তেমনি।

সে উঠে দাঁড়াল। না কিছু দেখা যাচ্ছে না। সে ঝোপের ভেতর লুকিয়ে আছে। মাথায় সে শুকনো পাতা ডাল দিয়ে ক্যামোফ্লেজ করে বসে আছে। কে এখন টের পাবে, জাঁদরেল সেনাবাহিনীর মানুষ মুর্শিদ এখানে পালিয়ে রয়েছে। রাতে রাতে পালাবার চেষ্টা করবে। কার হিম্মত আছে ওকে ধরে।

আবার কে যেন ডাকছে। মঞ্জুর গলা, মর্জিনা ডাকলে এমনভাবে ডাকত। সে উঠে দাঁড়াল।

আর তখনই পেছনে খোচা। সে খোঁচা খেয়ে একেবারে হাঁ। যাদকে যখন তাড়াচ্ছিল এখন এই জঙ্গলের ভেতর কেয়া ঢুকে গেছে, ওর কি সাহস! সে বলল, এই নিগ্রো কি করছ এখানে!

মুর্শিদ গম্ভীর গলায় বলল, বসে আছি।

—আমি ঠিক ধরেছি, ও গেলে কাছারি বাড়ির দিকে যাবে।

—ঠিক বলেছ!

—ঠিক। মঞ্জুদি আমি সেই কখন থেকে খুঁজছি। বা'জী তোমাকে খুঁজছে। তুমি আস্ত একটা অমানুষ নিগ্রো।

—মুর্শিদ কোন কথা বলছে না। ওর এত বড় পরিকল্পনা এক-রত্তি একটা মেয়ে ভেঙে দিল।

—দেখ, ঝোপজঙ্গল নড়ছে। কোনো কুকুর বেড়াল কিনা দেখি। অঃ আল্লা একেবারে আস্ত নিগ্রো মানুষ। মঞ্জুদি সেই কখন থেকে না খেয়ে আছে।

—মঞ্জুকে আমি খেতে বারণ করেছি!

—তুমি বাড়িতে আছ, আত্মাণ, তাকে না খাইয়ে খায় কি করে।

তোমার জাতের মতো তো আমরা বেইমান না। অতিথি না খাইয়ে নিজে খেয়ে নেব।

মুর্শিদ হাসল। তোমার জাত বলতে কেয়া ওদের পাকিস্তানী বোঝাচ্ছে। সে বলল, তা ঠিক। চল। আপাতত আমার আর আলোচনা হল না। যা দেখছি, তোমাদের মর্জি বিলকুল ঠিক হবে।

—আমাদের মর্জি মানে!

মুর্শিদ জবাব দিল না। মঞ্জু দাঁড়িয়ে আছে উঁচু ঢিবিতে। মঞ্জুর দিকে তাকিয়ে মুর্শিদের গলায় কোন কথা জোগাল না। সত্যি মঞ্জু না খেয়ে আছে। এই বিকেলে ওর চোখ মুখ দেখলে তা বিশ্বাস করতে কোন কষ্ট হয় না।

সে কেয়াকে শুধু বলল, চল।

অজুর মনে হয়েছিল এ-বাড়িতে কোথাও একটা ভীষণ গণ্ডগোল ঘটে গেছে। সে যখন কেয়াকে নিয়ে ফিরে এসেছিল, তখন থেকেই কেমন ফিস্ ফিস্ গলায় কথাবার্তা। মঞ্জু একবার এমনও যেন বলেছিল, খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। কি খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না, একবার ইচ্ছে হল বলে, কিন্তু ওর সামনে মঞ্জু এত স্বাভাবিক যে, ওর কিছু হারিয়েছে কিছুতেই বিশ্বাস করা যায় না। সে যে রাতে কাউকে দেখেছিল, তা জিজ্ঞাসা করতে কেমন অস্বস্তি লাগছে।

এ-ভাবে সে ফিরে এসেই দেখেছিল মঞ্জু ভীষণ ব্যস্ত। কেয়াও কেমন উদ্বিগ্ন। সামনে পড়লেই চোখ মুখ স্বাভাবিক করে ফেলছে। আপনি অজুদা বসে আছেন কেন, স্নান করে ফেলুন। মঞ্জুদির রান্না শেষ। আপনাকে খাইয়ে, মঞ্জুদি ওর নিজের রান্না করবে।

অজুর তখন ভাল লাগছিল না। কি হারিয়েছে মঞ্জু! মঞ্জু জীবনে এমন কি পেয়েছে যা হারাতে পারে। একবার মনে হল, মঞ্জু সব হারিয়েছে। ওর শৈশব হারিয়েছে, ওর সাদা ঘোড়া হারিয়েছে, ওর চেনা জগতের সব মানুষ হারিয়েছে। আর এ-ভাবে তো সব

মানুষই সব কিছু হারায়। মঞ্জুর হারানো আলাদা ধরনের, যা কেউ হারায় না, কেবল মঞ্জুর মতো মেয়েরাই হারায়। সে ভেবে পেল না তেমন কি মঞ্জু হারিয়েছে যা ওর সামনে প্রকাশ করতে সংকোচ. অথবা দ্বিধা।

যাই হোক সে স্নান সেরে নিয়েছিল। মঞ্জু ওর জন্য বসে থাকবে এটা ঠিক না। ওকে না খাইয়ে মঞ্জু নিজের নিরামিষ ঘরে রান্না করতে যাবে না। অথচ মঞ্জু শাড়ি পরে নানা রঙের। ঠিক নানা রঙের না হলেও কুমারী মেয়েরা যেমন সাধারণ শাড়ি সায়া পরতে ভালবাসে, সেও তেমনি। সে যেন পোশাকে তার ভাগ্যের কথা লিখে রাখতে চায় না। অথচ আহারে এত বেশি নিয়মকানুন অজুর ভাল লাগল না।

ওর খাওয়া হলে সে আরও বেশি টের পেয়েছিল কিছু হয়েছে। এমন কি জব্বার কাকা ডিসপেনসারির দরজা বন্ধ করে দিয়েছিলেন। সব মানুষদের তিনি ঝেঁটিয়ে বিদায় করেছিলেন। আগামী কাল আসতে বলেছেন। ঘলে ঘাটে যে সব নৌকা লেগেছিল এক এক করে চলে গিয়েছিল। পোস্টাফিসের নীল ডাকবাকসে কেউ কেউ চিঠি ফেলতে এসেছিল, তারাও চলে গেল। একটা ভয়ঙ্কর দুপুর ওর জানালায় খা খা করতে থাকল। শুধু পোস্টাফিসের জানালা খোলা। সেখানে একটা মুখ, গালে সাদা দাড়ি, সে ঝপাঝপ খামে পোস্টকার্ডে বাংলাদেশের ছাপ মেরে চলেছে। এবং জানালায় একটা কাক বসেছিল. সেটা কা কা করে ডাকছিল।

তারপর মনে হয়েছিল, এ-বাড়িতে কেউ নেই। সে ডেকেছিল, কেয়া। কোন জবাব পায়নি। সে দরজা অতিক্রম করে সামনের ঘরটায় ঢুকে গিয়েছিল। সেখানে বড় বড় হরিণের মাথা, বাঘের ছাল, এবং পাখির হাড় দেয়ালে সেঁটে আছে। অবিনাশদা খুব জাঁকজমক-প্রিয় মানুষ ছিলেন, এ-ঘরে এলে সেটা টের পাওয়া যায়। এবং সব ঘরের দেয়ালে মৃত হরিণের ছবি। সে রাতে এ-সব ছবি দেখলে ভীষণ আঁৎকে ওঠে।

অজু তারপর দরজা পার হয়ে নীলুর ঘরে এসে বসেছিল। এখানে শুধু একজন মানুষ, ছোট্ট মানুষ, বিছানায় ক্রমে মিশে যাচ্ছে। কি সুন্দর চোখ! সাদা চাদরে সে শুয়ে পাশ ফিরতে পারে না, সব কিছু তাকে করিয়ে দিতে হয়। সে খুব দুর্বল। হাত নেড়ে কোনরকমে একটা দুটো কথা বলতে পারে। এমন সুন্দর ছেলেরা পৃথিবীতে মরে যায়, অথবা যাবে ভাবতে সে কেমন অসহায় বোধ করছিল তখন।

অজু দেখল, নীলু চোখ বুজে আছে। সে ঘুমিয়ে নেই অজু এটা বুঝতে পারছে। সে ডাকল, নীলু!

নীলু চোখ মেলে তাকাল।

—তোমার ভাল লাগছে?

—ভাল লাগছে।

—কোন কষ্ট হচ্ছে না তো?

—না।

—তুমি খেয়েছ?

—খেয়েছি। মা যাবার আগে খাইয়ে দিয়ে গেছেন।

—কোথায় গেছে ওরা?

—ওরা মুর্শিদ কাকাকে খুঁজতে গেছে।

—মুর্শিদ কাকা! সে কে!

—সে একজন আর্মি ডেজার্টার।

—কোন্ আর্মি?

—পাকিস্তানী আর্মি।

—সে এখানে কেন?

—মা তাকে থাকতে বলেছে।

—বলছ কি!

—হ্যাঁ, মুর্শিদ কাকা ভীষণ ভাল মানুষ। সে আমাকে সকালে কেবল তার ছেলেবেলাকার গল্প বলে।

—কিন্তু......বলে অজু পায়চারি করতে থাকল। এমন একটা সময়ে মঞ্জুর এই আগুন নিয়ে খেলা। তা ছাড়া সে বুঝতে পারল

না, আর্মি থেকে কি করে ডেজার্টার হয়। সব তো আত্মসমর্পণ করেছে। সে তা না করে পালিয়েছে। পালিয়ে এখানে এসে উঠেছে। অজু কেমন অবাক হয়ে গেল।

অজু বলল, নীলু, মুর্শিদ কাকাকে ওরা কোথায় খুঁজতে গেছে?

—জানি না।

অর্জুনের মনে হল, এত কথা ছেলেটার সঙ্গে বলা উচিত হচ্ছে না। একটা দুটো কথা বললেই সে হাঁপিয়ে ওঠে। এখন তো বিকেল। পাঁচিলের পাশে সেমনি বন্ধ। ঠাকুরঘরে তালা মেরে সে মানুষটাও চলে গেছে। এখন এত বড় বাড়িতে সে একা। সে ঠিক একা না, নীলু আছে। নীলুর জানালা খোলা। সেখানে কামিনী ফুলের গাছ। গাছে একটা হলুদ রঙের পাখি। অজুর মনে হল, এত বড় বাড়িতে কেউ একা থাকতে পারে না। এত বড় বাড়িতে একা থাকলে লোক পাগল হয়ে যায়। আসলে এত বড় গ্রামটাতে একটা লোক নেই, কেন যে এ গাঁয়ের সব বাড়িগুলো খাঁ খাঁ করছে, নতুন বসতি গড়ে ওঠেনি সে বুঝতে পারেনি। কারণ ওটা তো নিয়ম, জায়গা খালি পড়ে থাকে না, জমি খালি পড়ে থাকে না, ঠিক কেউ না কেউ আবাদ করতে চলে আসে।

নীলুকে এ-ভাবে একা রেখে সবার চলে যাওয়া অজুর ভাল লাগল না। সে ইচ্ছে করলে নিজের ঘরে বসে থাকতে পারত, কিন্তু এমন একটা খাঁ খাঁ বিকেল, অর্থাৎ সে দুপুর থেকে এই বিকেল পর্যন্ত এ ভাবে একা এখানে কাটিয়ে দিয়েছে, কেউ নেই, শুধু অর্জুন গাছের নিচে ঘোড়াটা ঘাস খাচ্ছে, শুধু জানালায় তাকিয়ে আছে নীলু, আর সে পায়চারি করছে। কেমন ভৌতিক অথবা রহস্যজনক, সে এ-গ্রামে ঢুকেই তার গন্ধ পেয়েছিল, কারণ সব মানুষেরা, মৃত অথবা জীবিত, যে যেখানে আছে, এ-গ্রামের দৃশ্যপট তাদের কাছে অলৌকিক মায়ার মতো ছড়িয়ে আছে। কেউ ভুলতে পারছে না, একটা গ্রাম, চারপাশে বর্ষাকালে শাপলা ফুল ফুটে থাকে, খালের জলে নানা রকমের মাছ ভেসে আছে, কত রকমের পাখি

উড়ে আসে, যায়, কচ্ছপেরা ভেসে থাকে জলে, লটকন গাছে কি যে মায়াবী ফল ফলে থাকে, আর মানুষেরা মায়াবী ভালবাসায়, এই গ্রামের ফুলে ফলে এখনও যেন বেঁচে থাকতে চায়। এই যে কেয়া, জব্বার কাকা, অজু অথবা ডাকঘর এবং মানুষজনের আসা-যাওয়া সব ভৌতিক। আসলে সে হয়ত কাল থেকেই এমন একটা রহস্যজনক আবহাওয়ায় পড়ে গেছে। কিন্তু সকালে কেয়া এবং সে, কেয়ার আর্ত চোখ, এ-সব মিথ্যা হয় কি করে!

এটা মনে হওয়া স্বাভাবিক। যখন খান সেনারা গ্রামের পর গ্রাম লুটতরাজ করেছে, পালিয়ে গিয়েছে, মেয়েদের নিয়ে বনবাসে চলে গেছে, এবং এমন একটা ছিনিমিনি ব্যাপার যখন হয়ে গেল তখন কিছু খালি ঘর-বাড়িতে ভৌতিক কিছু থাকবে না, সে কি করে হয়! আর সঙ্গে সঙ্গে ওর চোখের ওপর, নীলু এবং অর্জুন গাছের নিচে ঘোড়াটা পর্যন্ত রহস্যময় হয়ে উঠছে। সে ডাকল, নীলু তুমি ঘুমিয়ে আছ?

নীলু চোখ বুজেই বলল, না।

—আমি একটু বাইরে যাচ্ছি, তুমি ভয় পাবে না তো?

—না।

—এত বড় বাড়িতে, তুমি ভয় পাও না?

নীলু বলল, না।

—একা থাকতে কষ্ট হয় না?

নীলু বলল না।

অজুর মনে হল, নীলু এখন সে যা বলবে না বলে যাবে। সে কি করবে বুঝতে পারল না। একে একা ফেলে যাওয়া ঠিক না। কিন্তু একটা মায়াবী কিছু হয়ে গেলেই সে ভিতরে ভিতরে কেমন ঘাবড়ে যায়। হয়তো সে বাইরে থেকে ঘুরে এসে দেখবে নীলু পর্যন্ত নেই। আবার যখন সে ঘোড়াটি খুঁজতে যাবে, তখন দেখবে ঘোড়াটাও নেই।

এমন নিরিবিলি গাঁয়ে এসে এটা ওর হয়েছে। আর কলকাতা শহর, এবং শহরে বড় হতে থাকলে, মনেই হয় না, পৃথিবীর কোথাও

নির্জনতা বলে কিছু আছে। অজুর তাই হয়েছে। এত বেশি নির্জনতা যে, মাঝে মাঝে ওকে ভীষণ ভয় পাইয়ে দেয়। সে গত রাতের ঘটনা এখনও ঠিক বুঝে উঠতে পারছে না। সে স্পষ্ট শুনেছে ওর দরজায় কে কড়া নাড়ছে। সুতরাং অজুর মনে হল, নীলুকে ফেলে এখন আর কোথাও যাওয়া চলে না। ওকে দুটো একটা প্রশ্ন করে, সে বুঝতে পারবে, সে বেঁচে আছে, নীলু বেঁচে আছে, ঘোড়াটা বেঁচে আছে, এবং ঠিক সময় হলে কেয়া মণ্ড, মুর্শিদকে নিয়ে ফিরে আসবে।

অজু আবার বলল, রাতে ওকে দেখলাম মনে হল।

—কাকা পালিয়ে থাকে। তারপরই নীলু এটা বলে ঠিক করেছে কিনা বুঝতে পারে না। সে বলল, আমি জানি না।

অজু আর ভৌতিক কিছু ভাবতে পারে না। নীলুর চোখ মুখ ভয়ার্ত দেখাচ্ছে। সে বুঝল, নীলু কোন অনিষ্ট করে ফেলেছে এমন ভাবছে। সে বলল, আমি কাউকে বলব না।

—কাউকে না কিন্তু।

—কাউকে না।

—মাকেও না।

—মাকেও না।

—মা যদি জানে আমি বলেছি, তবে কষ্ট পাবে।

—মাকে কিছু বলব না নীলু।

আর তখনই ওর ইচ্ছা হল, মনজুরকে সেও খুঁজতে বের হয়। লোকটা কোথায় গেল। বাড়ি থেকে চলে যাবার কারণ কি। সে পালাবে কি ভাবে। সে যাবে কি করে। ওর যদি পয়সা না থাকে, সে এখন একা মানুষ, ডেজার্টার হওয়ার কি দরকার ছিল। আত্ম-সমর্পণ অপেক্ষা ডেজার্টার হওয়া ভাল, কিন্তু কোথায় যাবে। এবং ওর কেন জানি এ-ভাবে কোন শৈশবে ফিরে গেলে ঠিক সেই এক ডেজার্টার মানুষের মতো বাবার চোখ মুখ দেখতে পায়। দেশ ভাগের পরে ওর মনে হয়েছিল, মানুষেরা নিজের দেশ গাঁ

ছেড়ে এমনি চোখে মুখে হয়তো ভারতবর্ষের মাটিতে একটু আশ্রয়ের জন্য ঘুরছে। তখন তারাও সবাই ডেজার্টার ছিল।

অজু আপন মনে না হেসে পারল না। সে বুঝতে পারল, নীলু একা এ-ঘরে আর কোন কষ্ট পাবে না। ওর সব সহ্য হয়ে গেছে। অজু ইচ্ছামতো সামনের মাঠ পার হয়ে, এবং নানাবিধ ফুল ফলের গাছ পার হয়ে ঠিক অর্জুন গাছটার নিচে গিয়ে দাঁড়াতে পারে। সে সেখানে দাঁড়ালেই দেখতে পাবে, বিশ বাইশ বছর আগের মানুষেরা চারপাশে ওর ঘোরাফেরা করছে। ভুঁইয়া বাড়ি, ঘোষেদের বাড়ি, দত্ত পাড়া, পশ্চিম পাড়া এবং পালপাড়ার সব মানুষদের একটা মিছিল যাচ্ছে। ওদের মাথায় বাক্স পেটরা। ছোট ছোট শিশুরা হাঁটছে। হাতে ওদের কাঠের পুতুল। ওরা কোথায় যাচ্ছে, কেন যাচ্ছে, কেউ যেন জানে না। ধর্ম মানুষকে ভিটে মাটি থেকে উচ্ছেদ করেছে।

এবং এ-ভাবে জানে অজু, মানুষেরাই মানুষকে সোজা পথে হাঁটতে দেয় না। মানুষেরাই আবার পথ নতুন বানিয়েও দেয়। সেই যে মিছিল, অজু বুঝতে পারে মিছিলটা ঠিক বিশ বাইশ বছর আগে বললে ভুল হবে, যেন আরও আগে মানুষেরা সব কলকাতামুখী হতে ভালবাসত, অথচ সেই যে দেশভাগের হিড়িকে সবাই ডেজার্টার হল, তারা আর ঘরে ফিরল না।

তার ইচ্ছা এখন, মুর্শিদকে দেখা হলেই বলবে, মিঞা সাহেব আপনি এবারে নতুন ডেজার্টার। আমরা বিশ বাইশ সাল আগের তা কেমন আছেন। ডেজার্টার হলে কেমন লাগে। বাংলা বুঝতে পারেন।' আপনি তো পাকিস্তানী। উর্দু ভাষা আপনার মাতৃভাষা। আপনি পাঞ্জাবী ননতো। আপনার গাঁয়ের পাশে যদি নদী থাকে, তার কি নাম বলবেন তো। এত ভাগাভাগি কেন মিঞা সাব! ভাগের শেষ আছে। যত ভাগ করবেন শরীর তত পঙ্গু হয়ে যাবে না?

অথচ দেখুন•স্বভাব মানুষের এই, নিজের জন্য, নিজের পরিবারের জন্য একসময় সে তার সঠিক হিসাব বুঝে নেয়। এত

হত্যা, রাহাজানি ধর্ষণ ঘটিয়ে শেষপর্যন্ত তা বন্ধ করতে পারলেন। হয় তো বলবেন বড় হিস্যার হাত না লাগালে দেখা যেত।

তারপরই অজুর মনে হল সে বোকার মতো বড় বড় কথা ভাবছে। সে রাজনীতি করে না, সে তলিয়ে ভাবে না। এমন একটা জায়গার জন্য তার তেমন মায়াও নেই, কেবল মাঝে মাঝে যখন একটা সাদা ঘোড়া, তার ওপরে কোন বালিকার ছবি মনে হয় সে ভাবে ওটা একটা স্বপ্নের দেশ, সেখানে সে আর যেতে পারবে না, সেখানে কেউ ফিরে যেতে পারে না। এবং ওটা আছে বলেই মানুষ বেঁচে থাকতে ভালবাসে।

অজু এদিকটা ঘুরে বেড়াল। অর্জুন গাছটা পার হলে খালের ধারে কিছু বনজঙ্গল, ঘেঁটু ফুল তার পাশে মঞ্জুর মায়ের শ্মশান। অবিনাশদাকে পাশে রাখা হয়েছে, ওদিকটায় অজুদের, নিজের জমি, সেখানে ছোট ঠাকুরদাকে পোড়ানো হয়েছিল। অজুর পায়ে একটা কাটা দাগ আছে, ওর মনে আছে ছোট ঠাকুরদার বড় ছেলে, রাঙ্গা কাকা বাড়ি এসে জায়গাটা ওদের সাফ করতে বলেছিলেন। উৎসাহে ভরা ক'ভাই মিলে জমি পরিষ্কার করার সময় সে কোদালে অনেকটা পা কেটেছিল। হাঁটতে হাঁটতে ওর তাও মনে হল। এক এক করে কত ছবি ভেসে আসছে। বড়দা এখন হলদিয়াতে কাজ করে। ওর বৌ বাপের বাড়ি থাকে। বড়দা সংসার সংকুলান করতে পারেন না ঠিক ভাবে। বড়দার মতো নিরীহ মানুষকে নানা রকম বচসার সম্মুখীন হতে হয় সেজন্য। অথচ শৈশবে ওরা সবাই ভেবেছিল, ভীষণ সুখী মানুষ হবে বড়দা। ওর কোন দুঃখ থাকবে না। বড়দা সবার কথা সমানভাবে শুনত। সে কাউকে কোন দিন কটুকথা বলেনি। বড়দা এখন বড় দুঃখী মানুষ।

এবং মঞ্জুকে দেখলে এমন দুঃখী মনে হয়। অথচ সে সঠিক জানে না, কি হয়েছে, কেয়া কিছুটা বলেছে, সবটা বলেনি, চিঠি কেন দেয়, অথবা মুর্শিদের কথা এভাবে লুকিয়ে রেখেছে কেন,

সে তো ভেবেছিল সরাসরি জিজ্ঞাসা করবে, মুশিদ কে? কিন্তু নীলুর মুখ দেখে এখন আর সরাসরি সে কিছু বলতে পারে না। না বলা পর্যন্ত তাকে মুশি, সম্পর্কে চুপচাপ থাকতে হবে। সে ভিতরে ভিতরে ভীষণ অস্বস্তি বোধ করছে। মঞ্জুকে দেখে মনেই হয় না, সে তাকে চিঠি লিখে আনিয়েছে। যেন অজুর এমনি আসোন কথা, বেড়িয়ে যাবার কথা, দেশ স্বাধীন হল, একটু ঘুরে-ফিরে দেখে গেলে যেন মঞ্জুর অহংকার বাড়বে, ছাখো, কি ভাবে আবার সব ফিরিয়ে আনলাম। মঞ্জু তার স্বদেশের স্বাধীনতার অহংকার দেখাতে এনেছে যেন।

অজু ফিরে এসে দেখল, কেয়া আলনায় শাড়ি শায়া ভাঁজ করে রেখেছে। ওর ঘরে ফুলদানির ফুল পাল্টে দিয়েছে। পর্দা টেনে দিয়েছে। সন্ধ্যা হলে হয়তো ধূপকাঠি জ্বেলে দেবে। সে কেয়াকে এসে কিছু বলবে ভাবল, কিন্তু কেয়া তাকে উল্টো প্রশ্ন করে কেমন বোকা বানিয়ে দেবার চেষ্টা করছে, কোথায় যান, বলে যান না, কেন?

—কাকে বলে যাব?

—কেন আমাদের।

কেয়া কাজ করছিল বলে, এক জায়গায় সে চুপচাপ বসছিল না। অজু জানালার দাঁড়িয়ে আছে। ওকে দেখলে মনে হবে, সে সামনের দিকে তাকিয়ে আছে। ঘরের ভিতর কি হচ্ছে বুঝতে পারছে না। কেয়া যে কাজ করতে করতে ওকে দেখছে সে টের পাচ্ছে না। সে দেখছে, জব্বার কাকা ঘোড়াটা এনে আস্তাবলের পাশে বেঁধে রাখছে। যে কাজ করে, সে আজ আসেনি। কিছু হয়তো তার হয়েছে। জব্বার কাকা তারপর বারান্দায় বড় একটা হামান দিস্তা টেনে আনলেন। তিনি হরিতকি জায়ফল অথবা অন্য কিছু মূল, গাছের কাণ্ড সব মিলে ঠুং-ঠাং আওয়াজ তুললে যেন এ গাঁয়ের নির্জনতা আরও বেড়ে যায় অথবা মনে হয় জব্বার কাকা সেই প্রবাহমানতা ধরে রাখার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করছেন। এবং

হাস্বল দিস্তায় বড় বড় শব্দ তুলে যেন চারপাশে সেই শব্দ ছড়িয়ে দিয়ে সব গাছপালার ভিতর, কীটপতঙ্গের ভিতর, অবিনাশ কবিরাজ বেঁচে আছে, বেঁচে থাকে সব কিছুর ভিতর, এমনভাবে তিনি এসে এই শব্দের ভিতর অথবা কান্ধের ভিতর ডুবে যান। রোদ তখন ডাকবাক্সের মাথায়। ক্রমে লাল নীল রঙের ডাকঘরের মাথায়, এবং চার পাশে তখন বর্ষাকাল, মাছেরা জলে ঘোরাফেরা করছে। কেয়া তখন শুনল, অজু বলছে, তোমরা তো কেউ ছিলে না।

কেয়া বুঝতে পারল মানুষটা ঘুমায় নি। ওরা যখন যায় তখন যেন মনে হয়েছিল মানুষটা ঘুমিয়ে পড়েছে। সে বলল, ঘুম থেকে উঠে আমাদের দেখেন নি। ঠিক ভয় পেয়ে গেছিলেন।

—ভয় পাবারই তো কথা।

—মঞ্জুদি বলেছে ওর তো শহরে থেকে অভ্যাস। উঠে যখন দেখবে কেবল নীলু আর ঘোড়াটা আছে তখন ভয় পাবে।

—অজু বলল, তোমরা কোথায় গেছিলে ?

কেয়া খুব বুদ্ধিমতির মতো বলল, চন্দন বীচি তুলতে।

—চন্দন বীচি মানে ?

—গাছে চন্দন গোটা হয় না। বনে জঙ্গলে পড়ে থাকে। ওগুলো তুলে না আনলে, চুরি হয়ে যায়।

—কারা চুরি করতে আসে ?

—যারা ডাকবাক্সে চিঠি ফেলতে আসে।

—ওগুলো দিয়ে তোমরা কি কর ?

—কত কাজে আসে। বাঁজান কি যেন করে। ওর ওষুধে লাগে, চন্দন গোটা ভিজিয়ে রাখা হয়। বড় বড় জালায় জল পুরে পচিয়ে রাখা হয়।

—চন্দন গোটা এক সময় আমরাও চুরি করতাম কেয়া। তখন কিন্তু ওটা অবিনাশদার ওষুধে লাগত না। ওর ছাল, পাতা, ডাল শুনেছি কবিরাজী ওষুধে লাগে। মঞ্জু আমাদের সঙ্গে তখন ভীষণ ঝগড়া করত। কাউকে সে চন্দন গোটা চুরি করতে দিত না।

কেয়া বলতে পারছেনা, মুর্শিদকে খুঁজতে গিয়েছিল। গ্রিন সিগনাল না পেলে সে কিছুই বলতে পারে না। অজুদা এখন ভারত-বর্ষের মানুষ। সহসা এমন একটা ঝামেলার কথা বললে কিভাবে নেবে ওরা জানে না। তার জন্য সময় এবং সুযোগ দরকার। মঞ্জুদি এখনও ভাবছে, অজুদার দুর্বল জায়গাগুলো তেমনি আছে। ধরলে টের পাওয়া যাবে, মানুষটা মঞ্জুদির স্বপ্নে এখনও সাদা জ্যোৎস্নায় ঘুরে বেড়ায়। বোধ হয় মঞ্জুদি এ-সব ভেবেই দেরি করছেন। কিন্তু কেয়া যেন মানুষটাকে মঞ্জুদির চেয়ে বেশি চিনে ফেলেছে। সে দেখেছে, অজুদা লাজুক, ঝামেলায় থাকতে চান না। মানুষটা ঝামেলা ভেবেই হয়তো বিয়ে-থা করেনি। মঞ্জুদির নামে আছে ভাবতে ভাল লাগে, আসলে ভীতু মানুষদের যা হয়ে থাকে। সংসারের নামে কোরবানি হতে চায় না। সে তবু চালাকি করতে ছাড়ল না, বলল, অজুদা আপনাদেব সময় যা ছিল, তা এখনও থাকবে ভাবছেন কেন।

—তা ঠিক। তবে, খুব পাল্টায় না। যতই বয়স বাড়ে, সময় পার হয়, মনে হয় অনেক কিছু পাল্টে যায়, আসলে তুমি জান না কেয়া আমরা বেশি কিছু পাল্টাতে পারি না। ভিতরে ভিতরে অসুখটা থেকেই যায়।

—কেউ কেউতো আসে সব পাল্টে দিতে।

—কেউ কেউ আসে, তারা ভাবেন পাল্টে দিয়েছেন, মানুষও ভাবে, কিন্তু তুমিতো জান না কেয়া মানুষের অসুখটা আরও গভীরে। তা না হলে ভেবে দ্যাখোনা, আমাদের কথাই। আমরা এখানে ছিলাম, উৎখাত হলাম এখান থেকে, তবুও স্বপ্নটা থেকে গেল। উৎখাত বললাম এ-জন্য, ধর্ম আমাদের দু মহলাকেই বড় বেশি দূরে সরিয়ে রেখেছে।

—কৈ এখানে তো তা নেই।

—কেয়া তুমি ছেলেমানুষ। তুমি অত বুঝবে না। আবেগে আমরা অনেক কিছু করতে পারি। আবেগ থিতিয়ে গেলে, সব কেমন মরে যায়, তখন আবার মানুষের অসুখটা দেখা দেয়।

—অসুখটা থেকে নিরাময়ের কোন পথ নেই।

—আছে, তোমার মতো মানুষেরা যত বেশি নিরাময় হতে পারবে, তত বেশি আমরা কাছাকাছি আসতে পারব। মঞ্জুর মত মেয়ে আমরা কোথায় পাব বল। তারপরই মজু কেমন ছেলেমানুষের মত হা হা করে হেসে উঠল, খুব পাকা পাকা কথা হচ্ছে কেয়া। আমরা কেউ এসব বলার উপযুক্ত নই।

কেয়া বলল, মজুদা তোমাকে দেখলে আমার কিন্তু এমন বড় বড় কথাই মনে আসে।

অজু বলল, আমারও।

মঞ্জু তখন এসে বলল বড় বড় কথা বলতে সবারই ভাল লাগে। আমিও কম যাই না। এখানে আর একজনকে হাজির করছি, দেখবে সে আরও বেশি বড় বড় কথা বলবে। সে ডাকল, মুর্শিদ। মুর্শিদ এলে মঞ্জু বলল, ডেজার্টার। এরা তোমাদের ডেজার্টার করেছিল, আমরা এদের ডেজার্টার করেছি। বলেই হাসতে লাগল।

এ-ভাবেই মানুষকে কখনও কখনও ডেজার্টার হয়ে যেতে হয়। তার সব থাকে, সে চারপাশের মানুষ ভালোয় বেড়ে ওঠে। নানাভাবে সে নিজের ভিতর স্বর্গের সুষমা টের পায়। অথচ পাশে পাশে থাকে শয়তানেরা। ওরা মানুষের চারপাশের, বাঁচার সুষমা নষ্ট করে দিতে পারলে বাঁচে। মানুষ সময়ে তার থাবায় পড়ে গেলে অমানুষ হয়ে যায়।

রাতের বেলায় ওরা সবাই গোল হয়ে খেতে বসেছে। কেয়া, মুর্শিদ, জব্বার কাকা, অজু। মঞ্জু ওদের খেতে দিচ্ছে। রাত হয়ে গেছে অনেক। গল্প করতে করতে রাত করে ফেলেছে। এখন তাড়াতাড়ি খেয়ে শুয়ে পড়া। কাল অথবা পরশু মুর্শিদকে নিয়ে সবে পড়া হবে। খেতে বসে মুর্শিদ কোন কথাই বলতে পারছিল না। মঞ্জুকে দুপুর বেলায়ও ভেবেছে, সীমাহীন দুর্ভাবনায় মঞ্জু কাজ করে বেড়াচ্ছে। কিন্তু বিকেল থেকে সে দেখছে মেয়েটার

অবসর নেই। কি-ভাবে অন্তত এ-অঞ্চলটা পার করে দেওয়া যায়। কারণ মুশিদকে সব স্বাধীনতাকামী মানুষেরা চেনে। তাকে অনেকদিন থেকে সবাই খুঁজেছে।

সেরাতে যখন খবর এল, এবার বন্দুকের নল নিচু করে সামনে এগিয়ে যেতে হবে, তখন সবাই দেখেছিল, মেজর সাব, ফল-ইনে আসে নি। মেজর সাবকে পাওয়া যাচ্ছে না। ফল-ইনে সবাইকে জানানো হল কথাটা। কি-ভাবে, চার পাশে হিন্দুস্থানের সামরিক অফিসারেরা জাল পেতে রেখেছে, ঢাকার পতন অনিবার্য, তখন একটা মাস-কিলিঙের কি দরকার। এ-ভাবে নিরুপায় সৈনিকদের পড়ে পড়ে মার খাওয়ার চেয়ে সারেন্ডার দি আমরা। ফল-ইনে সবাই রাজি হয়ে গেল।

এবং ফল-ইনে দেখা গেল, দু জন অনুপস্থিত। একজন মেজর নিজে, অন্যজন মুশিদ। মেজরকে গভীর রাতে ঠিক পশ্চিমের আমবাগানের ভিতর পাওয়া গেল। সে বোধ হয় আত্মহত্যা করেছে। এটাই ভারতীয় সামরিক লোকেরা অনুমান করে নিল। আচ্ছা, তখন হয়তো তার একটি ছোট মেয়ে, কোন শহরের উপকণ্ঠে, বাংলো প্যাটার্নের লনে বসে রয়েছে মায়ের ঠিক পায়ের কাছে। আব্বা বন্দি হয়েছে। কোথায় কোন জায়গায় সে জানে না, মাকে হয়তো বিব্রত করে মারছে, কবে ফিরবে আব্বা। মানুষেরা কেউ শয়তান হয়ে জন্মায় না।

আসলে সেই যে মানুষেরা হাঁটে, হেঁটে যায়, চারপাশে থাকে সুষমা, সুষমার ভিতর মানুষ বড় হতে হতে দেখতে পায়, যেন একদল ক্ষুধার্ত নেকড়ের মতো শয়তানের প্রবল হাত চোখের ওপর ঝুলছে. সে তখন কেমন বেপরোয়া হয়ে যায়, এবং সকালের দিকে দেখা গেল অর্জুন গাছের ছায়ায় ছায়ায় হাজার হাজার সৈনিক, মার্চ করে চলে যাচ্ছে। ঢাকা চলো, এই ছিল ধ্বনি ওদের মুখে। এবং জানালায় তখন মঞ্জু। ভয় লেশহীন মুখ। জব্বার কাকা ফুল দিতে গেছে ওদের। মাঝখানে দেখেছে একটা মৃতের শকট।

সেখানেও ফুল দিয়ে গেছে কারা! মেজরের মৃত শকট টেনে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। অর্জুন গাছের ছায়ায় ওরা সেই মৃতের শকট রেখে অপেক্ষা করছিল। ওরা নাচ গান করছিল। আগুন জ্বেলে শীতের রাতে বন ফায়ারে মেতেছিল।

মঞ্জু জানালায় দাঁড়িয়ে দেখেছিল সব। ওরা কিছু কিছু সেখানে বিশ্রাম নিচ্ছে। আবার মার্চ পাস্টের দৃশ্য। গাড়িটা চলে যাচ্ছে। মঞ্জুর মনে হল, সেখানে একজন মানুষ শুয়ে আছে, তার আকাঙ্ক্ষা তীব্র। বিদ্বেষ তার শরীরে, ভারতবর্ষের নামে সে কেমন কঠিন। এ-ভাবে তার ভিতরের সহিষ্ণুতা ক্রমে লোপ পেল, সে বুঝতে পারে, ভিতরে আরও সব শয়তানের বাসা নানা জায়গায় তৈরি হয়ে যাচ্ছে। একজন ধার্মিক মানুষ, এ-ভাবে ক্রমে অধার্মিক হয়ে যায়। মঞ্জুর তখন দুঃখ বাড়ে। অবনীর কথা মনে হয়েছিল, অবনী ছিল ভীষণ একরোখা। সে জোরজার করে একদিন চন্দন গাছের ছায়ায় মঞ্জুকে ফেলে দিয়েছিল, উলঙ্গ করে ফেলেছিল, এবং এও এক ধরনের ধর্ষণ। সে এ ভাবে মঞ্জুকে হাত করেছিল। মঞ্জুরও ছিল একটা ভাল লাগা, লোভ, শরীরের ভিতর জ্বালা, আর সেই ভীতু মানুষটাকে অহরহ কুরে কুরে খাওয়ার চেয়ে, জ্বলে পুড়ে মরে যাওয়ার ভিতর অনেক বেশি সুখ ছিল। মঞ্জু এ-ভাবে অবনীর কাছে ধরা পড়ে গেলে, বাবা বাধ্য হয়ে ওদের বিয়ের পিঁড়িতে বসিয়ে দিয়েছিলেন।

নীলু বিয়ের আগের ছেলে। তাকে পৃথিবী থেকে সরানোর কি করুণ চেষ্টা অবনীর। অবনী মঞ্জুকে অসুখের ভিতর ফেলে দিয়ে সাদাসিদা মানুষের মতো ঘুরে বেড়াতো। বাবার কাছে অনুপানের মাত্রা ঠিক করতে গিয়ে বলত, মঞ্জুর শরীর ভাল না কবিরাজ মশাই।

এবং অবিনাশ কবিরাজ নিজের তৈরি ওষুধ অবনীকে দিয়ে খেতে দিয়েছিল। সামান্য ভ্রূণ হত্যার জন্য কি কঠিন প্রচেষ্টা! অবনী তেমনি সাদাসিদে মানুষের মতো অষুদের বড়ি উদখলে মেড়ে

বারান্দায় দাঁড়িয়ে থাকত। ডাকত, আমি অবনী। এদিকে এস মঞ্জু। তোমাকে কবিরাজ মশাই এ ওষুধ খেতে বলেছে।

মঞ্জুর যেন কিছু করণীয় ছিল না। সে চুপচাপ খেয়ে যেতে থাকল। কিন্তু সে বাড়ে দিনে দিনে। চন্দ্রকলার মতো বাড়ে। অবিনাশ কবিরাজ হয়তো জীবনে দ্বিতীয়বার সধেকুন দেখল, এবং বাধ্য হয়ে সে অবনীর হাত ধরে বলল, আমাকে রক্ষা কর বাবা। আমার জাত মান এখন সব তোমার হাতে।

কাজেই একটা বড় অসুখের ভিতর নীলু জন্মাল, আর একটা বড অসুখ নিয়ে। নীলু সেই থেকে বিছানায় শুয়ে আছে। অবনী কবিরাজ পৃথিবীর তাবৎ মনুষ্যকুলের শারীরিক নিরাময়ের অষুধ ওর ছেলের জন্য সংগ্রহ করে বেরিয়েছে। কিন্তু কিছুতেই নিরাময় করতে পারে নি।

অজু এবং সবাই খুব আস্তে আস্তে খাচ্ছে। যেন খাচ্ছে না। কি ভাবছে। ওরা তিনটি দেশের মানুষ, এই সেদিনও এক দেশের মানুষ ছিল। সবাই খেতে খেতে গূঢ় কিছু ভাবছে। এমন কি অজু দেখল, দরজায় হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে মঞ্জু। ওর ভারি চশমার ভিতর চোখ দুটো ভীষণ মস্করা করছে যেন সবাইকে।

এবং মঞ্জু ওদের দেখতে দেখতে এলোমেলো ভেসে চলেছে। মুর্শিদ এ-বাড়িতে কেন আসত, কেন অবনী কবিরাজের সঙ্গে তার এত ভাব ছিল, এও সে যেন মনে করতে পারে। সে চোখ দেখলে মানুষ চিনতে পারে। যেমন প্রথম দিনই মঞ্জু বুঝতে পেরেছিল, দূর দেশে থাকে তার বিবি, ঘর-বাড়ি, যা কিছু আপনার বলতে তার আছে, এখানে, সে তেমনি কিছু যেন আবিষ্কার করে ফেলেছে। মঞ্জুর সহজ আন্তরিক ব্যবহার তাকে ভীষণভাবে বিকেল হলেই টানত। মুর্শিদের চোখ দেখে টের পেয়েছিল মঞ্জু। রাতে মুর্শিদের চোখে ঘুম থাকে না। রাতে শুয়ে শুয়ে সে মঞ্জুর কথা ভাবে।

মঞ্জুরও যে এ-ভাবে একটা মায়া গড়ে উঠেছিল, এই মানুষটার জন্য। কারণ মনে হয়েছিল, অবনীর চেয়ে মানুষটা বেশি আন্তরিক। অবনীর মতো জোরজার করে, ছলেবলে কৌশলে কিছু সে কখনও করতে চায় নি। শুধু দুটো কথা বলতে পারলেই মুর্শিদ ভীষণ খুশি থাকত। এমনভাবে সে যেমন ছিল তার বিবির জন্য আন্তরিক, এত দূর দেশে তেমনি, এই মঞ্জুর জন্য এতদূরে এসে সে যেন এই পল্লী অঞ্চলের ভিতর মঞ্জুকে আশ্চর্যভাবে আবিষ্কার করে ফেলেছিল। মঞ্জু একসময় ঘোড়ায় চড়ে বেড়াত, মঞ্জু শহরের মানুষ, সে সবার সঙ্গে কথাবার্তায় ভীষণ স্বাভাবিক, এমন গ্রাম্য এবং পরিবেশে এটা আশাই করা যায় না। মুর্শিদ ফল-ইনে ইঞ্জিন। মেয়ে একটা সাইকেলে বের হয়ে যেত। ওকেই ডাকত, ফার্নিচার নাড়াটা দেখতো। ওকে সে হাত বাড়াত।

অবনী ও কখনও একটা উচু গান গাইত। মঠের ভিতর সে গান শুনতে খারাপ লাগত না। এগুলি অভাব আসবে ভিন্ন নয়। তবে, চা, কিছু খাবারও একজন নিলিমাবি মানুষের সঙ্গে অবনী বোধ হয় নিজের স্বর্গে যোগাযোগটা রক্ষা করতে চেয়েছে। অন্যসব গ্রামের মানুষদের বাইরে প্রমাণ করার জন্য সে যেন আলাদা মানুষ, ওর নিরাপত্তা বোধও কাজ করেছে এ ব্যাপারে।

সুতরাং মঞ্জু দেখতে পাচ্ছে, সবাই যখন যাচ্ছে, তখন মুর্শিদ যেতে পারছে না। মনে হয় বোধ হয় পারছেন না। অবনীর কাকা হয়ত ভাবছিলেন, দেশভাগের সময়ে যে-সব মানুষেরা ভয় ভীতিতে, অথবা ধর্মাচরণে ব্যাঘাত ঘটবে বলে চলে গেল তাদের কথা। কেয়া ভাবছে, দূরদেশ থেকে একদল লোক কি করে যে ধর্মের নামে এতদিন দেশ শাসন করে গেল, শোষণ করে গেল। মুর্শিদ ভাবছে, আসলে সে কোন দেশের মানুষ, এবং অজু ভাবছে এই ডেভিডের মানুষকে যে কি করে ঠিক জায়গায় সে পৌঁছে দেবে।

অথচ অজু কত কিছু ভেবে এসেছে। মঞ্জু হয়তো বলবে, আমার জন্য একটু জায়গা দ্যাখো। এখানে আর থাকা যাবে না। তুমি আমাকে এ-ভাবে আর কতদিন দূরে ফেলে রাখবে।

মঞ্জু তখন বলল, এই মুর্শিদ রুটি, মাংস।

আজ মাংস হয়েছে। খুব যত্ন নিয়ে রান্না করেছে মঞ্জু।

মুর্শিদ তাকাল। কিছু বলল না।

অজু বলল, দাও।

কেয়া বলল, আমাকে দাও

এবার কাকা বললেন, না গো মা, আমাকে দিস না।

মঞ্জু অজুকে আলাদা বাটিতে চার পাঁচটি হাড়-মাংস দিল। সে হাড়-মাংস খেতে ভালবাসে। কেয়ার নরম মাংস, কেয়ার খাবার কোন আনন্দ নেই, কোন সময় মঞ্জু ধমক দিলে, দ্যাখ খেতে পারবি কিনা, তোরতো কি লাগবে, কি না লাগবে কিছু বুঝে উঠতে পারিস না।

মঞ্জু মুর্শিদের কাছেও আলাদা মাংস রাখলে, মুর্শিদ বলল, না মঞ্জু। আমার এবেলা খেতে ইচ্ছা করছে না।

—কেন, ভয় করছে!

—ভয় করবে কেন?

—মঞ্জুকে তোমার বিশ্বাস হচ্ছে না!

—না না, তা তো বলিনি।

—তুমি তো সেই থেকে মুখ গোমড়া করে রয়েছ।

—চলে যাব, তোমাদের সঙ্গে আর তো আমার জীবনেও দেখা হবে না। কেন এমন যে হয়।

কেয়া বলল, মিঞা তোমাদের পাপে এমন হয়।

—এই কেয়া, কি হচ্ছে!

মুর্শিদ কেয়ার কথা কখনও ধরে না। অজু এটা বুঝতে পেরে মাংস চুষতে চুষতেই হাসল। —কেয়ার এত রাগ কেন!

—রাগ না অজুদা। দ্যাখো না, একেবারে জামাই। যেন কিছু খেতে জানে না।

মুর্শিদ কেয়ার দিকে তাকাল। মুর্শিদ, কেয়াকে দেখল, মঞ্জুকে দেখল, জব্বার কাকা, অজুকে দেখল। এই দেশে এমন সব মহান মানুষ এখনও বেঁচে আছে তখন ওর ভয় কি। সে বলল, কেয়া যদি কোনদিন এমন হয়, আমাদের তিনটে দেশের মানুষ, একটা বড় দেশের মানুষ হয়ে যায়, কোন পাপ তখন কারো মনে থাকবে না। আসলে সে বলতে পারে, বাইরে যতই ধর্মাধর্মের ঢাক বাজুক, অন্তরে কোথায় যেন একটা কাছাকাছি থাকার স্বপ্ন সবার ভিতরে আছে। নানা হুজুগ সব ভাসিয়ে নিয়ে যায়, কিন্তু মানুষের ভিতর আছে সত্যাসত্যের পালা। সে একদিন না একদিন নিজেকে ঠিক চিনতে পারবে। সে বলল, কেয়া খুব ইচ্ছা ছিল তোমাকে তোমার ভাবির কাছে নিয়ে যাব।

কেয়া অন্যদিন হলে কি বলত, ঠিক বলা যায় না, কিন্তু আজকে এই গুমোট ভাবটা যেন হালকা করা দরকার। সে অন্যদিন এত সমীহ করে চলে যে—এ-বয়সের কথা মঞ্জুদের সামনে বলবে, ভাবতেই পারে না।

সে বলল, ভাবিকে নিয়ে এলে না? এই যে, দ্যাখতো খুবসুরত মেয়ে [illegible] সাদি করবে এ নাহি!

জব্বার কাকা সেকেলে মানুষ। তিনি জানেন, এখনকার মেয়েরা আগের মত নয়। তারা লেখাপড়া শিখছে। কলেজে পড়ছে। কেয়ার মুখে পাকা কথা। এবং তিনি যেহেতু সেকেলে মানুষ, চুপচাপ থাকতে ভালবাসেন। মেয়েদের কথা তিনি শুনতে চান না। বিশেষ করে এই হিন্দু বাড়িতে থেকে, কেয়ার স্বভাবে কোনরকম একটা [illegible] এসে গেছে। যা শাসন করার মঞ্জু করে থাকে বলে, তিনি [illegible] থাকেন।

এমন কথায় অজু মুর্শিদ দুজনেই হেসে দিল।

সে বলল, কিরে কেয়া তোকে আর কটা ভাত দিই।

জব্বার কাকা বুঝতে পারলেন, মঞ্জু কেয়ার কথায় তেমন গুরুত্ব দিচ্ছে না। আর মনে হল, তিনি এখানে বসে থাকলে ওদের ঠিক জমবে না। তাড়াতাড়ি খেয়ে বললেন, আমি উঠছি। তোমরা সময় নিয়া খাও।

অজু বলল, কেয়া তো খাচ্ছেই না। ভাত নাড়ছে শুধু।

মুর্শিদ বলল, ওর মেহ-মান চলে যাবে।

কেয়া বলল, মুর্শিদ মিঞা খুব খারাপ হচ্ছে!

অজু বলল, কি, আপনার সব কটি তো তেমনি পড়ে থাকল।

মুর্শিদ বলল, অজুবাবু, আপনি ষষ্ঠিতলা চেনেন।

অজু খুব অবাক হয়ে গেল। পৃথিবীর এত জায়গা থাকতে ষষ্ঠিতলা! সে বলল, না।

— ষষ্ঠিতলা চেনেন না!

অজুর মনে হল, সে খুব অজ্ঞতার পরিচয় দিচ্ছে বুঝি! সে বুঝতে পারছে না, যে-ভাবে তাকিয়ে আছে মুর্শিদ, তাতে মনে হয়, এত অজ্ঞ মানুষ দুনিয়াতে থাকতে আছে! ষষ্ঠিতলা চেনে না। সে বলল, না সাহেব, চিনি না।

—আপনি না বিশ-বাইশ বছরের ওপর কলকাতায় আছেন?

—তা আছি।

—তবে ষষ্ঠিতলা চিনবেন না কেন?

অজু কি বলবে ভেবে পেল না।

মুর্শিদ বলল, ষষ্ঠিতলা, চণ্ডিতলা, বাগমারি ওদিকটায় কখনও যাননি।

অজু বলল, বাগমারি যাইনি। তবে, এবার নকশাল আন্দোলনের সময় ওখানে অনেক ঘটনা ঘটেছে।

—আপনাকে আমি নিয়ে যাব।

অজুর মনে হল সে যেন ষষ্ঠিতলা, চণ্ডিতলা, খাল পোল চেনে! চোয়াল্লিশ নম্বর বাসে সে একবার লেক টাউনে যেতে এ-সব দেখেছে। কিন্তু এমনভাবে বলা যেন, পৃথিবীর সবচেয়ে দামী

এবং নামী জায়গা ষষ্ঠিতলা। তা না জানলে, পৃথিবীর আর কিছু জানা যায় না।

মুর্শিদ বলল, রহমান মিঞার কাঠের গোলায় গেছেন কখনও।

অজু বলল, না।

—ওখানে রহমান মিঞার কাঠের গোলাতে আমার বাবা প্রথম কাজ করত।—আচ্ছা। অজুবাবু, আপনি এতদিন থাকলেন কলকাতায়, বলতে পারেন, উল্টোডাঙ্গার ওদিকটায়, এই খালের ধারে, দাসপাড়া গেছেন।

—না।

—কিছু চেনেন না।

—আমি বালিগঞ্জে থাকি। ডালহৌসি পাড়ায় অফিস। আমার পৃথিবী বলতে ঐটুকু। বলেই সে যেন হেরে যাচ্ছে, এবং এ-ভাবে ঠিক হেরে গেলে যখন সম্ভ্রম থাকে না, সে বলল, সাহেব এখানে কতদিন।

—তা অনেক দিন।

—সাহেব, গোপেব-বাগের ওদিকে কি আছে বলুন।

—দাঁড়কান্দা।

—তারপর?

—তারপর দামোদরদি?

—তারপর?

—তারপর জানি না।

—তারপর বৈদ্যের বাজার।

—হ্যাঁ, ভুলে গেছি।

—তারপর?

—জানি না।

—তারপর উদ্ধবগঞ্জ।

—তা হবে।

—আস্তানা সাবের দরগা জানেন?

—না।

—তবে কি জানেন। এটা তো আপনার দেশ ছিল, আপনার দেশ অথচ কিছু জানেন না!

মুর্শিদ বলল, জী, আপনি জানেন?

—হ্যাঁ, আপনার চেয়ে আমি ভাল জানি।

কেয়া ফুটকরি কাটল, মুর্শিদ মিঞা তোমার দেশ কোনটা!

—আমার দেশ পাকিস্তান।

—সেখানে তুমি কিন্তু বাঙ্গালী।

—না।

—তুমি উর্দু ভাষা জান বলে, পাঞ্জাবী!

—পাঞ্জাবীদের আলাদা ভাষা। উর্দু আমাদের শিখতে হয়। উর্দু আসলে তামাম হিন্দুস্তানের বনেদি ভাষা।

—সে জানি! তোমাকে আর এটা শেখাতে হবে না। তবে ঝগড়াটা কি নিয়ে মিঞা?

অজু দেখল, ঝগড়া করবে কেয়া। মঞ্জু ওদিকে কি করছে। ওদের খাওয়া শেষ অথচ কথা শেষ হচ্ছে না বলে কেউ উঠছে না। মঞ্জু হয়তো স্নান করতে চলে গেছে। অজু বুঝতে পারল, মঞ্জু এখন বার বার স্নান করছে। একটা অসুখে না পড়ে যায়। মঞ্জুর এটা বাড়াবাড়ি, এমনও মনে হয়েছে। শহরের শিক্ষা এবং শহরে বসবাস ছিল বলে মঞ্জুর পক্ষে আধুনিক হওয়া আদৌ কঠিন না, জব্বার কাকা, কেয়াকে নিজের পরিবারে আপন করে নেয়া কঠিন নয়, কিন্তু এই বার বার স্নান, এবং নিরামিষ আহার, কোথায় যেন এক বিপরীত চরিত্রের ভিতর নিয়ে যায় মঞ্জুকে। অজুর এটা ভাল লাগে না। এ-বয়সে মঞ্জুর এতটা বুড়ো বুড়ো ভাব ভাল লাগে না। সে বলল, এই কেয়া তোমরা আবার ঝগড়া আরম্ভ করলে!

কেয়া চুপ করে গেল তখন। অজু বলল, সাহেব আপনি এত সুন্দর বাংলা জানেন কি করে?

—জী, আমার বাড়ি ষষ্ঠিতলা। কলকাতায় আমার ছেলেবেলা কেটেছে।

—ষষ্ঠিতলার মানুষ।

—জী হাঁ।

—আপনি তো বাঙ্গালী।

—জী, ঠিক বাঙ্গালী না। মা বাঙ্গালী, আব্বাজান উত্তর প্রদেশের মানুষ। তার কাছে দুনিয়ার সেরা জায়গা গঙ্গার পাড়ের একটা গ্রাম। আব্বাজান যদি গল্প করেন নাতি-নাতনিদের কাছে, তবে সে-গ্রামটার গল্প, আখের চাষের গল্প, কলকাতার গল্প। আর কিছু যেন তাঁর জানা নেই।

অজু চুপ করে থাকল। আমরা এই মানুষেরা এমন একটা উপমহাদেশের মানুষেরা কেমন একটা বিশৃঙ্খলার জালে জড়িয়ে গেছি। এর থেকে উদ্ধারের পথ যেন কারো জানা নেই। সে বলল, রাত অনেক হয়েছে। এবার উঠতে হয়। না হলে, মঞ্জু এসে ঠিক ধমক লাগাবে।

মুর্শিদ বলল, কাল সবেরে আবার দেখা হবে।

সবেরে কথাটা অজু বুঝতে পারল না।

কেয়া বলল, সকালে।

—হ্যাঁ, তা দেখা হবে।

—আপনার কাছে তখন কলকাতার গল্প শুনব। বলেই কেমন মুর্শিদ চোখ বুজে থাকল কিছুক্ষণ। যেন সে এমন একটা দেশে তখন চলে যায়, তার যা কিছু সম্বল, রাজা হবার মতো যা কিছু ছিল, সব সে সেখানে ফেলে এসেছে। সে সেখানে যে-ভাবে থেকেছে, একটা বড় রাস্তা, দু'পাশের দোকানপাট, ঈদের সময় চাঁদমালা বিক্রির কথা মনে হয়েছে। অথবা সেইসব দিনে যখন শরতের পাখিরা আকাশে উড়ত, বিশ্বকর্মা পূজোর দিনে, ঘুড়ি উড়ত হাজারে হাজারে, হাতে থাকত একটা লম্বা বাঁশের কঞ্চি, সে ছুটত, কঞ্চির ডগায় দুলত ডালপালা, একটা ঘুড়ি তার সুতো,

আর সে—তখন তার কাছে অন্য দুনিয়া বলে কিছু থাকত না। সে আর ষষ্ঠিতলা, ষষ্ঠিতলার মাঠ, গাছপালা, কাঠের গোলা, নতুন নতুন ইমারতের গন্ধে সে বুঝতে পারত না, দুনিয়াতে এর চেয়ে কোন সুন্দর সুদৃশ্য জায়গা থাকতে পারে। সে সেখানে গিয়ে দুদণ্ড থাকতে পারে।

মুর্শিদকে চোখ বুজে থাকতে দেখে কেয়া অজুর দিকে ঠোঁট টিপে হাসল। বলল, সব ওর ঢং। ওরতো সব জানেন না। মঞ্জুদি যে কি পেয়েছে ওর ভেতর, বসেই সে দেখল মঞ্জুদি আসছে। শুনে ফেলল কি না কে জানে। কেয়া জিভ কেটে বসে পড়ল। যেন সে কিছু বলেনি। সব এঁটোকাঁটা তুলছে থালাতে। সে সব সাফ করছে। থালাবাসন একসঙ্গে সব তুলে নিয়ে যাচ্ছে। খুব ব্যস্ত। আজেবাজে কথা বলার সময় তার নেই.

মঞ্জু স্নান করে এসেছে। ওর চুল ভিজা, এই রাতে স্নান, চুল ভিজা, কেমন মনে হল ওরা মঞ্জুকে টর্চার করছে সবাই। অজু বলল, আমরা কাল সকালেই রওনা হব মঞ্জু! তুমি যে-ভাবে শরীরের উপর অত্যাচার করছ, নির্ঘাত অসুখে পড়বে।

মঞ্জু মুর্শিদের দিকে তাকিয়ে হাসল। এত বিষণ্ণ হাসি পৃথিবীতে কেউ কখনও হেসেছে তার জানা নেই। অজু আর একটা কথাও বলতে পারল না। সে বাইরে বের হয়ে দেখল, তেমনি জ্যোৎস্না গাছপালায় আর জ্যোৎস্নার ভেতর দিয়ে মনে হল, ঠিক সেই ফ্রক পরা মেয়েটি সাদা ঘোড়ায় চড়ে যাচ্ছে। সাদা জ্যোৎস্নায় ওর চুল নীল রঙের দেখাচ্ছে এবং এ-ভাবে কোন বনভূমির ভেতরে সাদা জ্যোৎস্নায় সাদা ফ্রক গায়ে সাদা ঘোড়ায় কেউ চড়ে গেলে বড় রহস্যময় এক পৃথিবী তৈরী হয়ে যায়। অজু চুপচাপ সেখানে শুধু দাঁড়িয়ে থাকতে ভালবাসে। সে ভাবতে পারে না, মঞ্জু এ-ভাবে কোন-দিন বিষণ্ণ হাসিতে ডুবে যেতে পারে। কেমন কথা সরে না। মঞ্জুর বোধ হয় চিৎকার করে

কাঁদার দরকার। না কাঁদলে, মঞ্জু চিরদিন এভাবে, এই গাছপালার ভেতর বোবা হয়ে বেঁচে থাকবে। সে মঞ্জুকে শুনিয়ে বলল, কেয়া আমার জন্য কিন্তু জল ঘরে রেখ।

মঞ্জু বলল, কেয়া তুই মুর্শিদের মশারি ফেলে দিয়ে আয়। জল রেখে আয়। তারপর শুয়ে পড়। অজুর ঘরে শোবার আগে আমি জল রেখে দেব।

দেয়ালের দু' পাশে সাদা দুটো ফ্লুরোসেন্ট আলো। জানালা খোলা। বারান্দা পার হলে উঠোন। মসৃণ ঘাস উঠোনে। সেখানে জ্যোৎস্না খেলা করে বেড়াচ্ছে। তারপর সব নানা বর্ণের ফুল এবং ফুলের বাগান। পরে মাঠ, ডান দিকে বড় অর্জুন গাছের ছায়া, আরও পশ্চিমে সব মাঠ, ঠিক মাঠ বলা যায় না, সব ছাড়া বাড়ি। যেন প্রথম দেখলে মনে হবে, মহামারীতে গ্রামের মানুষ জন কেউ বেঁচে নেই, এবং এ-ভাবে রাত গভীর হলে কেমন ছম্‌ছম্‌ একটা ভাব। বোধ হয় আজ মঞ্জু ঘরে দুটো বাতি জ্বালিয়ে দিয়েছে এ-জন্য। অজু অথবা অজুকা, যখন যা খুশি ডাকার স্বভাব. সে অজু যাতে ভয় না পায়, নানা ভাবে তার চেষ্টা করেছে। ঘরের ফ্যান এখন বন্ধ। টেবিলে দামি ফুলদানি, নকসী কাঁথার মাঠের মতো টেবিলের ঢাকনা। বাতিদানে ভিন্ন ভিন্ন কারুকাজ আর সাদা চাদর, বড় খাট, খুব বড়, দুজন অনায়াসে শোওয়া যায়। মনে হয় ওর অনুপস্থিতে এ ঘরের অনেক কিছু পাল্টে গেছে, এবং ঘরে ঢুকেই মনে হল এক আশ্চর্য সৌরভ। সে দেখল, এক কোণে একটা টিপয়। সেখানে বাগানের সবচেয়ে বড় বড় গোলাপ কেটে আনা হয়েছে। এবং মনে হয় এটা মঞ্জু কিছুক্ষণ আগে করেছে। কাছে গেলে সে বুঝতে পারল গোলাপের পাপড়িতে কুয়াশার জল এখনও লেগে আছে।

এ-ভাবে এ ঘরের মসৃণ দেয়াল, নানা বর্ণের পাথরের মেঝে, দেয়ালে সব বর্ণাঢ্য ছবি এবং বাতিদানে আশ্চর্য ফুল ফল আঁকা

বিদেশী কাঁচ, যা দুর্লভ মনে হয় খুব, মনে হয় খুব অহমিকা নিয়ে যারা বাঁচে তাদের জন্য এমন ভাবে ঘর সাজানো দরকার, কিন্তু অজু সরল সহজ মানুষ, বড় আশা নেই, বড় আকাঙ্ক্ষা নেই, কেবল কোন রকমে বাবা-মা এবং ভাইবোনদের বড় করে তুলতে পারলে জীবনের কাজ সারা এমন যার ধারণা, তার কি হবে এত প্রাচুর্য নিয়ে। অজুর মনে হল, কিছুতেই তার ঘুম আসবে না, এবং মঞ্জু বুঝি চায়, অজু এভাবে সারা রাত না ঘুমিয়ে থাকুক। মঞ্জুর এই বাড়াবাড়ি ওর একেবারে পছন্দ হল না। মঞ্জুর ঘরের পর যে ঘরটা, সেখানে ঢুকলেই মনে হয় দেয়াল থেকে সব মৃত বাঘ হরিণের মাথা সজীব হয়ে ছুটে আসছে এবং এভাবে এক অস্বস্তি, সে সেখানে ঢুকে ডাকল, মঞ্জু।

সে কোন সাড়া পেল না।

সে আবার ডাকল, মঞ্জু।

এবার কেয়া বলল, মঞ্জুদি খাচ্ছে।

অজুর সংকোচ হল সামনের ঘরটায় ঢুকে যেতে। এ ঘরে থাকে নীলু। পাশের খাটে কেয়া। কেয়া যা কুঁড়ে মেয়ে সে হয়তো চুপচাপ শুয়ে পড়েছে। সে যে ভাবে জীবন কাটায় তাতে করে, কোন অনাত্মীয় মেয়ের ঘরে, বিশেষ করে এই রাত গভীরে ঢুকে যেতে পারে না। সে বাইরে দাঁড়িয়েই বলল, কি করছ?

—কিছু না। তারপর কেয়া দরজার কাছে এসে বলল, আসুন না।

সে বলল, না, যাব না। ঘুমোও। দশটা কখন বেজে গেছে।

—তাতে কি হয়েছে। এটা আবার রাত নাকি! আমরা কত দিন সারা রাত জেগে রয়েছি।

কত সহজ ভাবে কথা বলে মেয়েটা! ওর অর্ধেকটা দেখা যাচ্ছে। অর্ধেকটা দেখা যাচ্ছে না। চৌকাঠে সে সামান্য হেলান দিয়ে কথা বলছে। এবং কথা বলতে বলতে সে জানে না, চৌকাঠ একটু একটু দোলাচ্ছে। সে লতাপাতা আঁকা শাড়ি পরেছে।

অজু বলল, তুমি জাগতে পার, কিন্তু আমি তো পারি না। রাতে ঘুম না হলে কাল দেখবে, চোখ মুখ আমার বসে গেছে। মঞ্জু যে কি! অত বড় খাটে আমার শোবার অভ্যাস নেই। আর ঘরটাকে কি করেছে। রাতে এ ভাবে কেউ ফুল কেটে আনে। বাগান থেকে রাতে ফুল তুলতে নেই। পাপ। মঞ্জু কি জানে না এসব

—ফুল মঞ্জুদি আনেনি। আমি এনেছি। আমাদের ধর্মে এসব নেই। ফুল তোলার ব্যাপারে কোন পাপের কথা নেই। ফুল এবং বিলাসিতা আমাদের গুনাহ, বলতে পারেন পাপ। যদি হয় সেটা আমাদের হবে। আমি কিছু জানি না।

অজু অবাক হয়ে গেল। কেন এতটুকু সংকোচ নেই বলতে, আমি এনেছি। বিশ-বাইশ বছর আগে কোন মুসলিম পরিবারে এদেশে একথা বোধ হয় ভাবতে পারত না। এটা বোধ হয় হয়েছে, ওরা জেনেছিল, ওরা স্বাধীন, অর্থনৈতিক স্বাধীনতা এদের হাতে। হিন্দু সাম্রাজ্যবাদ নিপাত গেছে। এবং এভাবে অজু যেন বুঝতে পারে এক নতুন জেনরেশন তৈরি হয়েছে এ দেশে। প্রায় হিন্দু কলেজের সময় অথবা যেন ডিরোজিও হেঁটে যাচ্ছে। সেও একটা সাদা ঘোড়ার সন্ধানে ছিল বোধ হয়। অজু বলল, এমন ভাবে ঘরে গোলাপ ফুটে থাকলে কেউ কখনও ঘুমাতে পারে কেয়া! প্লিজ তুমি ওগুলো নিয়ে এস।

কেয়া বলল, না।

তবে আমি মঞ্জুকে বলতে বাধ্য হব, তুমি এমন করছ!

—বলুন। ভয় পাই না।

—কেয়া!

কেয়া বলল, আপনি কাপুরুষ মশাই। বলে মুখের ওপর দরজা বন্ধ করে দিল।

—এই কেয়া, শোনো! দরজা বন্ধ করলে কেন।

দরজা আবার খুলে গেল। কিন্তু কেয়া নেই। বোধ হয়

পাল্লার আড়ালে ও লুকিয়ে আছে। সে ঢুকে গেল। না, নেই। কেয়া ঘরেই নেই। নীলুর পাশ দিয়ে অন্য ঘরে ঢুকে যাবার দরজা। সে দরজা দিয়ে অজু কখনও পাশের ঘরে ঢোকেনি। এবং ঘরটা অন্ধকার। এ-ঘরে থেকে সামান্য আলো ও-ঘরে গিয়ে পড়েছে। দরজা দিয়ে যতটা আলো ঢুকতে পারে, সে-আলোতে দেখল অজু কেয়া ও-পাশের দেয়াল ঘেঁসে দাঁড়িয়ে আছে। ওর পায়ের কাছে আলো। শাড়ির সামান্য লতাপাতা দেখা যাচ্ছে। এবং কি আশ্চর্য এই পা দুটো ওর কাছে লক্ষ্মী প্রতিমার মতো মনে হচ্ছে। সহসা আলোতে ঢুকে অজু পা এবং শাড়ি, সামান্য অংশ আবিষ্কার করে কেমন দাঁড়িয়ে গেল। এক পা নড়তে পারল না। নীলু পাশ ফিরে শুয়ে আছে। একটা সাদা চাদরে ঢাকা।

অজু খাটের একপাশে, ঘরে খাট, তারপর দরজা, তারপর আলো ও ঘরে, এবং শেষ দেয়ালে কেয়া আলো ছায়ায় দাঁড়িয়ে ওর শরীরে কেমন মায়া জড়িয়ে দিচ্ছে। সে বলল, কেয়া তুমি ও-ভাবে প্লিজ দাঁড়িয়ে থাকবে না। আমার ভয় করে।

কেয়া ঠিক তেমনি দাঁড়িয়ে আছে। ছেলেবেলাকার লুকচুরি খেলার মতো। কেয়া কি চোখ বুজে দাঁড়িয়ে আছে, কেয়া কি বুঝতে পারছে না, সে টের পেয়ে গেছে, সে কেয়াকে দেখতে পাচ্ছে, কেয়ার শাড়িটা আলোতে সে দেখতে পাচ্ছে, দেখতে দেখতে কি করে যে মায়া বেড়ে যায়। এই মেয়ে মনে হয় তখন বড় শ্রীময়ী, মনে হয় লক্ষ্মী প্রতিমার মতো, যাবতীয় সব সৌন্দর্য এবং লাবণ্য শরীরে জড়িয়ে ছড়িয়ে বেঁচে আছে। ওর রূপ আছে, রূপ থাকলে অহংকার থাকে, কিন্তু রূপ লাবণ্য দুই আছে, বড় সুষমামণ্ডিত, অথবা মহীয়সী ভাবতে ভাল লাগে। তখন কাপুরুষ অথবা যা কিছু কেয়া বলতে পারে। মুহূর্তে মেয়েটা বড় বেশি কাছে এসে গেছে। একেবারে নিজের মতো, আপন জন, ভয় ভীতি তার কিছু নেই। সে এখন যা কিছু করে বসতে পারে। অজু বলল, কেয়া এ-ভাবে দাঁড়িয়ে থাকলে সত্যি বলছি ভয় পাব, তুমি এস। ফুল আমি আর

তোমাকে আনতে বলব না। দেখি না ঘরে ফুল থাকলে ঘুমোতে পারি কিনা।, সব কিছু অভ্যাস থাকা ভাল।

কেয়া দাঁড়িয়ে আছে তেমনি। এবং এই যে অন্ধকার, আবছা অস্পষ্ট অন্ধকারে ধীরে ধীরে কেয়া ফুটে উঠছে, মনে হয়, কেয়া সারা শরীরে অন্ধকারের বোরখা পরে বলছে, ভয় আমাদেরও কম নেই মশাই। আপনি কিনা কি মানুষ কে জানে। ফুল রেখে দেখছি, ফুল নিয়ে সারা রাত কাটাতে কেমন লাগে আপনার।. কি-ভাবে কাটান। এমন যে তাজা ফুল, ফুলের সৌরভ আপনাকে কেমন রাখে, দেখার বড় বাসনা।

মেয়েরা কি কম বয়সে বেশি বুঝতে শেখে। কেয়াকে তো সে সকালেও দেখেছে। কেয়া সকাল থেকে আসলে কি যে সৌরভ পেয়ে গেছে এই শরীরে সেই জানে। যেন অতি সহজে এই ছোট্ট মেয়েটি একটি মানুষের কাছে ফুলের মতো ফুটে উঠতে চাইছে। যেহেতু অজু সারা জীবন এক অতীব হিসেবী মানুষ, নানা রকমের হিসেব তার খাতায় আছে, এবং কবে কি করা উচিত এই ভাবতে ভাবতেই যে মানুষ বয়সী হয়ে যেতে থাকল, সে যে কি করে এখন। এই মেয়ে, তুমি তাড়াতাড়ি ওখান থেকে সরে এস। না হলে কিন্তু ভীষণ খারাপ হবে। আমি মঞ্জুকে ডাকব, মঞ্জু, কেয়া আমাকে অন্ধকারে দাঁড়িয়ে ভয় দেখাচ্ছে।

নীলু ঘুমুচ্ছে। ঠিক এ-সময়ে সে জোরে কথা বলতে পারে না। নীলুর ঘুম ভেঙ্গে যাবে। সে যদি ছেলেমানুষ হয়ে যেতে পারত, তবে সেই অন্ধকার থেকে কেয়াকে টেনে বের করে আনতে পারত। কি যে হয় মানুষের মনে, কি ভাবে যে মানুষ দুর্বল হয়ে পড়ে। ওর আর বুঝি জীবনেও সাহসে কুলাবে না, এই যে ছোট্ট মেয়ে সে যাকে ইচ্ছে করলে একদিন পাঁজা কোলে করে নদী পার করে দিতে পারত, এখন এই মুহূর্তে আর সে পারে না কেন? সে বলল, কেয়া আমি যাচ্ছি। তুমি ওখানে দাঁড়িয়ে থাক।

সঙ্গে সঙ্গে কেয়া বের হয়ে এল। বলল, না, আমি ওখানে থাকব না। আপনি বললেই থাকব।

এই মেয়েটা ব্যবহারে সকালে বিকেলে পাল্টে যায়। যেন ওকে অপমান না করতে পারলেই বাঁচে। মেয়েটা আমার দরজার চৌকাঠে হেলান দিয়ে বলল, কাল যাচ্ছেন?

—কাল, না হয় পরশু। আর থেকে কি হবে। মঞ্জু এ-জন্য চিঠি লিখবে ভাবতে পারি নি।

—অনেক আশা নিয়ে এসেছিলেন মঞ্জুদির কাছে।

—না, তেমন কিছু না। আমার আশা-আকাঙ্ক্ষা কিছু আর নেই।

—মিথ্যা কথাও বলতে পারেন।

—মিথ্যা কথা না কেয়া। ছেলেবেলা থেকে আমি এমন স্বভাবেই মানুষ। মঞ্জুকে বললে জানতে পারবে।

—মঞ্জুদি সব বলে না।

—সব কোনদিন কেউ বলে।

—না। তবে অন্তত কেউ কিছু বলে।

—মঞ্জু তোমাকে তাও বলে না?

—না। কেবল আপনি অত্যন্ত সরল সহজ মানুষ এটুকু বলে। খিদে থাকলেও চেয়ে খেতে পারেন না।

—ব্যাস সবই তো তবে বলেছে।

—এতটুকুতে সাহস পাই না।

—যা দেখাচ্ছ, ওতে তো আমার, বীরাঙ্গনা ছাড়া আর কিছু তোমাকে ভাবতে ইচ্ছে হয় না।

—ভাল।

—কাল যাব, হয়তো যাওয়া হবে না। কারণ সব ঠিকঠাক করতে সময় চলে যাবে। সকালে উঠেই ঠিকঠাক করে নিতে হবে সব। কি ভাবে যাব, মুর্শিদের নাম কি হবে। তাকে কি ভাবে কোথায় পাঠাব, তাও স্থির করে নিতে হবে। সে আমার কে আমার সম্পর্কে

কি হয়, এবং বাপের নাম, ঠাকুর্দার নাম বাড়ি সব ওকে মুখস্থ করিয়ে নিতে হবে। বলা যায় না, কখন কি দরকার পড়ে।

—আপনারা চলে গেলে বাড়িটা খালি হয়ে যাবে। আমাদের দিন কাটবে না।

—কেন, এর পর তো তোমাদের স্কুল-কলেজ আরম্ভ হয়ে যাবে, পড়াশোনায় মন দাও। দেখবে সব ভুলে যাবে। এক ঘেয়ে লাগবে না।

—আপনার কাছে তা জানতে চাইনি কি করে এক ঘেয়ে আমাদের কাটবে. আচ্ছা, বলেই থামল। ঠিক বলতে গিয়ে সংকোচ বোধ করল কেয়া, বলতে পারল না।

এবং তখন এ ঘরে, ও-ঘরে আলো। বারান্দায় আলো নেবানো। চারপাশে যা আলো থাকে, জব্বারকা পরে তা নিভিয়ে দিচ্ছেন। কেবল বড় উঠোনে একটা আলো জ্বালা আছে, ওটা থাকে, কারণ ওটা না থাকলে বোধ হয় এই দুই মেয়ে এমন একটা নির্জন পরিবেশে থাকতে ভয় পায়.

অজু বলল, তুমি বলতে গিয়ে থেমে গেলে কেন ?

—না, এই বলছিলাম, আমায় আগে কি ভেবেছিলেন ? মঞ্জুদির চিঠি পেয়ে আপনার কি মনে হয়েছিল।

—ভেবেছিলাম, মঞ্জু এখনও এখানে বেঁচে আছে কি করে ! মঞ্জু কি এত দিন পর বুঝেছে, আমাকে ওর খুব দরকার।

—এসে দেখলেন, ওর দরকার নেই।

—দরকার নেই বলতে পারব না, দরকার আছে, তবে আমার তাতে কিছু আসে যায় না।

—এটা মঞ্জুদির হয়ে উপকার করছেন, এমন ভাবছেন।

—তা ছাড়া কি। মঞ্জুর হয়ে উপকার করলাম। মুর্শিদ চলে যাবে তার দেশে। সে তো জানে, যে ডেজার্টার হিসাবে তার নাম খাতায় নেই। বাড়ির লোকেরা ওর হয়তো খবর পেয়েছে, যুদ্ধক্ষেত্রে একজন সৈনিকের মৃত্যু, যুদ্ধক্ষেত্রে সে প্রাণপণ লড়ে প্রাণ দিয়েছে,

অথবা নিখোঁজ। এ-ভাবে অনেক সৈনিক নিখোঁজ হয়ে যায় যুদ্ধে।

—এত কে বলল আপনাকে।

—কেন, মঞ্জু। মঞ্জু বলল, মার্চ প্যাস্টের দৃশ্যে সে যখন জানালায় দাঁড়িয়ে নিজের কথা ভাবছিল, তখন, দেখতে পেয়েছে, একজন মৃতের শকট, এবং খবর অন্য একজনকেও খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না, নতুবা, এই ১৭ নম্বর রেজিমেন্টের এটি একটি বড় কোম্পানী, এখানে দু'জন বাদে সবার নিকট আত্মসমর্পণের হিসাব আছে।

—আপনি ভাবছেন, ওরা আর কিছু খবর রাখে না।

—না। না রাখাই স্বাভাবিক। এমন একটা সময়ে কোথায় কি-ভাবে কি ঘটেছে তার ইতিহাস ঠিক ঠিক লেখা হবে না।

—আমরা তো মরে যাই নি। আমরা তো বেঁচে আছি। লেখা ঠিক হবে।

—সব আমি জানি না। তুমিও বল নি, মঞ্জুও বলছে না। কেউ এ-সব কথা হয়তো মুখ ফুটে কোন দিন বলবে না। তবে না বলাই ভাল। দুঃখের কথা যত ভুলে থাকা যায় ততই ভাল।

— হবে হয়তো। কেয়া বলল, মুর্শিদ চলে গেলে সবচেয়ে কষ্ট হবে নীলুর।

—নীলুর কষ্ট হবে কেন ?

—সে নীলুর একমাত্র সঙ্গী ছিল এ ক'মাস। সে, নীলুকে ভীষণ ভালবেসে ফেলেছে। মুর্শিদের কষ্ট হবে। সে দুনিয়ায় কখনও আর একটা নীলুকে খুঁজে পাবে না।

নীলু বোধ হয় জেগে গেছে। সব শুনছে হয়তো। কেয়া ভাবল, নীলুর কষ্ট হলে খারাপ। এমন সময় যে, নীলু কোন দুঃখ সইতে পারবে না। এমন কি সে জানে না, তার বাবা নেই, তার বাবা মুক্তিযোদ্ধা হয়ে লড়ছে, এমনই সে জানত। এবং এখনও তার কাজ শেষ হয়নি, হলেই চলে আসবে। মাঝে মাঝে নীলু বড় বড় চোখে মুর্শিদকে দেখত, সে কে, কেন আসে এ-বাড়িতে এক সময় তার প্রশ্ন ছিল তার মায়ের কাছে। মঞ্জুদি

বলত, ও তোমার বাবার বন্ধু। এখানেই সে থাকবে। তোমাকে মুর্শিদ ভীষণ ভালবাসে। তারপর কেয়া থামল, কেয়ার চোখ বড় বড় হয়ে যাচ্ছে বলতে বলতে। মুর্শিদের কাছে নীলু মাঝে মাঝে জানতে চাইত, বাবা কোথায়, কবে আসবে। মুর্শিদ বোকার মতো বলতো, আসবে, সে ঠিক একদিন চলে আসবে। ওর চোখ চিক চিক করত। বোধ হয় সে তার ছোট ছেলের কথা ভাবত তখন। মজিনাকে হয়তো ওর ছেলে ঠিক এমনি প্রশ্ন করছে, বাবা কবে আসবে?

এ-ভাবে ওরা দুজনই কেমন ঘনিষ্ঠ হয়ে গেছে কথা বলতে বলতে। অজু লম্বা। কেয়া তত লম্বা নয়। অজুর বুকের সামান্য ওপরে ওর মাথা। কখনও সান্ত্বনার জন্য অজুর বুকে ঝাঁপিয়ে পড়লে ওর মুখ, অজুর বুকে অনায়াসে হারিয়ে যাবে। এবং এত কাছাকাছি যে, মনে হয়, ওরা আসলে কোন্ কথা বলছে না। একটা ছেলের, একটা জাতির বিশৃঙ্খলার দিনে হাজার হাজার এমনি পরিবারের ছবি ওদের ভেতর এ-ভাবে বোধ হয় ভেসে উঠছে শুধু।

তখন নীলুর শুকনো গলা, মাসি।

কেয়া তাড়াতাড়ি সরে দাঁড়াল।—আমাকে ডাকছ নীলু।

—মাসি মুর্শিদ চাচা চলে যাবে?

তবে ঘুমায়নি নীলু। সে ভাবল, ওটা ঠিক হয় নি। সে বলল, হ্যাঁ চলে যাবে। নীলুকে ধীরে ধীরে সব সইয়ে নেওয়া উচিত।

নীলু বলল, কেন?

—সে তার দেশে যাবে।

—দেশ!

—হ্যাঁ ওর দেশ।

—সেটা কোথায় পিসি।

—সেটা ভারতবর্ষ পার হয়ে।

—কত দূর!

—সেটার নাম পাকিস্তান।

—মুর্শিদ কাকা আমাদের ছেড়ে পাকিস্তানে চলে যাবে?

—সেতো নীলু সেখানকার মানুষ।

নীলুর বিশ্বাস করতে কষ্ট হল। সে মুশিদ কাকাকে দেখেছে, খুব ভাতু মানুষ। ওর পাশে চুপচাপ বসে থাকত শুধু। সে কিছুতেই মুশিদ কাকার মিলিটারি পোশাকের চেহারা মনে করতে পারে না। ওটা যেন ওঁর একটা ছদ্মবেশ। তখনও আসত। চুপচাপ আসত। ওরা মিলিটারি, সে এই ভাবত। অবনী কবিরাজ বলত, ছাখো, মুশিদ, এই আমার কপাল। সারা জীবন ওকে এ-ভাবে বহন করতে হবে আমাকে। নিজের হাতে যে ভাগ্য রোপণ করেছি তাই এখন বড় হয়ে বট বৃক্ষ হয়ে গেছে।

কেয়া জানে এটা ছিল অবনী কবিরাজের স্বভাব। সে কথা বলতে বলতে দুঃখের কথা এলে সাধুভাষা ব্যবহার করতে পারলে বাঁচত।

তখন মুশিদকে নীলু জানত, দেশের মানুষ। দেশের হয়ে সে বিদেশীদের সঙ্গে লড়ছে। এবং এই বিদেশ কথাটির কোন অর্থ নেই কেয়া বুঝতে পারত। আসলে মানুষের কোন দেশ বিদেশ থাকতে নেই। এবং কারা যে এ-সব করে বেড়ায়। তারপর দীর্ঘদিন নীলু দেখেনি মুশিদকে। মুশিদ আবার যখন এল, একেবারে আলাদা মানুষ। সে আগের চেহারার সঙ্গে এ-চেহারার কোন মিল খুঁজে পেল না। আগের ছবি ভুলে যেতে ওর এতটুকু সময় লাগেনি। মার কথাই সে শেষ বারের মতো বিশ্বাস করেছে। তারপর তার মনে হয়নি কখনও মুশিদ কাকা এ-বাড়ি ছেড়ে চলে যেতে পারে। যেমন জব্বার কাকা, কেয়া মাসি, মা আছে, সেও তেমনি থাকবে এখানে। এবং এ ভাবে সে, মুশিদ এ-ঘরে এলে কেমন যেন সবচেয়ে বেশি প্রাণ পেয়ে যেত। মুশিদ বোধ হয় এ-দুমাসে সবার চেয়ে আপন হয়ে গেছিল নীলুর।

কেয়া দেখল ব্যথায় থম থম করছে নীলুর মুখ। এবং নীল হয়ে গেছে মুখটা।

কেয়া বলল, তুমি ঘুমোও নীলু। কাল সকালে মুশিদ

তোমার সঙ্গে দেখা করতে আসবে। না ঘুমোলে সে ভীষণ কষ্ট পাবে।

নীলু দেখল, পাশা পাশি দাঁড়িয়ে আছে ওরা দুজন। সে তার মুখ ব্যথায় নীল হয়ে গেছে বুঝতে দিতে চায় না। সে বলল, মা জানে মাসি ?

কেন জানবে না। মাইতো ওর সব ব্যবস্থা করে দিচ্ছে।

নীলুর বোধ হয় মনে হচ্ছিল কেউ ভালবাসে না মুর্শিদ কাকাকে। ভালবাসলে কেউ মানুষকে যেতে দেয় না। নীলু বুঝতে পারে না, পৃথিবীতে আর কে এমন আছে, যাকে ফেলে মুর্শিদ কাকা থাকতে পারে না। সেতো জানে সেই, সব মানুষটার। এবং ভীষণ অভিমান এ-জন্য নীলুর। সে ভাবল, কাল সকালে এলে কথা বলবে না। ভিতরে ভিতরে একটা দুঃখ সারা শরীর বেয়ে বুকের কাছে কেমন থেমে গেল। অসহ্য ব্যাথা। সে বুঝতে পারছে বুকের কাছে সেই ব্যথাটা সূচের মতো বিঁধছে। সে অভিমানে মুখ কুচকাল না। কাউকে সে তার কষ্টের কথা বুঝতে দেবে না। কিন্তু কেয়া ওর মুখ দেখেই ভীষণ ঘাবড়ে যায়। সে জানে, নীলু ওর দুঃখ লুকিয়ে যাচ্ছে। নীলুর মাথার কাছে থরে থরে সাজানো সব অযুধ। কোনটা কখন দিতে হবে সে সব চেয়ে ভাল জানে। কিন্তু নীলুর এমন কাতর মুখ তো কখনও দেখেনি। সে কেমন নিঃশ্বাস নিতে ভীষণ কষ্ট পাচ্ছে। এবং এমন হলেই কেয়ার ভেতরটা গোলমাল হয়ে যায়। ওর ভীষণ হাত কাঁপে।

এ-ভাবে অজু দাঁড়িয়ে দেখল সব। কেয়ার হাত নিরাময় ঈশ্বরের মতো নীলুর সব দুঃখ কষ্ট মুছে দিল। সে সিরিনজে অযুধ ভরে নিল। য়্যামপুল ভেঙ্গে কেমন আয়াসে সে কাজ করে যাচ্ছে। কত তাড়াতাড়ি। একবার মঞ্জুকে ডাকল না পর্যন্ত। মঞ্জুর কোন দায় নেই, যা কিছু দায়-দায়িত্ব সব কত সহজে কেয়া নিজের হাতে নিয়ে নিয়েছে।

এ সব দেখে অজুর মনে হল, কেয়া, এই নীলুর জন্য মায়া

ধীরে ধীরে নিজের করে নিচ্ছে। মঞ্জুকে বোধ হয় নীলুর দুঃখ বুঝতে দিচ্ছে না। এমন কি কেয়া যে এ ঘরে থাকে, সব সময় নীলুর সেবা শুশ্রূষা করে, সেও মঞ্জুকে দুঃখ থেকে দূরে রাখার জন্য। সবাই জানে শুধু দিন মাস অথবা বৎসর। এ ভাবে কিছুদিন অপেক্ষা করলেই নীলুর ছুটি হয়ে যাবে।

কেয়া দেখল, এখন নীলু ঘুমোচ্ছে। এটা ঠিক ঘুম না। ঘোরের ভিতর পড়ে যাওয়া। অষুধ রক্তের ভিতর মিশে গেলে সে একটা বুঝি আশ্চর্য জগতের সন্ধান পায়। জেগে গেলেই মুখ বিকৃত হয়ে যায়, শ্বাস নিতে পারে না নীলু। তখন দুঃখটা চোখে সহ্য হয় না।

মাঝে মাঝে কেয়ার বলতে ইচ্ছা হয়েছে, নীলু তখন তুমি কোথায় যাও ?

সে বলত, জানি না।

—কিছু মনে করতে পার না ?

—একটা নীল রঙের অন্ধকারের ভিতর ডুবে যাই মাসি।

—আর কিছু না ?

—আমার কাছে নীল রঙের অন্ধকারটা আলোর মতো লাগে।

—সেখানে কি দেখতে পাও ?

—সব ছোট ছোট গাছ, ছোট ছোট মানুষ, ফুল ফল, নানা রকমের পাখি।

—ঠিক শালিখ কাকের মতো ?

—না। সব পাখিগুলো কাকাতুয়ার মতো সাদা। ওরা আমার সঙ্গে কথা বলে।

—আর কিছু ছ্যাখো না ?

নীলু ভেবে বলত, আর কি দেখি আমি জানি না মাসি। আমি মনে করতে পারি না। ঘুমোবার আগে এমন দেখি, ঘুম ভাঙবার সময় এমন দেখি। মাঝে বোধ হয় কিছু থাকে, কিন্তু আমি মনে রাখতে পারি না।

কেয়া বুঝতে পারত, নীলু শুয়ে শুয়ে যা-ভাবে সবই সেই কথা। যেমন একবার একটা লোক কাকাতুয়া নিয়ে খেলা দেখাতে এসেছিল, সেই থেকে ওর খুব ইচ্ছা এ-ঘরের দাঁড়ে একটা কাকাতুয়া থাকবে। বাড়ির চারপাশে যা সব গাছ আছে, সব এত বড় যে, সে গাছগুলোকে নিজের ভাবতে পারে না। পাখিগুলো এত ভীতু যে ওর ঘরে কেউ আসে না। ওর ধারণা কাকাতুয়া খুব পোষ মানে। যদি সে ভাল হয়, তবে বাড়ির চারপাশে সব কাকাতুয়া ছেড়ে দেবে। বাগানে নানা রকমের ফুল ফুটে থাকবে। ফুলের ভিতর সে বসে থাকবে। আর চারপাশে যে-সব পাখিরা উড়বে, তাদের সঙ্গে গল্প করতে করতে দিন শেষ করে দেবে। সে তো কখনও আর মার মতো সাদা ঘোড়ায় চড়ে অনেক দূরে চলে যেতে পারবে না।

মঞ্জুদি সময় পেলেই ছেলেবেলাকার সব সুন্দর সুন্দর গল্প বলত ওকে। অজু কাকার প্যাণ্টে দড়ি থাকত না, ছুটে গেলে ওর প্যাণ্ট হড়-হড় করে নেমে যেত। এমন ভাবে গল্প বলত যে নীলু ভীষণভাবে হেসে উঠত। আর মঞ্জুদির তখন মনে হত বুঝি ওকে স্বাভাবিক করে রাখতে পারলে নিজের ভিতরই একসময় নিরাময়ের আকাঙ্ক্ষা জাগবে। নিরাময়ের আকাঙ্ক্ষা জেগে গেলে সে ভাল হয়ে যাবে।

আসলে মানুষ সে তার শৈশবে থাকতে ভালবাসে। যেমন মঞ্জুদির সে সব দিনগুলোই আনন্দের। খুব দুঃখের কথা মনে হলে মঞ্জুদি শৈশবের কথা বলত। সে তো জানত না, শৈশবে এ-ভাবে অনেক ঘটনা ওর সামনে সাজিয়ে রেখেছে। সে ঘোড়ায় চড়ে বেড়ালে বুঝতে পারত না, কখনও বন্যায় অথবা খরায় ধরণীতে শস্যহানি ঘটে। সাদা ঘোড়ার মতো পৃথিবীর যাবতীয় ঐশ্বর্য ওর যেন করায়ত্ত। এবং নীলু যেমন ভাবে, সে তার চারপাশের সবকিছু নিয়ে রাজা হয়ে বাঁচবে, তেমনি মঞ্জুদি, মঞ্জুদি কেন, সবাই রাজা হয়ে বাঁচতে চায়। বোধ হয় মঞ্জু শৈশবের গল্প বলে নীলুর সঙ্গে সে তার স্বপ্নের দেশে চলে যেত।

নীলুকে দেখতে দেখতে কত সব হিজি-বিজি ভাবল। কেয়া এবার উঠে দাঁড়াল। চাদরটা নীলুর বুক পর্যন্ত টেনে দিল। ও-ঘরে পিঁড়ি ওঠানোর শব্দ শোনা যাচ্ছে। বোধ হয় মঞ্জুদি খেয়ে উঠেছে। কেয়া এবার বলল, যান। শুয়ে পড়ুন গে। মঞ্জুদি আসছে।

—মঞ্জুদি এলে আমি থাকতে পারি না?

—কি দরকার থেকে। আপনি মঞ্জুদির ভালবাসার মানুষ। আপনাকে ভালবাসলেও পাপ।

অজু ভাবল, কি আশ্চর্য নির্ভিক, অথবা ও কি এই ক'মাসে এত সব ঘটনায়, অনেক বেশি অভিজ্ঞ হয়ে গেছে! মানুষের সঠিক ঠিকানা জেনে ফেলেছে। অথবা মানুষ সম্পর্কে অবিশ্বাস! সে তো কেয়ার সঙ্গে এমন ব্যবহার করে নি, যাতে কেয়া এ-সব ভাবতে পারে। নিজের মতো করে যা খুশি সব বলে যাচ্ছে।

অজু বলল, মঞ্জু আমাকে আর ভালবাসে না।

কেয়া কেমন সামান্য তাকিয়ে চোখ নামিয়ে নিল। বলল, আপনি মঞ্জুদির নামে আর কলঙ্ক রটাবেন না।

অজু থ হয়ে গেল। মঞ্জুদি সম্পর্কে সে কলঙ্কের কত দূর রটাতে পারে। যা হবার সব তো হয়ে গেছে। যদি কোন ঘটনা ঘটে থাকে, অর্থাৎ মুর্শিদ যদি ওর ভালবাসার মানুষ হয় তবে সে কিছু করতে পারে না! এবং কি-ভাবে মুর্শিদ এমন ভাবে মঞ্জুর এত কাছাকাছি চলে এসেছে সে জানে না। সে কেমন সব ভাসা ভাসা জানে। খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে জানার স্বভাব তার না। এবং মঞ্জুকে কি সে এখনও সেই ফ্রক পরা মেয়ে ভেবে থাকে। মঞ্জু ওকে যা যা বলত, সে মঞ্জুর পাশে বসে শৈশবে ঠিক তাই তাই করেছে। এখনও কি মঞ্জু তাকে সে-ভাবে ভেবে থাকে! ভাবলে ভুল করছে। সে বলল, কেয়া, মঞ্জুর কলঙ্ক বলতে কিছু নেই। মঞ্জু আমাদের চেয়ে অনেক বেশি স্থির। সে বোধ হয় শৈশব থেকে বুঝতে পেরেছিল, ওর এই অসামান্য রূপ নানাভাবে পীড়ন করবে। সে যা কিছু

সুখ, তখন থেকেই, খুব কম বয়স থেকেই নিতে আরম্ভ করেছিল। কলঙ্ক রটলে তখনই রটতে পারত।

এ-ভাবে অজুর মনে হল, না সে ঠিক বলিনি। সে বাহবা নেবার জন্য কিছু কিছু কলঙ্কের কথা অবনীকে বলেছে। এখন মনে হয়, অবনী সেই সুযোগ নিয়ে মঞ্জুকে বাগে এনেছে। সে কেয়াকে চট করে মিথ্যা কথা বলে কেন যে বাহবা নিল বুঝছে না। আসলে, এখানে থেকে যাওয়া মঞ্জুর, অবনীর সঙ্গে বিয়ে, সব কিছুর মূলে নিজেকে কেমন জড়িয়ে ফেলল। সে কেয়াকে কিছুতেই বলতে পারল না, সব কিছুর মূলে হয়ত আমিই। ওর জীবনের সব দুঃখের মূলে হয়তো আমার শৈশবের প্রেম, সামান্য ছেলেমানুষী ভালবাসা, পুতুলের বিয়ে দিতে দিতে; একসঙ্গে স্বামী স্ত্রী সেজে শুয়ে পড়া, এবং কিছু কিছু ঘটনা, তখন তো ওর জায়গাগুলো ছিল একান্ত মসৃণ। কোথাও কিছু তেমন ফুটে ওঠেনি। অবনীকে বললে, সে হিংসায় জ্বলে যেত। সে কি শেষ পর্যন্ত বদলা নিয়ে চলে গেল! কত কি যে মনে হচ্ছে! অজু মাথা নিচু করে চলে যাচ্ছে, কেন যে নীলুর মুখ দেখে, কেয়ার মুখ দেখে হাত তুলে বলতে পারল না, আমি নিরপরাধ নীলু।

মঞ্জু এসে দেখল কেয়া পাশ ফিরে শুয়ে আছে। সামনের জানালা খোলা। সাদা জ্যোৎস্না গাছ-পালায়। কেয়া শুয়ে শুয়ে জ্যোৎস্না দেখছে।

নীলু ঘুমিয়ে নেই। মঞ্জু মুখ দেখেই টের পেয়েছে, নীলু অসুখের ঘোরে আছে। সে নীলুর দিকে তাকালে এটা বুঝতে পারল। খুব বেশী সময় সে তাকাতে পারে না। মুখশ্রীতে নীলু কোথায় যেন অজুর কিছুটা পেয়েছে। কেউ টের না পেলেও সে টের পায়। এটা কেন হয় সে বুঝতে পারে না। অজুর সঙ্গে সেই শৈশবের সম্পর্ক। তারপর ওর সঙ্গে দেখা নেই। অবনী

ওর দুর্বলতার সুযোগে যা কিছু করে যেত, যেমন পরে মনে হত পাপ। জানালায় মাথা রেখে সে বসে থাকত তখন, তার মনে হত, এক বালক স্কুল থেকে ফিরছে, ওর হাতে সোনালী চায়ের প্যাকেট, মুখ শীর্ণ, পায়ে ধুলো, তখন সাদা ঘোড়াটা মাঠে চি-হি চি-হি করে ডাকত।

মঞ্জু কেয়াকে বলল, মশারি টানালি না?

—টানাচ্ছি।

—নীলুকে তো কখন থেকে মশায় খাচ্ছে।

কেয়ার মনে হল সত্যি, ওর আজ কি-যে হয়েছে, এমন ভুল তার হয় না। একটু রাত হলেই সে নীলুর মশারি টানিয়ে দেয়। মঞ্জুদির বিছানা করে রাখে। মশারি টানিয়ে রাখে। আজকে তার কেন যে সব ভুল হয়ে যাচ্ছে।

সে তাড়াতাড়ি লাফ দিয়ে উঠে পড়ল। অনেক রাত হয়ে গেছে। ইদানিং ওরা অনেকদিন এত রাত করে শোয়নি। চোখ জ্বলছে কেয়ার। সে নীলুর মশারি টানিয়ে দেবার সময় বলল, তুমি একটু বোস। আমি সব করে দিচ্ছি।

এবং কেয়ার খুব তাড়াতাড়ি কাজ করার স্বভাব। এই যে বসে একটু হরিতকি মুখে দেবে ওতেই মঞ্জু দেখবে, কেয়া সব কাজ করে ফেলেছে। কিন্তু কখনও কখনও এ-জন্য কেয়ার কাজে ভীষণ ত্রুটি থেকে যায়। হয়তো বিছানা না ঝেড়েই সব পেতে রাখল, মঞ্জু শুতে গিয়ে বলবে, তোকে আর আমার কাজ করতে হবে না কেয়া, এবারে তোকে বিয়ে দিতে হবে। কাজ করার সময় তোর কাজে মন থাকে না।

কেয়া বুঝতে পারে তখন ভুলটা। সে এ-পার থেকে জিভ কেটে খুব একটা অন্যায় করে ফেলেছে এমন মুখ করে রাখে। এবং এখন যখন মঞ্জুদি ওর ঘরে শুতে যাবে তখন নিশ্চয়ই কোন অসুবিধা দেখতে পাবে না। সে নিজের মশারি টানিয়ে শুয়ে পড়ল। পাখা চালানো দরকার হবে না, কেমন শরতের ঠাণ্ডা জানালা খুলে রাখায় ঘরে আসছে।

মঞ্জু এক গ্লাস জল নিয়ে অজুর ঘরে ঢুকে গেল। মশারি ফেলা। নীল রঙের অল্প আলো। মশারির ভিতরে কিছু দেখা যায় না। অজু ঘুমিয়ে আছে কি জেগে আছে সে বুঝতে পারল না। গত রাতে সে দরজা বন্ধ করে শুয়েছিল, আজিও দরজা বন্ধ করে শোবার কথা, কিন্তু সে তা করেনি। অবশ্য মঞ্জু জল না রেখে গেলে সে দরজা বন্ধও করতে পারে না। এবং দেখল, পাশে বেশ তাজা গোলাপ। বড় বড়, লাল সাদা এবং কালো গোলাপ। সবগুলো ওর মাথার কাছে। এত কাছে কেয়া কেন যে গোলাপের গুচ্ছ গুলো রেখে গেল।

মঞ্জু শিয়রের কাছে জল রেখে বলল, অজু তোমার জল।

অজু বলল, ঠিক আছে।

অজু তবে ঘুমোয়নি। কি কথা বলে সে এ-ঘরে আর একটু সময় থাকবে বুঝতে পারে না। মঞ্জু কি ভেবে বলল, দরজাটা বন্ধ করে দেবে না?

—না, থাক। হাওয়া দিলে নড়ে। আমার তখন ঘুম আসে না। খোলা থাকলে দরজায় হাওয়া লাগে না।

মঞ্জু চারপাশ দেখে বলল, দ্যাখো মশারি ঠিক মত গোঁজা আছে কিনা, সে একদিকে আর একটু গুঁজে বলল, কেয়ার সব কাজ তাড়াহুড়ো করে করার স্বভাব। এটা কেন যে হয়েছে বুঝি না। যা বড় বড় মশা।

অজু মশারির ভিতরে পাশ ফিরে শুল।—এত যত্নে ঘুম আসে না মঞ্জু।

—কলকাতায় মশা কেমন?

—মশা নেই। এবার যাও। ঘুমোও গে। সকালে উঠে অনেক পরামর্শ আছে। অনেক রাত হয়েছে।

মঞ্জু আর কেন যে এ-ঘরে থাকতে সাহস পায় না। অজুকে সে কিছু বলবে বলে যেন জলের গ্লাস নিয়ে এসেছিল। কিন্তু অজু যে-ভাবে ওকে যেতে বলছে, ওর আর কিছু বলতে সাহস

হচ্ছে না। তবু বলল, অজু তুমি হয়তো আমার ওপর ভীষণ রাগ করছ।

—রাগ করব কেন?

—তোমাকে অহেতুক একটা এমন বিপদে টেনে আনলাম।

—আমি এটা আদৌ ভাবছি না।

—না ভাবলেও, আমার কিছু খুলে বলা উচিত।

—তুমি কি বলবে জানি।

—না জান না।

অজু এবার উঠে বসল। বলল, কি জানি না বল?

—তুমি জাননা নীলু আমাদের বিয়েব আগেব সন্তান।

অজু মাথা নিচু করে রাখল। বলল, তা আমি জানি না।

—তুমি জান না, অবনী আমাকে ভালবাসত না।

—সে তুমি বোধ হয় একবার কি প্রসঙ্গে বলেছিলে।

—তুমি অবনীকে আমার কিছু শৈশবের কথা বলেছিলে।

অজুব গলা কেমন শুকিয়ে কাঠ। সে এ-সব কিছুক্ষণ আগে ভেবেছে। এখন ঠিক সেই সব জেরা। সে বলল, আমাদের তিনজনের একটা গোপন প্রতিযোগিতা ছিল মঞ্জু। কাকে তুমি বেশি ভালবাসো এই নিয়ে। আমি নানাভাবে প্রমাণ করার চেষ্টা করেছি তুমি আমাকে বেশি ভালবাসো। তুমি আমাকে যে-সব শেখাতে, তা কিছু কিছু অবনীকে জয়ী হবার জন্য আমি বলেছি।

মঞ্জু বলল, অবনী খুব ধূর্ত ছিল।

—অবনীকে একগুঁয়ে জানতাম।

—না, সে একগুঁয়ে নয়। ওর মনে ছিল, আমাকে সে যে-কোন ভাবে অধিকার করবে। বাবা, আমাকে চন্দননগরে পাঠিয়ে দিলেন। দেশ ভাগের পর তোমরা গেলে, তার তিন চার বছর পরেই। অবনী সেখানে হাজির। ওর বাবার পয়সা ছিল, অবনী কাজের নামে আমার পাশে ঘোরাফেরা করত। আমার মামারা এটা পছন্দ করতেন না। আমাকে আবার বাবার কাছে পাঠিয়ে দিলেন।

অজু বলল, আমি জানি তুমি পরে কি বলবে। কিন্তু তুমি বিশ্বাস কর মঞ্জু, তোমার কোন অনিষ্ট করতে চাই নি।

—অবনী ভেবে ফেলল, খারাপ মেয়ে আমি। সুতরাং সে খারাপ মেয়েকে অতি সহজে শিকার করার আশায় বাবার কাছে কবিরাজী শিখতে লেগে গেল।

—তুমি অবিনাশদাকে সব খুলে বলতে পারতে।

—সে আমাকে তোমার ভয় দেখিয়েছিল। সেই বয়সে, ওটা আমাদের বয়স বাড়ার সময়, চারপাশের সব কিছু থেকে কি করে যে জেনে ফেলেছি সব, অথচ ভিতরে প্রবেশ করার সামর্থ্য নেই—সেইসব ছেলেমানুষী ঘটনা নিয়ে সে আমাকে ভয় দেখাতো।

—অবনীর ব্ল্যাকমেল করার স্বভাব ছিল বলছ!

—তা ছাড়া এটা কি বলবে। সে বাবার কাছে কি যে ভাল মানুষ, এবং তুমি তো জানো আমি সব পারি, কিন্তু তোমাকে ছোট করতে পারি না, কারণ তোমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে আমি তোমার সব জেনে ফেলেছিলাম।

অজুর কেমন সংকোচ হচ্ছিল এ-প্রসঙ্গে কথাবার্তা বলতে। কিন্তু মঞ্জু অনায়াসে বলে যাচ্ছে। ওর মুখে আটকাচ্ছে না। ওর যে বলার ইচ্ছা ছিল, মঞ্জু আমারও ভীষণ ইচ্ছা হত। কি যে ভাল লাগত সেই বয়সে, তোমার ভেতরে তখন সব কেমন পুষ্ট হয়ে উঠছে, এখন আমি মনে করতে পারি, কোথাও কোথাও মসৃণ ত্বকে আশ্চর্য সব সোনালি লতার ছায়া, আমারও ভীষণ ইচ্ছা করত। মুখ ফুটে বলতে পারতাম না।

অজু চুপ করে থাকল। কোন কথা বলল না। মশারির পাশে দুজন মুখোমুখি বসে রয়েছে। মঞ্জু আরও যেন কত কথা বলবে। মঞ্জু কি ভেবেছে, সারা রাত তাকে ঘুমোতে দেবে না। সে বুঝতে পারছে না, আসলে মঞ্জু কি বলতে চায়। ওর এমন কি কথা যা আজ না বললে ওর সব মিথ্যা হয়ে যাবে। মঞ্জু পরেছে চওড়া হলুদ পাড়ের শাড়ি। চোখে চশমা পরার সঙ্গে সঙ্গে

যেন ভারি হয়ে উঠছে। ওর চুল ঘাড়ে ছড়ানো। এবং পাখার হাওয়ায় সহজে শুকিয়ে নিয়েছে। গলায় সরু হার, হাতে একগাছা করে সোনার চুড়ি। সবই একরকমের, কেবল দেখতে পাচ্ছে, চোখ বড় বড়, কতদিন অবনী মারা গেছে, কতদিন তার এ-ভাবে একা রাত-যাপন! যে একবার অভ্যাসের ভেতর পড়ে যায়, অভ্যাস বন্ধ হয়ে গেলে তার বোধ হয় ভীষণ কষ্ট। অজুর কাছে কি মঞ্জু সেই কষ্টের কথা বলতে এসেছে!

কিন্তু আশ্চর্য মঞ্জু বলল, জানো মুশিদকে সেই নিয়ে এসেছিল।

অজু ভাবল, মুর্শিদ কি মঞ্জুর তবে ভালবাসার মানুষ না! সে তো কিছু জানে না। অজু তাকিয়ে থাকল।

—মুশিদ এসেছিল অষুধ নিতে। ওটা ওর বোধ হয় ছলনা। সে আমাকে একদিন স্কুল ফেরত রাস্তায় দেখেছিল। এবং তখন থেকেই খোঁজ-খবর! কে, এই মেয়ে! তারপর খোঁজ-খবর, অবনীর সঙ্গে বন্ধুত্ব, সে আমার কাছে এলে তার স্ত্রীর কথা ভুলে থাকতে পারত। কিন্তু মুর্শিদ ঠিক তোমার মতো, সে খুব বেশি দূর যেতে পারে না।

অজু বলল, ওকে দেখে আমারও এমন মনে হয়েছে।

মঞ্জু একটু হাসল এবার। অজু কথার ওপরে কথা বলে যাচ্ছে। সে আর কিছু বুঝি এখন করতে পারে না।

মঞ্জু বলল, তুমি ওকে ঠিকমতো পৌঁছে দিও। মানুষের কাছ থেকে, আমি চিরদিন অবহেলা পেয়েছি, সব মানুষের কাছ থেকে, একমাত্র মুর্শিদ আমাকে ভাবত, আমার কিছু আছে। মানুষ মানুষকে মূল্য না দিলে অজু এ-সব হয়।

এ-সব বলে মঞ্জু কি বোঝাতে চাইছে বুঝতে পারছে না। সে বলল, তুমি এ-সব বলে কি বোঝাতে চাইছ।

—এই এট্রসিটিজ! পাকিস্তানের মানুষেরা আমাদের কোন মূল্য দিতে শিখল না। না ভাষার, না জাতির। সেই এক ট্রেডিশান

অজু, আমরাও দেশ ভাগের আগে বোধ হয় ওদের দিই নি। কেয়াকে দেখলে এখন এটা বেশি করে বোঝা যায়।

অজু ভেবে পেল না, মঞ্জু তাকে এমন কথায় কি বোঝাতে চাইছে। মঞ্জু কি গুছিয়ে বলতে পারছে না। সে কি বলতে চায়, অজু, আসলে মানুষ জন্মেই যুদ্ধক্ষেত্রে বড় হয়। প্রত্যেকের একটা সাদা ঘোড়া থাকে জীবনে। সে তার ওপর চড়ে বেড়ায়। সে সবসময় পৃথিবীর রাজা হয়ে বাঁচতে চায়। কিছু সে ছাড়তে রাজি না।

মঞ্জু তখন বলল, মুর্শিদকে ঠিক মতো পৌঁছে দিলে আমার আর কোন দুঃখ থাকবে না। সে নিজের জীবন পণ করে আমার জীবন রক্ষা করেছে।

অজু বলল, কথা দিলাম মঞ্জু। দিল্লীতে আমার অনেক বন্ধুবান্ধব আছে। আমার মুস্লিম বন্ধুও আছে। যে-ভাবেই হোক ওকে বর্ডার পার করে দেবার ব্যবস্থা করব। অন্তত পাকিস্তানের একটা লোকতো জানবে আমরা ওদের শত্রু নই। তাই বা কম কি।

মঞ্জু উঠে দাঁড়াল। যেন চলে যাবে। সে বলল, পাখাটা একটু বাড়িয়ে দেব অজু?

অজু বলল, না।

মঞ্জু যেতে যেতে বলল, তুমিতো জানো আমার মা আত্মহত্যা করেছিলেন। কেন করেছিলেন তখন জানতাম না। এখন মনে হয় আমার মা কোন কারণে আমার চেয়ে বেশি দুঃখী ছিল। না হলে এ-ভাবে কেউ জলে ডুবে আত্মহত্যা করে না।

অজু পাশে পাশে হাঁটতে থাকল। কেমন মৃদু সৌরভ ওর শরীরে। বোধ হয় সে চুলে বিদেশী তেল মাখে। শরীরের সবকিছু এত বেশি মহিমাময় যে অজু পাশে হাঁটতে ভয় পেল। মঞ্জুর পোশাক, ওর আলগাভাব কেন যে ওকে লোভী করে তোলে।

মঞ্জু বলল, কাল তোমরা থেকে যাও। পরশু যাবে। কাল সময় করে উঠতে পারবে না।

অজু বলল, ঠিক আছে।

মঞ্জু বলল, অজু তুমি কিন্তু এতটুকু বদলাও নি।

অজু বলল, বদলেছি, তুমি টের পাচ্ছ না।

—তা হলে অভিনয় করছ, যা না তুমি, তাই ব্যবহারে দেখাচ্ছ।

—তা ছাড়া কি!

মঞ্জু বলল, তবে আর ওদের দোষ দিয়ে কি লাভ। যুদ্ধ ব্যাপারটাই খারাপ। বিশ্বাস না হারালে যুদ্ধ বাধে না। মানুষ বিশ্বাস হারালে সব হারায়। আমি এ-জন্য কিছু মনে করি না।

অজু বলল, এ-সব বড় বড় কথা। তবে বুঝি, এ-সব যোদ্ধারা বীরের মতো কাজ করে নি। ওরা বিবর ঘাঁটিতে মেয়েদের রেখে নানাভাবে ভোগ করত শুনেছি।

মঞ্জু ঘুরে দাঁড়াল। পরাজয়ের মুখে অজু মানুষ অনেক কিছু করে ফেলতে পারে। আমরা নানাভাবে এই সংসারেই এমন কত হীন কাজ করে বেড়াচ্ছি। আর এতো যুদ্ধক্ষেত্র। তুমি অবনীর কথা ভাবো।

আসলে মঞ্জু মুর্শিদের জন্য ওকালতি করতে এসেছে। অজুর যদি কোন কারণে বিদ্বেষ থাকে, সে যদি কোন কারণে ওকে ধরিয়ে দেয়, মানুষের স্বভাব তো, বিশ্বাস কি, সে-জন্য সে বারবার ওদের হয়ে যেন মাপ চেয়ে নিচ্ছে। বলছে, মুর্শিদের মতো মানুষেরাও আছে। এরা কেন সাজা পাবে অজু। এরা তো কোন দোষ করেনি।

অজু এবার ফিরে এল। মঞ্জু কথা বলতে বলতে অন্ধকার ঘরটায়, সেই যে বাঘ হরিণ সব দেয়ালে রয়েছে সে ঘরটায় মঞ্জু হারিয়ে গেলে শুধু অন্ধকার দৃশ্য থাকে। এই যে একটা ঘরে মাঝখানে, মঞ্জু কেন যে এখানে আলো জ্বালে না, সে বুঝতে পারে না। দু ঘরের মাঝখানে সে একটা বিরাট শূন্যতা রাখতে বোধ হয় ভালবাসে। এবং এ-ঘরটায় অন্ধকারে ঢুকতে অজু ভয় পায়। আর মনে হয় মঞ্জু অনেকক্ষণ ঘরটার অন্ধকারে দাঁড়িয়ে থাকতে ভালবাসে।

সে ফিরে এসে এবার ঘুমোবে ভাবল। মঞ্জুর রাখা জল সে ঢক ঢক করে খেয়ে নিল। আলোটা ডিম করে রাখল। তারপর সোজা শুয়ে বুকের ওপর হাত রেখে চোখ বুজল।

সে পরেছিল পাজামা পাঞ্জাবী। সাদা পাঞ্জাবী। ডোরাকাটা পাজামা। ওর চশমাটি টিপয়ে। অন্যদিন রাতে সে বই পড়তে পড়তে ঘুমোয়। এখন এত রাত যে, সে এটা করতে সাহস পায় না। সে ঘুমোবার জন্য চোখ বুজলে দেখল, কেমন আবছা মতো সব শৈশবের নানাবর্ণের ঘটনা, উৎসব, দুর্গাপূজা চোখের ওপর ভেসে বেড়াতে থাকল। এ-বাড়িতে দুর্গাপূজা হত তখন। মঞ্জুকে নিয়ে সে অনেকদিন স্থলপদ্ম চুরি করতে গেছে। মঞ্জুর তখন যে কি হত।

আসলে মঞ্জুর শৈশব থেকেই একটু বেশী শরীরের প্রতি আকর্ষণ। সবারই থাকে, তবে ওর যেন বেশী এবং মঞ্জুর শৈশবের শরীর চোখের উপর নাচতে থাকলে সে কেমন ভিতরে ভিতরে পাগল হয়ে গেল। এবং বিবর ঘাঁটিতে একজন সৈনিকের যা ইচ্ছা থাকে, অথবা যুবতী মেয়ের দৃশ্য পাশাপাশি ঝুলে না থাকলে জীবন ধারণে যেমন একঘেয়েমি থাকে, সেও তেমনি জীবনে নানাভাবে ভণ্ডামীর আড়ালে সরল সহজ থেকেছে। সে তার ইচ্ছার কথা কোনদিন খুলে বলতে পারে নি। সে যা ভাবে, পৃথিবীর যে কোন পয়লা নম্বরের লম্পট তার চেয়ে বেশি ভাবতে পারে না। সে কেমন চোখের ওপর একটা ভীষণ যুদ্ধক্ষেত্র আবিষ্কার করে ফেলে তখন। সে একা। যুদ্ধক্ষেত্র, সাদা ঘোড়া, কোন রমণীর পোশাক বার বার সে পোশাক খুলে রমণীকে পোশাক ফের পরাচ্ছে। সে এবার উঠে বসল। মাথা কেমন গরম হয়ে যাচ্ছে। এবং মনে হয় এখন সে নিজেই চুরি করে কেয়া অথবা মঞ্জুর ঘরে চলে যাবে! ওর শরীর কাঁপছে। কেয়া অথবা মঞ্জু কি চায় সে জানে। সে নিজের স্বভাবে সকালে তার ভাল মানুষের ব্যবহার, আর অন্ধকারে সে নিজের চুল নিজে

ছিঁড়তে চায়। বিবর ঘাঁটিতে একজন লম্পট সৈনিকের চেয়ে তার ইচ্ছা এখন বেশি মহৎ নয়।

এবং এ-ভাবে সে কখন ঘুমিয়ে পড়েছিল জানে না' ঘুম ভাঙল কেয়ার চিৎকাবে। কেয়াব আকাশ ফাটা আর্তনাদ। মঞ্জু দি, নীলু নেই। নীলুর ছুটি হয়ে গেছে।

অজুর বুকটা কাঁপছিল। ওর পায়ে ঠিক যেন শক্তি নেই। জানালায় ফাঁকা মাঠ। সকাল এবার হবে হয়তো। আর কেউ কাঁদছে না, ছেলে মানুষের মতো কেয়াব কান্না, নীলুর ছুটি হয়ে গেছে মঞ্জু দি। শিগগির এস।

কোন প্ল্যাটফরমে ঘুম ভেঙ্গে গেলে, সব যেমন অচেনা লাগে, কিছু মাথায় আসে না, কোথায় কি আছে বোঝা যায় না, নিজেকে বোকা বোকা লাগে, তেমনি সে এখন জেগে গেলে ভাবল, কেয়া কাঁদছে কাঁদুক, তাব সাহসে কুলাচ্ছে না, সে আবও ভীতু হয়ে পড়ছে, সে মশারিব নিচে দু হাঁটুর ভিতর মাথা গুঁজে বসে রয়েছে, সব কেমন গোলমাল হয়ে যাচ্ছে।

সে এ-ভাবে কতক্ষণ বসেছিল জানে না। মুর্শিদ এসে ডাকল, অজুবাবু আসুন।

সে যেন মুর্শিদকে অনুসরণ করছে। নীলুর একটা কিছু করতে হয়।

অজু বলল, হ্যাঁ তা দরকার।

—আমাদের যাওয়া তবে এখন আর হচ্ছে না।

—না।

অজু দেখল, মঞ্জু নীলুর শিয়রে বসে রয়েছে। জানালা দিয়ে যেন মাঠ দেখছে। কাঁদছে না। কেবল কেয়া নীলুর বুকের ওপর পড়ে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে। আসলে মঞ্জু বোধ হয় জানত, এত আঘাত সে সহ্য করতে পারবে না কিছুটা সে সে-জন্য কেয়াকে দিয়ে দিয়েছে। শেষদিকে কেয়ার কাছেই নীলু থাকত। মাঝে মাঝে মঞ্জু এসে বসত মাত্র। এবং ডাক্তাব এলে মঞ্জু সারাক্ষণ

থেকে সব সিমপ্‌টম বলে যেত। রোগের উপসর্গ বলার সময় ওর মুখ মুর্শিদ যেমন দেখেছে, এখনও ঠিক তেমনি।

এই ঘরটা তুলনায় ছোট। নীলুর খাট আরও ছোট, নীলুর মুখ সাদা চাদরে ঢাকা। বোধ হয় মঞ্জুই এটা করেছে। সে মুখটা দেখলে হয়তো সহ্য করতে পারবে না। নীলুর সাদা পা দেখা যাচ্ছে। চাদরে মুখ ঢেকে দিলে পা বের হয়ে যায়।

অজুর মনে হল, এ-ভাবে মঞ্জু পাথরের মতো বসে থাকলে খারাপ হতে পারে। ওর কাঁদা উচিত, এও হতে পারে, মঞ্জু সব বিলাপ আগেই সেরে রেখেছে। কারণ সে তার ভবিতব্য জানে। প্রতিদিন সে শোকের ভিতর থেকে আজ বোধ হয় ভাবছে ছুটি পেয়ে গেল। তার মোটামুটি যা ভাবনার ছিল সব শেষ' তার কিছু আর পড়ে থাকল না। সে শৈশব থেকে যা কিছু নিয়ে বড় হয়েছিল, এই যেমন গাছ বড় হলে ডালপালা মেলে বড় হয়ে যায়, ঋতুতে ফুল ফল আসে আবার ঝরে যায়, তেমনি মঞ্জুর এখন সব ঝরে গেছে। যেন সে শৈশবের মঞ্জুর মতো। বলে উঠতে পাবে সে, যাবে অজু, ঘোড়ার চড়ে আমরা আস্তানা সাবের দরগা পার হয়ে যাব।

অজু নীলুর মুখের চাদর খুলে দেখল। ঠিক ঘুমিয়ে আছে যেন। সে বুকে হাত দিল। বুকে সামান্য উষ্ণতা জেগে রয়েছে। হাত-পা শক্ত হয় নি। ভোর রাতের দিকেই নীলু ছুটি নিয়েছে। খুব একটা দেরি হয় নি কেয়ার জাগতে। হাত-পা কাঠ কাঠ হতে সময় নেবে। ফুলের মত ছেলেটা নির্বিঘ্নে ঘুমিয়ে আছে। বোধ হয় ফুলের মতো ছেলেরা মরে গেলে মুখে কোন কষ্টের চিহ্ন থাকে না। অজু নীলুর মুখে এতটুকু কষ্টের ছাপ দেখল না। চোখ দুটো বোজা। মুখের এক কোণে সামান্য দুষ্টু হাসি।

অজুর চুপচাপ ক' ফোটা চোখের জল পড়ে গেল। কেউ দেখল না হয়ত।

ওদিকে মুর্শিদ, সেও দেখছে নীলুকে। সে চাদরের নিচে হাত দিয়ে দেখছে পা কতটা ঠাণ্ডা। সে কি এখন ভিতরে ভিতরে তেমনি

খেলা দেখাবে, সেই তাজিয়া নিয়ে সে যেমন ইন্টালির দরগা থেকে রাজাবাজারের মসজিদে আসত ছুটে ছুটে। সে কি ভেবেছে, এখন যদি এই করে আল্লা ফু, ইত্তা ফু অথবা অন্য একরকমের দ্রুত ধাবমান অশ্বের গতি নিয়ে হাতে তাজিয়া নিয়ে মেতে যায় তবে নীলু ফিক করে হেসে দেঁবে। সে কি বিশ্বাস করতে পারছে না, নীলু মরে গেছে।

অজু বলল, এস ধরি আমরা। বাইরের বারান্দায় বের করে নিতে হবে।

অজু এবার দেখল কেয়া যে-ভাবে পড়ে আছে নীলুর বুকে মুখ রেখে, কিছুতেই তাকে সরানো যাবে না। কেয়া যে এ-ভাবে পড়ে থাকতে পারে, এবং কেয়া কি বিশ্বাস করতে পারছে না এখনও, সে কি বুকে কান রেখে মৃদু সেই শব্দ, দূরাগত শব্দ, শুনতে চায়, যা সে কিছুতেই পরীক্ষা না করে ছেড়ে দিতে চায় না, আর জব্বার কাকা এখন এই বাড়ির চারপাশে সবচেয়ে সবুজ গাছটি খুঁজে বেড়াচ্ছে, যার কাঠে এই সুন্দর শিশুকে দাহ করা হবে।

অজু বলল, কেয়া।

কোন সাড়া নেই।

—কেয়া ওঠো। ওকে আমরা বের করে নেব।

কেয়া একটুকু সে-জন্য ভাবল না।

মঞ্জু বলল, কেয়া ওঠ। ওকে আমাদের বের করে নিতে হবে।

এত শক্ত মঞ্জু! অজু এবার না দেখে পারল না মঞ্জুকে। সে যেন এবার বেশ সাহস পেয়ে গেল। বলল, তুমি কেয়াকে তুলে নাও। ও ছাড়বে না নীলুকে।

মঞ্জু পাশে বসল কেয়ার। ওর মাথায় হাত বুলাল। নীলু যেন মঞ্জুর কেউ হয় না। অথবা দূর সম্পর্কে একটা আত্মীয়তা আছে, নীলুর যা কিছু সম্পর্ক এই মেয়ে কেয়ার সঙ্গে। অজু ক্রমে বিস্মিত না হয়ে পারছে না। মঞ্জু এত নিষ্ঠুর হতে পারে কি করে। মঞ্জু কেয়াকে এক সময় প্রায় বুকে নিয়ে জড়িয়ে বসল। এবং

মুর্শিদ পায়ের দিকটা, সে মাথার দিকটা ধরে ক্রমে ঘর পার হয়ে, সেই বাঘ ভালুক অথবা হরিণের ছবির পাশ দিয়ে ওকে বারান্দায় এনে রাখল।

তখন একজন মানুষ একটা সবুজ বৃক্ষ বনের ভিতর খুঁজে বেড়াচ্ছে। চারপাশে যা গাছপালা, তাকে বনজঙ্গল বলাই ভাল। কারণ এখন এ-সব গাছপালায় কোন যত্নের ছাপ নেই। অবিনাশ কবিরাজের আমলেই এটা হতে থাকে। বিশেষ করে মঞ্জুর মার আত্মহত্যার পর যেন অবিনাশ কবিরাজ কোন ব্যাপারে তেমন উৎসাহ পেত না। ওদের কবিরাজ বংশ, বাপ ঠাকুরদা একই ভাবে চারপাশ থেকে সব গাছপালা সংগ্রহ করে এনেছে। যেমন অর্জুন গাছ, চন্দন গাছ, দারুচিনি গাছ, হরিতকি গাছ, আমলকি, বয়ড়া যা যা দরকার কবিরাজী মতে সব চারপাশে রয়েছে। এবং নানা-ভাবে সব গাছপালাগুলি একটা কবিরাজি গন্ধ বাড়ির চারপাশে ছড়িয়ে রাখত।

সুতরাং জব্বার তাঁর কাঁধে কুঠার, তিনি সবচেয়ে তাজা এবং সবুজ বৃক্ষ খুঁজছেন। এখানে এসেই কবিরাজ বংশ শেষ হয়ে গেল। এবং একটা ধারা এ-ভাবে যেন নষ্ট হয়ে যায়। কি হবে আর এ-সব দামী দামী গাছ রেখে। কারণ তিনিও তো আর বেশিদিন নেই। কেয়া এবং মঞ্জু আর তিনি, তিনজনের যা আছে ওতে চলে যাবে। কিছু ফসলের জমি রয়েছে কবিরাজ মশাইর, মঞ্জুর শিক্ষকতা আছে, সব মিলে যখন গাছপালার আর দরকার হচ্ছে না তখন, সেই সবুজ গাছটি তাঁর চাই।

আসলে জব্বার এই বাড়ির গাছপালার ভিতর এক মমতার সন্ধান পেয়েছিল। কারণ এত যে অকারণ নিষ্ঠুরতা হয়েছে, এবং চোখের উপর সব দেখেও আল্লার ওপর নির্ভরশীল ছিলেন, কিছু বলতেন না, মঞ্জুকে কারা রাতে নিয়ে যেত, সকালে দিয়ে যেত, ঠিক এমনি

প্রথম দিকে কেয়া, এবং কেয়াকে নিয়ে পালালে যেন বদলি হিসাবে মঞ্জু, কোথায় কি হত তিনি জানতেন না, তিনি যেহেতু ঈশ্বর বিশ্বাসী মানুষ, এবং এটা যেন এ-বাড়িতে আশ্রয় পাবার পর বেশি করে ধারণা হয়েছে, যখন কেউ আশ্রয় দিতে ভয় পাচ্ছিল, তখন এক মশাই, কবিরাজ মশাই ডেকে বললেন, এবার থেকে এখানে, ব্যাস এখানে—আর কোথাও যাওয়া হল না। যেন কবিরাজ মশাই ওকে বলেছিলেন, চারপাশে দ্যাখো জব্বার কত গাছপালা। আমার পূর্বপুরুষরা এনে লাগিয়েছে। একটা বড় জাবদা খাতা খুললে সব পেয়ে যাবে, কবে কোথা থেকে এ-সব গাছ আনানো হয়েছে, কোনটা বাঁচে নি, কোনটা বড় হতে হতে মরে গেছে, কোন গাছ বুড়ো হয়ে মরে গেছে সব হিসাব আছে জাবদা খাতায়। আমার তো এখন এ-সব লেখা হয় না, তুই তবু গাছপালাগুলো দেখাশোনা কর। কোনটা কবে মরছে তার হিসাব দরকার হবে না। কিভাবে সব বেঁচে থাকে তাই দেখলে হবে।

প্রথম তিনি এ-সবই শুনেছিলেন, অথবা অন্য কিছু হতে পারে। তবে বনের ভিতর একটা তাজা গাছ খুঁজতে গিয়ে আর কিছু মনে করতে পারছেন না। কারণ অষুধ বানানোর কাজটা বোধ হয় তিনি পরে পেয়েছিলেন। আগে এই সব গাছপালার ভিতর এত বেশি কাজ করেছেন যে, সেই অকারণ নিষ্ঠুর দিনগুলোতেও কেউ একটা গাছের ডাল ভেঙ্গে নিলে প্রাণে বড় লাগত। কারণ এখানে আছে প্রচুর বাসকের জঙ্গল, শেফালী গাছ, আনারসের গাছ, গাছের মূল, কেউ কাঁচা হলুদ চুরি করতে এলে ঠ্যাঙ ভেঙ্গে দেবার জন্য ছুটতেন তিনি। কেউ একটা আমলকি, গাছের নিচে পেলে বিশ্বাস হত না, আমলকি গাছতলায় পড়ে থাকতে পারে। ওর চোখকে ফাঁকি দিয়ে একটা আমলকি পড়ে থাকবে ওর বিশ্বাস হয় না। কেউ কিছু নিলেই ওর ভীষণ কষ্ট হত। অর্জুনের ছাল কেউ চুরি করে তুলে নিলে সে তেড়ে যেত। অথচ সকালে একটা

জিপ এসে মঞ্জুকে রেখে গেছে। কেয়াকে পালিয়ে রাখতে হচ্ছে বনে জঙ্গলে। আর মানুষটা তবু গাছপালা পাহারা দিয়ে বেড়াচ্ছে।

বোধ হয় এ-ভাবে বোঝা যায়, মানুষটার এইসব গাছপালার জন্য একটা ভীষণ মায়া আছে। তবু কত অধীর শোকে, বোঝা যায়, কারণ তিনি সব চেয়ে তাজা গাছটা খুঁজছেন। কি হবে সব রেখে, এবং নীলুর সৎকার শেষে ওঁর মনে হয় এক এক করে সব গাছপালা কেটে ফেলা ভাল। এখানে একজন কবিরাজ বংশ কবে থেকে আবাস তৈরী করেছিল, এখন সে আবাস ছিন্ন ভিন্ন। এবং সে প্রায় শেষদিকে পাহারাদারের কাজ করে গেছে, কোন ফল লাভ হয়নি। নীলুকে সে রক্ষা করতে পারেনি। ঈশ্বরেব পৃথিবীতে মানুষ না থাকলে এই বনভূমির যেন কোন মানে থাকে না। ওর ইচ্ছা সে-জন্য অন্তত নীলুর সৎকারে সব চেয়ে নামি এবং দামী গাছটা কাজে লেগে যাক।

এই যে পুকুর পাড়, সর্বত্র যে গাছ তার ভিতর বোধ হয় এখনও একটা চন্দন গাছ আছে। তাব ডালপালা বাড়ছে। অনেক আয়াসে জব্বাব এটা বাঁচিয়ে রেখেছেন। এখানকার আবহাওয়ায় এ-সব গাছ টেকে না। বর্ষাকালে জলে ডুবে যায় চারপাশ, সেজন্য পুকুরের পাড খুব উঁচু করে বাধানো। তার পারে, এবং একটা নিরিবিলি জায়গায় গাছটা আছে বলে বোধ হয় বেঁচে আছে। তার চাবপাশে অন্য কোন গাছ নেই। এমন কি কোন বড় গাছও নয়। তবু ও-গাছের ডাল বাখা যায় না। একটু বড় হলেই চুরি হয়ে যেত। জব্বার ভীষণ হিসেবী মানুষ। কেউ গাছটার খবর না পায়। এ-জন্য তিনি চারপাশে বেত ঝোপ তৈরী করেছিলেন। ওটা ডিঙ্গিয়ে যায় মানুষের সাধ্য কি।

সুতরাং ও-গাছটাই জব্বার কাকার পছন্দ। একটা আম-গাছও লাগবে। আমগাছের ডাল যত ভিজে হোক ধরে গেলে জ্বলতে থাকে। এ-নিয়ে পাঁচ সাত বার তিনি এটা দেখেছেন।

প্রমাণ পেয়েছেন তার চেয়েও বেশি। কবিরাজমশাই শেষ বয়সে খুব ভুগে মারা গেছেন। এবং শরীরে জল জমে গিয়েছিল। শুকনো কাঠ ঘরে থাকে না, যে কবে কে মরবে, ঘরে কাঠ থাকবে। তার ওপর বর্ষাকাল তখন, অথচ কি সুন্দর আমকাঠে অবিনাশ কবিরাজের শরীর জ্বলে ছাই হয়ে গেল।

ডাকবাক্সে যারা চিঠি ফেলতে এসেছিল, ওরা দেখল, বারান্দায় নীলুর শরীর সাদা চাদরে ঢাকা। ওরা জানত, এ বাড়িতে সুন্দর একটি ছেলে সবসময় ধবধবে বিছানায় শুয়ে থাকে। অনেকদিন ওরা জানালা দিয়ে ওর সঙ্গে কথাও বলে গেছে। কথা পেলে নীলু আর কিছু চাইত না। বাইরের পৃথিবী ওর কাছে স্বপ্নের মতো ছিল বোধ হয়। আর ওরা ছিল নীলুর কাছে আশ্চর্য জগতের মানুষ। সে জানালায় বসে বসে অনেকদিন দেখেছে সামনের মাঠে জল থৈ থৈ করছে সে দেখেছে, কত নৌকা, পাল তোলা নৌকা খালে নেমে যাচ্ছে। সে দেখেছে, দূর থেকে একটি বাস আসছে, তারপর বাড়ির পাশ দিয়ে নীল রঙের বাসটা চলে গেল। সে ঠিক টের পায় কখন ডাকঘরের দরজা খোলা হবে। কখনও কেয়া কোলে করে বারান্দায় বসালে সে যেন রাজা হয়ে যেত। সব পাখীরা যেন বুঝতে পারত, একজন দুঃখী ছেলে বারান্দায় বসে আছে। ওরা চার পাশে এসে বসত। ওদের সঙ্গে নীলু ভীষণ গল্প করতে ভালবাসত। কোন কিছুই নীলুর কাছে সাধারণ মনে হত না। যেন নীলু না জন্মালে এই যে সব গাছ পালা পাখি, অথবা উত্তরের বড় বটগাছটা, দক্ষিণের বড় অর্জুন গাছটা, গাছটার নিচে ঘোড়া ঘাস খাচ্ছে, ডাকঘরে চিঠির ওপর খটখট শব্দে ছাপমারা ক্রমাগত, সবই অর্থহীন। নীলু আছে বলেই সব কিছু চারপাশের প্রাণ পেয়ে যেত। একটা জগৎ নীলু এখানে তৈরী করেছিল, আজ থেকে সে জগৎটা আর চারপাশে থাকবে না।

ক্রমে উঠোনে ভিড় বাড়ছিল। খবর হলে যা হয়, চার পাশের গ্রাম থেকে যেই ডাকঘরে খবর নিতে এসেছিল তারা আর যেতে পারল না। ওরা কবিরাজ মশাইর শেষ বংশধরকে দেখতে পাচ্ছে, নিঃশেষ হয়ে গেছে। ওরা ভেবে পেল না, এরপর এতবড় বাড়ি, কবিরাজী অষুধের প্রয়োজনে যে বনের গোড়াপত্তন, তার আর থাকার অর্থ কি।

ওরা কেউ বলল, গেল। আর কি মঞ্জুদি এখানে থাকবে?

কেউ বলল, গ্রামের শেষ হিন্দু বাড়িটি নিঃশেষ হয়ে গেল।

কেউ বলল, আসলে এ-ভাবে সব কিছু ওর শেষ হবার মুখে। কেউ কিছু করতে পাবে না।

কেউ বলল, কোনটা ঠিক কোনটা ঠিক না আমরা জানি না।

—তার মানে?

—মানে এই যে সেই কবে থেকে আমাদের বিতাড়ন পর্ব শুরু হয়েছিল, কেবল ঘর ছাড়া হয়েছে সবাই, কেউ ফিরে আসেনি।

—কেউ ফিরে না এলেও, কিছু শূন্য থাকে না।

—শূন্য থাকে না, কিন্তু বৈচিত্র্য নষ্ট হয়। এবং এই যে দুনিয়া আল্লা বানিয়াছেন, ওটার ভিতর এক ঘেয়ে বলে কিছু নেই। আমরা লাঠালাঠি করে ওটাকে এক রকমের বানাতে চাইছি।

তখন একজন বলল, আরে ওটা মুর্শিদ না?

—কোনটা।

—ঐ যে ধুতি পরে আছে।

—মুর্শিদ ধুতি পরবে কেন। মুর্শিদ তো শুনেছি নিখোঁজ। কবে থেকে সে ভেগেছে, তাকে তুই কি করে ধুতির ভিতর ন' মাস পর দেখে ফেললি।

সে কেমন লজ্জা পেল। সত্যি, মুর্শিদ তো একবারে পাকা মুসলমান, ও ওটা কিছুতেই পরতে পারে না। সে একেবারে আহাম্মকের মতো কথা বলে ফেলেছে। কট্টর পাকিস্তানী, শালা হিন্দু বাঙ্গালীর পোশাক মরে গেলেও পরবে না।

সুতরাং ওরা ঠিক করে ফেলল, দেখতে হুবহু মুর্শিদ হতে পারে, নিশ্চয়ই মঞ্জুদির বাড়িতে কেউ এসেছে। ও তো বড় ঠাকুর কিরণ রায়ের ছেলে, ওর বন্ধু হবে, ওরা দেশভাগের পর আর আসেনি। এখন বেড়িয়ে যাচ্ছে। দেশের কলাটা মূলোটা খেতে এসেছে।

একজন বলল, সব নিয়ে যাবে। মালের দামতো চড়ে গেল। এবার থেকে আর মাছ খেতে হবে না। সব হিন্দুস্তানে। তোমরা কচু খাবে।

—সব চলে যাচ্ছে, পাট চা মাছ। তোমরা পাচ্ছ দুধ, নকল কয়লা।

—নকল কয়লা!

—আরে ও দেশে যা কেউ কেনে না। তোমরা সে সব পাবে।

এ-সব যদিও এখন অর্থহীন কথা তবুও ভিড়ের মানুষেরা কেউ কেউ এ-সব না বলে থাকতে পারল না। কেয়াকে মঞ্জুদি মানুষ করেছে, এটাও এখন কেমন যেন ঠিক মনে হচ্ছে না। এখনতো এদের স্বাধীনতা, কেউ ওদের কেশাগ্র ছুঁতে পারবে না। একেবারে আঙুল ফুলে কলাগাছ।

আর এ-ভাবে মুর্শিদ আর মুর্শিদ থাকল না। এমন কি মনে হয় অঞ্জু যদি বারান্দায় দাঁড়িয়ে বক্তৃতা আরম্ভ করে দেয়, বলতে থাকে, দ্যাখুন, এই যে মানুষটাকে দেখছেন এর নাম মুর্শিদ, এ একজন পাকিস্তানী সৈনিক, আত্মসমর্পণের আগে ডেজার্টার হয়েছে। এবং জানেন মঞ্জুর সঙ্গে একটা মোহব্বতের ব্যাপার আছে, তাই এখানে চলে এসেছে। ধুতি পাঞ্জাবি পরেছে বলে ভুল করবেন না।

কিন্তু তখন যেন হৈ চৈ, লোকটা বলছে কি, ভাবা হয়েছিল, লোকটা ম্যাজিক-টেজিক দেখাবে, না ওঠে পাগলের মতো উল্ট পাল্টা বক্তৃতা। একজন মানুষকে মুর্শিদের নামে এখানে ধরিয়ে দিতে চাইছে। ঠিক শালা এখানে এসে মধু যাপনে

ভাগাভাগিতে পড়ে গেছে। ষড়যন্ত্রটা শালার মাথায় পাকা। ওকে ধরিয়ে দিতে পারলে বেশ কবরেজ মশাইর মেয়েকে চিবিয়ে খেতে পারবে। ও আমরা হতে দিচ্ছি না মশাই। যতই মুশিদ বলে ওকে চালাবার চেষ্টা করুন না কেন!

আর তখন কুঠারের শব্দ আসছে। জব্বার চন্দন গাছটা কেটে ফেলছে।

ওরা দুজন, অর্থাৎ অজু আর মুশিদ বসে আছে দুপাশে। নীলুর মাথার কাছে মুশিদ, পায়ের কাছে অজু, পাশে কেয়া। আরও সব মানুষ জন ক্রমে ঘিরে ফেলেছে। চারপাশে তারা আছে। সিঙপাড়া থেকে নৌকা করে এসেছে ছেলে বুড়ো, বউ ঝি সবাই। ওরা এখন এ-বাড়ির চার পাশে নানারকম কাজের ভিতর ভিড়ে গেছে। মঞ্জুর ভীষণ উদাস চোখ। সে বসে রয়েছে একটু দূরে। ও যেখানে বসে রয়েছে, সেখান থেকে নীলুর কিছুই দেখা যায় না।

জব্বার যাদের নিয়ে কাঠ কাটছিল তারা খুব সহজে ফালা ফালা করে ফেলেছে গাছটাকে। চন্দনের কাঠে কিছুক্ষণ পর নীলু শুয়ে থাকবে। সব নিয়ম কানুন জব্বার জানে। কারণ এ-বাড়ীর অবিনাশ কবিরাজের স্ত্রী বা অবিনাশ কবিরাজ নিজে এবং অবনী ওর হাতে গেছে। সে জেনে ফেলেছে, কি কি দরকার। সে এখন যারা এসেছে, যেমন সিঙপাড়ার বয়সী বৌটিকে সব বলে যাচ্ছে। ওরাই কাজ করে যাচ্ছে। ওদের অবশ্য কেয়াকে নিয়ে একটা বিরোধ আছে। ওরা চাইত না কবিরাজ মশাইর জিদ এমন ভাবে ধর্মবোধকে আঘাত করুক। তবু বিপদের মুখে মানুষের ধর্মাধর্ম থাকতে নেই। খুব মহৎ কিছু ওরা করে যাচ্ছে, এসে উদ্ধার করে দিয়েছে এমন একটা ভাব চোখে মুখে রয়েছে। তাছাড়া যতই এখন আঙ্গুল ফুলে কলাগাছ হোক এ-নিয়ে বাড়াবাড়ি করতে সাহস পাচ্ছে না।

এ-ভাবেই মনুষেরা বোধ হয় হেঁটে থাকে। সেই আদিম

কাল থেকে নিজেদের ভিতর এক অসীম গণ্ডিবদ্ধভাব, নিজেদের ছাড়া অন্য সব ভুল, ঠিক না, এ-যে সে তার নিজের দেশ মাটি এবং গাছপালাকে পর্যন্ত অবিশ্বাস করতে আরম্ভ করেছে। এটা এখন যদিও ওদের ভাববার সময় নয়। কারণ মঞ্জুর দুঃখে সবাইকে খুব কাতর দেখাচ্ছে। যে সবচেয়ে কাতর, সেই মেয়ে কেয়া, তার জন্য কেউ ভাবছে না। মঞ্জুকে বুদ্ধিমতি মনে করার কারণ থাকতে পারে, সে তার দুঃখকে কেয়ার সঙ্গে ভাগ করে নিয়েছে।

যেমন মুর্শিদ এখন কিছুতেই ভাবতে পারে না, সে এদের কেউ নয়। সে যতই চেষ্টা করুক, সে কিছুতেই ভুলতে পারবে না নীলুর সে আত্মীয় ছিল না, মঞ্জুর সে কেউ নয়। এবং কেয়া যতটা কাছের সে তার চেয়ে কম কাছের কিছুতেই প্রমাণ করতে পারবে না। এসব দুঃখ মুর্শিদের মুখ চোখ দেখলে বোঝা যায়। সে যে গোপনে সহস্রবার চোখের জল মুছছে। নীলুর কথা মনে হলেই, সে তখন যেখানেই থাকুক, কোন মরুভূমির ক্যাকটাসের নিচেও যদি দাঁড়িয়ে থাকে সে না ভেবে পারবে না, এক সুন্দর শৈশবকে সে দাঁড়িয়ে নিজের হাতে দাহ করেছে।

অজু কেয়ার দিকে তাকালে দেখল, এক রাতে মেয়েটা কি অস্বাভাবিক বদলে গেছে। সেই দরজায় দাঁড়িয়ে বলা, আপনি কাপুরুষ মশাই, আজ এখন সেটা বিশ্বাস করতে পর্যন্ত কষ্ট হচ্ছে। কেয়াকে ভীষণ পবিত্র লাগছে দেখতে। শোকের সময় মেয়েদের ভীষণভাবে পবিত্র দেখায়। সে তো এই যে ছেলে নীলু তার জন্য ভিতরে তেমন কোন কষ্ট পাচ্ছে না। বরং যা কিছু কষ্ট মঞ্জুর জন্য। মঞ্জুর কোন অবলম্বন থাকল না। মঞ্জু একা নিঃসঙ্গ আর এমন একটা নিরিবিলি গ্রামে মঞ্জু বাকি দিনগুলো কাটাবে কি করে। সে যতই দেরি করে যাক, দশ পনের দিনের বেশি থাকতে পারছে না। কাজ কর্ম শেষ হলেই সে না হয় যাবে, মঞ্জু কি তখন ওকে কিছু বলবে, বলবে, অজুদা আমার কি হবে।

তা ছাড়া অজুর যে দুঃখটা এখন ভিতরে সেটা কেয়ার জন্য। কেয়া নীলুর জন্য এমন একটা মায়া বুকের ভিতর গড়ে তুলেছে বিশ্বাসই করতে পারে না। মেয়েটার মা নেই, বাবা কোন কিছু দেখে না, মঞ্জুর অভিভাবকত্বে এ বাড়িতে বড় হচ্ছে। আর এই মেয়েটা ভিতরে ভিতরে এত বড় হয়ে গেছে যে মঞ্জুও বোধ হয় জানে না। মঞ্জু এ-ভাবে কোনদিন ওকে কথা বলেনি। সামান্য পরিচয়ে কত কাছে আসতে পারে সেটা সে এখন নীলুর সাদা রক্তহীন ঠাণ্ডা শূন্যতার ভিতর প্রত্যক্ষ করে কেমন কেঁপে উঠল।

সে বলল, কেয়া তুমি বড় হয়েছ। কথা ছিল নীলুর যে অসুখ, সে কখনও বাঁচতে পারে না। এটা মানুষেরই অসুখ। আমরা এ অসুখটাকে নিরাময় করার এখনও কোন ওষুধ আবিষ্কার করতে পারিনি। তুমি সবই জানতে। এখন বেশি বলারও দরকার করে না। মানুষ এ ভাবে মরে যায়। তুমি কাঁদলে মঞ্জু শক্ত থাকবে কি করে। একবার মঞ্জুকে দ্যাখো। আর বলার সঙ্গে সঙ্গে মনে হল সে খুব হাস্যকর কথা বলে যাচ্ছে। এ সব সময়ে এমন কথার কোন মানে হয় না। সে তারপর বলল, এস আমরা নীলুকে অর্জুন গাছের নিচে নিয়ে যাই। ওকে সেখানে দাহ করা হবে, তার জায়গাটি তুমি ঠিক করে দাও।

বোধ হয় অজু এ-ভাবে কেয়াকে অন্যমনস্ক করতে চাইছিল। কারণ এখন ওদের অন্যমনস্ক করার দরকার আছে। জীবন এত অর্থহীন হয়ে গেছে যে কেয়ার চোখ না দেখলে বিশ্বাস করা যায় না, কেয়াকে স্বাভাবিক রাখার দায়িত্বকে অত্যন্ত জরুরী বলে ভেবে নিলে দেখল, মঞ্জুর চোখ শূন্যতায় ভরা। এ আরও কঠিন ব্যাপার। সে ভিতর থেকে কেন যে সায় পাচ্ছে না, মঞ্জুর জন্য সে তেমন কেন যে ভাবতে পারছে না। এবং এটা সে ভীষণ নিষ্ঠুরতার সামিল ভাবল।

আর তখনই চন্দনের কাঠ, আমের কাঠ কারা নিয়ে যাচ্ছে মাথায় করে। মঞ্জু দেখছে সব। অজুর মনে হল, এ-সময় মঞ্জু

হয়তো কাঁদতে পারে। না, কিছুই হচ্ছে না। মঞ্জু বরং যতক্ষণ ওরা কাঠ বয়ে নিয়ে গেল ততক্ষণ তাকিয়ে থাকল। কাছে যে নীলু আছে, সে যে শুয়ে আছে সাদা বিছানায়, ওর চোখ দুটো যে বোজা, সে যে ঘুমিয়ে আছে দেখলে মনে হয়, তার সে যেন কিছুই জানে না। এমন কি এখন মনে হচ্ছে নীলুর মৃত্যুর পর ওর মুখ মঞ্জু দেখেনি। অবনীর মুখই হয়তো বার বার মনে পড়ছে। এবং শক্ত সামর্থ মানুষ অবনী জোরজার করে কিছু করে ফেলার ভিতর যে নিষ্ঠুরতা আছে তা ভেবে সে আরো নিষ্ঠুর হয়ে যাচ্ছে।

অজু বলল, মুর্শিদ আপনিও দেখছি ভেঙ্গে পড়ছেন। এ-ভাবে ভেঙ্গে পড়লে চলবে কেন। মঞ্জুকে দ্যাখুন। সে কিন্তু কাঁদছে না।

মুর্শিদ বলল, ওকে কিছু বলতে পারি। আমার তেমন সাহস নেই।

অজু বলল, একমাত্র আপনিই বলতে পারেন।

মুর্শিদ বলল, আমি জানি, বললে হয়তো কাজ হবে। কিন্তু আমার ভীষণ ভয় হয়।

—কি ভয়।

—মঞ্জু চারপাশের মানুষদের এখন খুন করতে পারে। আমাকেও।

—কি বলছেন।

—তাই।

– মুর্শিদ আপনি ঠিক বলছেন না।

—আমি ঠিক বলছি অজুবাবু। সে ফিস ফিস করে বলেছিল। সে বলল, সে সব মানুষকে তার দুঃখের জন্য দায়ী ভাবছে, সবাই তার শত্রু। এমন কি ঈশ্বরও। আমি অথবা মেজর কেউ এখানে তার শত্রু নয়। আপনি ওর বড় শত্রু।

অজু এখন কি বলবে ভেবে পেল না। কিন্তু এ-ভাবে বসে

থাকলে মঞ্জু পাগল হয়ে যেতে পারে। সেই মেয়েটা, যে জীবনে নানাভাবে স্বপ্ন দেখেছে, যে সাদা ঘোড়ায় চড়ে জ্যোৎস্না রাতে মাঠে বের হয়ে গেছে, গায়ে থাকত আশ্চর্য রঙ্গিন ফ্রক, জ্যোৎস্নার সঙ্গে ফ্রকের রঙ ঘোড়ার রঙ এমন ভাবে মিশে থাকত যে সহসা খুব কাছে না এলে বোঝাই যেত না, ঘোড়ায় চড়ে মঞ্জু আসছে, চোখে তার কত সুন্দর স্বপ্ন। মানুষ বড় হতে হতে কিছুটা হারায়। কিন্তু মঞ্জু সব হারিয়েছে। এবার তারও কেমন মঞ্জুর চোখ দেখে ভয় ধরে গেল। যেন সে পালাতে পারলে বাঁচে।

অঞ্জু বলল, তবু আপনি কিছু বলুন।

মুর্শিদ এবার উঠে গিয়ে ওর পাশে বসল। বলল, এদিকে এস

—কোথায় ?

—তুমি নীলুর পাশে বসবে।

মঞ্জু খুব ভাল মেয়ের মতো উঠে গিয়ে বসল।

মুর্শিদ নীলুর মুখের কাপড় সরিয়ে দিল, বলল, কি মায়াবী মুখ।

মঞ্জু নীলুর মুখটা আঁচল দিয়ে মুছিয়ে দিল। ওর চোখে সামান্য পিচুটি লেগে আছে, মঞ্জু আঁচল দিয়ে তাও সাফ করে দিল।

কাল নীলুকে এ-সময় আমি কত রকমের খেলা দেখাচ্ছিলাম।

মঞ্জু খুব স্বাভাবিক গলায় বলল, তোমাকে সে বোধ হয় সব চেয়ে বেশি ভালবাসত মুর্শিদ।

মুর্শিদ তাকাল অঞ্জুর দিকে। আর কি বলা যায়। সে ভেবে পেল না আর কি বলা যায়।

অঞ্জু পাশে গিয়ে বসল, মঞ্জু তুমি যেমন সাদা ঘোড়ায় চড়তে ভালবাসতে, নীলু বলেছিল, সে ভাল হলে ঠিক তোমার মতো সাদা ঘোড়ায় চড়ে বেড়াবে।

মঞ্জু বলল, আমাদের শৈশব এ-ভাবে আরম্ভ হয়। তারপর যত বড় হই তত সব ভেঙ্গে যেতে থাকে।

অঞ্জু হতবাক। কোন দুঃখ বোধ যেন কাজ করছে না মঞ্জুর। মঞ্জুর কেমন দার্শনিক গলা।

মঞ্জু এবার সামান্য হেসে বলল, তোমরা আমাকে কাঁদাতে চাইছ। পত্রশোকে কাঁদছি না, এটা তোমাদের খুব খারাপ লাগবে। খুব মর্মান্তিক। আমি কিন্তু ভাবছি নীলু মরে গিয়ে বেঁচে গেল। চোখের ওপর ওর দুঃখ আমি দেখতে পারতাম না।

সুতরাং মুর্শিদ আর অঞ্জু আবার নীলুর পা এবং মুখ ঢেকে দিল। মঞ্জু তেমনি সব কাজকর্ম ভীষণ উদাসীন চোখে দেখে যাচ্ছে। অঞ্জু বলল, মঞ্জু নতুন কাপড় লাগবে।

জব্বার কাকা অলিপুরার বাজারে লোক পাঠিয়ে দিয়েছে। পঞ্চমীঘাট থেকে ভটচার্যি মশাইও আসছেন। তিনি না এলে কিছু হচ্ছে না।

সব শেষেও বুঝি থেকে যায় মানুষের ধর্মাধর্ম। নীলুর কাজ কর্মে সব ঠিকঠাক হচ্ছে কি না জব্বার কাকা পর্যন্ত ভাবছেন। মঞ্জু এটা ঠিকঠাক না হলে ভাববে, কেউ কিছু দেখছে না। ওব মন ভীষণ খুঁত খুঁত করবে। সব রকমের মন্ত্র উচ্চারণের ভিতর নীলুর শরীর পঞ্চভূতে মিশে যাবে। নীলু যেখানে ছিল, অর্থাৎ যে সূর্য আপন মহিমায় কিরণ দেয়, যে জ্যোৎস্না আপন মহিমায় গাছপালার ভিতর কুয়াশার মতো ভেসে থাকে, সেখানে যেন একটা আলাদা নীলুর ঘর ছিল, নীলু সেখান থেকে এসে কোন এক পুকুরে চন্দন গাছের নিচে টুপ করে বুঝি নেমে পড়েছিল। এ-ছাড়া নীলুকে আর কেউ কিছু বুঝি ভাবতে পারছে না।

কেয়া বাগান থেকে সব ভাল গোলাপ তুলে নিল। গোলাপ লাল রঙের চেয়ে সাদা রঙের পছন্দ ছিল নীলুর। সাদা গোলাপ ওর বিছানার পাশে রাখা হল। মঞ্জু নিজে ছেলেকে সাজিয়ে দিচ্ছে। স্নান করানো হল। ওর কপালে চন্দনের ফোঁটা, ওকে পরিয়ে দেওয়া

হল গরদের জোড়। ওর হাত দুটো বুকের ওপর এনে রাখা হল, ঠিক প্রার্থনার মতো। অজুর এ-সব পছন্দ হচ্ছে না। ধর্ম মানুষকে অনেক দেয়, আবার তার চেয়ে বেশি কেড়ে নেয়। সব কিছুর মূলে এই মানুষের ধর্ম। কিন্তু তখন যেন মঞ্জু চোখ উঁচিয়ে প্রশ্ন করতে থাকে, অবনী তবে কি ! ·সে কেন চন্দন গাছের নিচে...মেজর অথবা মুর্শিদ ওরা তো বিধর্মী মানুষ, ওদের কথা ছেড়ে দেওয়া চলে, কিন্তু তুমি, তুমি কি! তুমি তো কোন খোঁজ-খবর পর্যন্ত নিলে না! তুমিতো আরো ভয়াবহ !

অজু কিছুতেই আর সাহস পায় না কিছু বলতে। মঞ্জুর ইচ্ছা মতোই সব হোক। ওরা নীলুর খাট বের করে আনল, খাটের ওপর শোওয়ানো হল ফের। তারপর সবাই মন্ত্র উচ্চারণ করতে করতে যে অর্জুন গাছটা আছে তার নিচে নিয়ে রাখা হল। সামনে খাল, সেন বাবুর শ্মশানে মন্দির, ঠিক মন্দিরের চাতালের পাশে, মঞ্জুর মাকে রাখা হয়েছে, আর একটু পাশে নীলুর জন্য জায়গা করা হচ্ছে, এবং তার পাশে, মঞ্জু জায়গা করে রাখবে নিজের জন্য—সে ঘুরে ফিরে তদারক করতে থাকল।

প্রথম আমের কাঠ ঝিলের নিচে পাট কাঠি, তারপর চন্দনের কাঠ। তারপর নরম শরীর নীলুর। তাকে উবু করে শুইয়ে দেওয়া হয়েছে। এখন দেখলে মনে হবে নীলু কোন যুদ্ধক্ষেত্রের মৃত সৈনিক। ওর মুখ থেকে লালা পড়ছিল। আর তখুনি আগুন দেওয়া হবে, কিন্তু মঞ্জু কেমন পাগলের মতো ছুটে গেল! অজু ওকে ধরার পর্যন্ত সময় পাচ্ছে না। সে ছুটে গিয়ে সেই চিতার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। আর নির্মল চিতায়, আগুন তখনও ভাগ্যিস জ্বলেনি, মঞ্জু আঁচল দিয়ে নীলুর মুখ পরিষ্কার করে দিচ্ছে।

এমন দৃশ্য কেউ সহ্য করতে পারে না। জব্বার কাকা যে কখনও চোখের জল ফেলেনি, যে খোদা ব্যতিরিকে দুনিয়াতে আর কাউকে ভয় পায় না, যে মানুষ চোখের ওপর দেখেছে, কেয়াকে মিলিটারি জিপে কোথায় নিয়ে যাওয়া হচ্ছে, কিছু বলেনি, এমন কি খোদার

কাছে নালিশ জানায়নি পর্যন্ত, সেই মানুষ দাঁড়িয়ে হাউ হাউ করে কাঁদছে। লম্বা সাদা দাড়ি, খোপকাটা লুঙ্গি পরেছেন, লম্বা জোব্বা গায়ে, ঠিক ফকির মানুষের মতো মুখ, সেই মানুষ হাউ হাউ করে কাঁদতে থাকলে চার পাশে যারা ছিল সবাই কেমন মুহ্যমান হয়ে গেল।

মঞ্জু দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে শুধু দেখল। সে এ-ভাবে তার মাকে পুড়ে যেতে দেখেছে, সে বাবার শরীর পুড়ে যেতে দেখেছে, চোখের সামনে অবনী গেছে, এবারে নীলু। এবং সে তখন আর মনে করতে পারে না কোনো কালে এই সব গাছ-পালায় সাদা জ্যোৎস্না ছিল, সাদা ঘোড়া ছিল ওদের, সাদা সার্টিনের সে ফ্রক পরতে ভালবাসত, সে কখনও রাতে অথবা বিকেলে সাদা ঘোড়ায় চড়ে বেড়াত। একদিন ঘোড়ায় চড়তে না পারলে, সে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদত। তার কাছে সে দিনটি ছিল সব চেয়ে দুঃখের। নীলু পুড়ে যাচ্ছে। ক্রমে শরীরের রক্ত বিবর্ণ হয়ে যাচ্ছে। তারপর চারপাশের আগুন ঘিরে ফেললে নীলুর সুন্দর শরীর সহসা চোখের ওপর অদৃশ্য হয়ে গেল। সবাই দেখতে পাচ্ছে, মঞ্জু বাড়ির দিকে হাঁটছে। সে জানে আর কখনও নীলুকে দেখতে পাবে না, নীলু কখনও তাকে মা ডাকবে না। সে এখন একা, পৃথিবীতে এমন নিঃসঙ্গ মানুষ কে আছে তার জানা নেই।

অজু বলল, কেয়া তুমি যাও। ওর সঙ্গে থাক।

কেয়া বলল, আপনি যান। কিছু করে ফেললে আমি সামলাতে পারব না।

অজু মুর্শিদকে বলল, আপনি যান।

মুর্শিদ বলল, আমার সাহস নেই আগেই বলেছি।

অজু বলল, আমি গেলে এদিকে… ?

—আমরা সবাই আছি।

সুতরাং অজু পিছনে দৌড়ে গেল মঞ্জুর। ডিসপেনসারি ঘরটার পাশে এসে সে ডাকল, মঞ্জু কোথায় যাচ্ছ!

—কোথাও না!

—কোথাও না মানে!

—আমি আর সহ্য করতে পারছি না অজু।

—আমার সঙ্গে এস। এই প্রথম যেন অজু ধমকের সুরে কথা বলল মঞ্জুকে।

—কোথায় যাব ?

—এস না।

ওরা গিয়ে বসল অশোক গাছটার নিচে। দেশ-ভাগের আগে গাছটা ছিল চারা গাছ। এখন ডালপালা মেলে ডিসপেনসারি ঘরের ওপর বড় ছায়া ফেলেছে। ওরা গাছটার নিচে বসে থাকল। দূরে দেখতে পাচ্ছে, আগুন আকাশের বুকে উঠে যাচ্ছে, ধোঁয়া আরও ওপরে। তার ভেতর লুকিয়ে আছে নীলু। প্রার্থনার ভঙ্গীতে ছিল। উবু করে রাখা হয়েছে বলে, মনে হয়, সে আকাশের দিকে পিঠ দিয়ে রেখেছে।

ওরা কেউ কোন কথা বলছে না। শোকের সময় টুকরো টুকরো শৈশবের ছবি ভেসে আসতে থাকে। অজু পাশে রয়েছে, মঞ্জু কবে অজুকে প্রথম দেখেছিল, দেখে ভীষণ ভাল লেগে গেছিল, সেও যেন মনে করতে পারে। কি দিন ছিল, এ-ভাবে দিন তার শেষ হবে সে স্বপ্নেও ভাবেনি।

অজু বলল, মঞ্জু তুমি এবার কি করবে ?

কি করব জানি না।

যদিও অজু জানে এ-সব কথা এখন বলার সময় নয়, তবু সে জানে মঞ্জু দশটা মেয়ের মতো আর নেই। সে হাসতে হাসতে নিজের ফাঁসি গলায় ঝুলিয়ে দিতে পারে এখন বুঝি। কোন আঘাতই বুঝি তার কাছে আর আঘাত নয়। সে হাসতে হাসতে কাল কি হবে, পরশু সে কি করবে বলে দিতে পারে। অজু এ-ভাবে ওকে অন্যমনস্কও করতে চেয়েছিল। গোল গোল চশমার ভিতরে বড় বড় চোখ মঞ্জুর ক্রমে কেমন রক্তহীন হয়ে যাচ্ছে। লক্ষণ ভাল না বলেই সে বলল, মঞ্জু, তোমার এ-ভাবে একা এখানে থাকা আর ঠিক হবে না।

অজু জানে বোকার মতো এখন সে কথা বলছে। মঞ্জু কোন কথাই শুনছে না। কেমন তাকিয়ে আছে আগুনটার দিকে। ওরা দুজন পাশাপাশি রয়েছে। সেই শৈশবে ওরা যেমন অনেক দূরে চলে যেত, অর্থাৎ অনেক দূর বলতে আস্তনাসাবের দরগা, তারপর মাঠ, ওরা ঘোড়ায় চড়ে দূরে বলতে ততদূর যেতে পারত। ওরা সেখানে বসে কতদিন সূর্যাস্ত দেখেছে। দুই বালক-বালিকার হাঁটু মুড়ে সূর্যাস্ত দেখা, সাদা ঘোড়াটা তখন ঘাস খাচ্ছে এবং নীল রঙের সব মটর আর কলাইফুল মাঠময়, শীতের বাতাস আসছে উত্তর থেকে, ভাবা যায় না নীল রঙের আকাশের নিচে এমন একটা কৌতূহল পৃথিবীতে কখনও জন্মাতে পারে—ওরা সূর্যাস্ত দেখতে দেখতে কতরকমের যে অর্থহীন কথা বলত।

আসলে ওদের মনে তখন একটা কথাই জাগছে। এই যে শরীরে রোমাঞ্চ জাগছে, তোমাকে দেখলে আমার ভীষণ ভাল লাগে, জানালায় দাঁড়িয়ে থাকতে ইচ্ছে করে—এমন হয় কেন। ওরা এ-সব প্রশ্ন সোজাসুজি বলতে পারে না। নানাভাবে, কি সুন্দর ফুল ফুটেছে ছাখো, কি সুন্দর সব পাখিরা উড়ে যাচ্ছে ছাখো, আহা কি শীতের বাতাস, আমার শীত করছে অজু। তুমি আমাকে জড়িয়ে থাকো, না হলে শীতে আমি মরে যাব অজু। এমনভাবে ওরা ভিতরের সুন্দর সব ইচ্ছার কথা সরল সহজভাবে বলে যেতে পারত। এই যে আনন্দময় পৃথিবী, দুঃখ নেই, দুঃখ কি মঞ্জু জানত না, একবেলা ঘোড়ায় চড়তে না পারলে দুঃখ, আর তো কোন দুঃখ ছিল না, সুন্দর পৃথিবীতে বেঁচে থাকার কি নিদারুণ ইচ্ছা, সে অজুকে নিয়ে গাছপালার ভিতর কেবল ছুটতে ভালবাসত। এবং এ-ভাবে একদিন ঠিক সেও পেয়ে যেত, চন্দন গাছের নিচে আর একটি নীলুকে। তারপর নীলুরা যত বড় হয় তত গভীর চিন্তা, এবং সব সময় জীবন যাপনে উদ্‌বেগ। সে নীলুকে যদি নিষ্ঠুরতার ভিতর না পেত! আহা নীলু তোমাকে আমি কখনও ভালবাসিনি। আমি ক্ষমা চাইছি নীলু! ভালবাসলে কাঁদতে পারতাম। আমি কাঁদতে পর্যন্ত পারছি না।

ক্রমে সন্ধ্যা হয়ে এল। দুটো হ্যাজাক জ্বালিয়ে রাখা হয়েছে। আগুন নিভে আসার আগে জায়গাটা ফাঁকা হয়ে গেল। দু একজন সিঙপাড়ার মানুষ বাদে প্রায় সবাই চলে গেল। এখন আছে ওরা ক'জন। জল ঢালা হচ্ছে। বর্ষার জল, টল টল করছে। প্রত্যেকে জল ঢেলে ঘরে ফিরে আসার সময় পেছনে কেউ তাকাল না। নীলু এখন আকাশে বাতাসে রয়েছে। নীলুর আত্মা এখন এই সব গাছপালার ভিতর জড়িয়ে আছে। এত সহজে কেউ মায়া কাটাতে পারে না। মঞ্জুর কেমন ভীষণ ভয় ধরে গেল। সে একলা নড়তে পারছে না। সে বলল, অজু আমায় ভীষণ ভয় করছে।

—ভয় করছে কেন!

—জানি না। মনে হচ্ছে নীলু এখনও আমাদের মায়া কাটাতে পারেনি। এইসব গাছপালার ভিতর সে ঘুরে বেড়াবে দীর্ঘ দিন।

—যা, তুমি না এ-কালের মেয়ে!

—তবু এমন মনে হয় কেন অজু!

—এস।

মুর্শিদ বলল, বিশ্রামের দরকার। ওকে কেয়া কিছু করতে দেবে না আর। সিঙ বাড়ির বৌকে থেকে যেতে বল। সেই সব করুক।

—বা'জান বলেছেন থাকতে।

—ওকে স্নান করিয়ে দাও। সিঙবৌকে বল সব ঠিকঠাক করে দিতে।

অজু বলল, কি করে জানেন, এসব নিয়ম নীতি।

—আমিতো এ-দেশের মানুষ। আমার বন্ধুর বাবা মারা গেলে এমন দেখেছি। আপনি সব সময় আমাকে এত দূরের ভাবছেন কেন?

—দূরের ভাবছি, আপনারা আমাদের কিছুতেই বুঝতে চান না। সব সময় আমাদের দূরে সরিয়ে রাখতে চান। কাছে আসার সুযোগ দেন না।

—ভয়।

—কিসের ভয়?

—আমাদের যতটুকু আছে তাও আপনারা রাখতে দেবেন না।

—এমন ভাবেন কেন?

—ভাবব না। সেই প্রথম থেকেই আমাদেরও তো বিশ্বাস ছিল না এটা হতে পারে। এটাতো একটা আজগুবি খোয়াব আমরা ভাবতাম। আব্বাও এমন ভাবত। তাকেই বলতে শুনেছি নেতারা যে কি খোয়াব দেখছে।

—তিনি বলতেন।

—হ্যাঁ বলতেন। কিন্তু যখন হয়ে গেল, তখন তো শর্ষেফুল চোখে আমাদের। কারণ যখন হয়ে গেল, আমরা ভাবতে শিখলাম আমাদের চলে যাওয়া ছাড়া উপায় নেই। আমাদের যখন একটা ভিন্ন দেশ হয়েছে আমাদের আর থাকতে দেবেন কেন। আমরাই যখন হুকুম বরখাস্তের মালিক তখন আর এ-দেশে থাকে কে। পড়ি মরি করে আব্বা কোন দিকে না তাকিয়ে রাতারাতি ব্যবস্থা করে ফেললেন। তা-ছাড়া আব্বা, আরো ভাবলেন, আপনারা এর বদলা নেবেন। নামে যতই সেকুলার হোক সব ঝেঁটিয়ে বিদায় করবেন।

—এটা কি ঠিক। আমরা কি এটা করেছি!

মুর্শিদ একটু সময় চুপ করে থাকল। এমন একটা সময়ে সে হয়ত ভাবল, এ-সব কথা বলা ঠিক না। তবু অজুবাবুকে না বললে মনে মনে রুষ্ট হতে পারে। অজুবাবু তাকে নিয়ে যাবে। তার হাতে ওর প্রাণ। ওকে পার করে দেবে যে মানুষটা খোলাখুলি বললে, কিছু সে হয়ত ভাববে না। সে জানালা দিয়ে দেখল টেবিলের একপাশে কিছু বাসি গোলাপ। ফুলে জল না দিলে যা হয়। এ-ঘরে অজুবাবু থাকে। বেশ সুন্দর এখন ঘরটা, এত সুন্দর করে সাজিয়ে রেখেছে যে, ওর এখানে দু দণ্ড বসতে ইচ্ছা হল। সারাদিন কেউ কিছু খায়নি। অজুবাবু স্নান না করে ঘরে ঢুকবে না। সে বারান্দার মেঝেতে কাঁধে জামা নিয়ে বসে পড়েছে। চাঁদ উঠেছে বলে ওর মনে একটা অদ্ভুত বিষণ্ণতা, সে হয়তো তার বাবার কথা মনে করতে পারছে। কারণ যারাই দেশ ছেড়ে

অন্য জায়গায় আশ্রয়ের জন্য গিয়েছিল প্রত্যেকের একটা দুঃখ অথবা অভিমান আছে। যেমন অজুবাবুকে কিছু বললেই বোঝা যায় দেশ ছেড়ে যাবার সময় অজুবাবু ভীষণ স্বার্থপর ভেবেছিল মুর্শিদের মতো মানুষদের। সে জানালার পাশে দাঁড়িয়ে বলল, অজুবাবু যারা থেকে গেছে, তাদের যাবার ক্ষমতা ছিল না। ঝেঁটিয়ে বিদেয় করলেও ওরা যেত না। কোন না কোনভাবে ওরা জেনেছে, গেলে ওরা বাঁচবে না।

—তা হলে তুমি বলছ, যদি এমন একটা ব্যবস্থা হত, সবারই যাবার সুযোগ করে দেওয়া হবে, যা আছে তাই দেওয়া হবে, তবে সবাই তোমার দেশে চলে যেত!

—যেত না বলছেন! কেউ থাকত!

অজু সহজে জবাব দিতে পারল না।

মুর্শিদের বোধ হয় কথাটা শেষ হয়নি তখনও, তবেই ভাবুন কেন এটা হয়। কোথাও একটা বড় রকমের ফারাক রয়ে গেছে, যা আমরা মুছে দিতে পারিনি।

—এটা কি শুধু আমাদের দোষ বলছ!

—তাতো বলিনি অজুবাবু। আসলে মানুষ সেই দুনিয়ার প্রথম থেকেই দল নিয়ে বাঁচতে চায়। আমাদের দল বলতে, ধর্মকে বুঝি। পারস্য অথবা অন্য সব মুশ্লিম রাষ্ট্রে এমন সমস্যা নেই। আমাদের সমস্যা এখানে খুব গভীর। আমরা সংখ্যালঘু। এত বছর এ-দেশটা মুসলিম শাসনে থেকেও অধিকাংশ লোককে ধর্মান্তরিত করা গেল না। বুঝতেই পারছেন আপনাদের জোরটা কোথায়। তারপর আপনাদের হাতে রাজত্ব এলে আমরা বাঁচতে পারতাম!

অজু কখনও ওদের মন দিয়ে ওদেরকে চিনতে চায়নি। এখন মনে হয় কিছুটা এর ভিতর সত্য আছে। সে বলল, তবু কি তোমরা বিশ্বাস কর, এতদূর থেকে এসে ধর্মের নামে একটা দেশকে শাসন করা যায়?

—এটা আমরা কখনও ভাবিনি। আমরা ধর্মের নামে দেশ শাসন

করছি। আমরা জেনেছি, আমরা সংখ্যাগুরু জায়গায় রয়েছি। যখন দেশটা এ-ভাবে ভাগ হল, তখনই মনে হয়েছে, যেখানে অধিকাংশ মুসলমান, সেটা আমাদের। আমরা কাশ্মীরকেও এভাবে ভেবে থাকি। কাশ্মীর নিয়ে আমাদের দেশের ছোট ছেলেরা পর্যন্ত জেহাদ ঘোষণা করে থাকে। ওরা খোয়াব দেখে, ওরা ধর্মযুদ্ধে যাচ্ছে। বড় হলে ওদের কাছে ওটাই একমাত্র পবিত্র কর্ম।

অজু বলল, আমি কখনও তোমাকে, তুমি, কখনও আপনি বলছি, বলে ফেলছি। কিছু মনে করছ না তো। তুমি আমাকে এ-ভাবে ডাকতে পার।

সে বলল, না না; কি যে বলেন। তোবা তোবা।

অজু এবার বড় রকমের একটা পয়েন্ট তুলে বলল, মুর্শিদ তোমরা শুধু তোমাদের কথাই ভাবছ। কিন্তু যেখানেই তোমরা সংখ্যাগুরু সেখানকার সংখ্যালঘুদের কথা কিন্তু একেবারে ভাবছ না।

—তাদের তো আশেপাশে বড় একটা দেশ রয়ে গেছে। সেখানে তারা আশ্রয় পাবে।

—সবাই যেতে পারে।

—তা অবশ্য পারে না।

—মানুষ হিসাবে প্রত্যেকের জন্মগত অধিকার আছে তার গাছ-পালার ভিতর বড় হওয়ার।

—তা আছে।

—তুমি মঞ্জুর কথা ভাবোনি, আমার কথা ভাবোনি।

মুর্শিদ যেন কেমন সংকোচ বোধ করল জবাব দিতে। আর এমন দিনে হয়তো সত্যি এটা ওর মনে হয়, কোথায় যেন মনুষ্যত্বের দাবী থাকে না এতে। সে বলল, অজুবাবু চলুন গোসল করে আসি। এখন এসব কথা থাক।

মুর্শিদকে নিয়ে অজু গোসল করে এল। সে এখানে আসার সময় জামা কাপড় বেশিই এনেছে। গাঁয়ে, ধোপার কাচা কাপড়

সব সময় পাবে কিনা সে জানে না। যা ধুতি, পাজামা, পাঞ্জাবি ছিল, প্রায় সবই এনেছে সঙ্গে। সে স্নান করে এসে ওর ধুতি পাঞ্জাবি বের করে দিল। মুর্শিদকে সকালেও এক প্রস্ত দিয়েছিল। ওগুলো সিঙবৌ রেখে দিয়েছে আলাদা করে। ওরা দুজনই টেবিলের দু পাশে বসে থাকল চুপচাপ। কেয়া খাটে পড়ে আছে। অজু বলল, এস দেখি ওরা কি করছে।

ওরা দেখল, মঞ্জু কেয়ার পাশে বসে আছে। কেযার চোখে আশ্চর্য শূণ্যতা। ওরা এখন কিছু বলতে পারে না, এবং মঞ্জুর দিকে তাকিয়ে অজু বলল তুমি ওঠো। স্নান করে এস। তারপর কেয়ার পাশে বসে বলল, কি, এ-ভাবে শুয়ে থাকলে চলবে! আমরা খাব-দাব না।

যদিও কথাটা এ-সময় খুব স্বার্থপরের মতো তবু যেন অজু এমন না বলে পারল না। এখন এ বাড়িতে ওকে একটু স্বার্থপর হতেই হবে। না হলে এরা অন্যমনস্ক হবে না। একটা দৃশ্যই বার বার করে চোখের ওপর ওদের ভেসে উঠবে। মুর্শিদ কিছুটা সামলে উঠেছে। ওর মনে হয়েছিল, এ-ঘরে এলে সেও ভেঙ্গে পড়বে। মেয়েলি কান্না না কেঁদে ফেলে। ওর তখন ভারি অবিশ্বাস ঠেকে, আসলে মুর্শিদ কখনও রাইফেল কাঁধে নিয়ে মার্চ করেছে কিনা, অথবা বিবরঘাঁটিতে কখনও সে ম্যাশিনগানের ট্রিগার হাতে রেখে সারারাত জেগেছে কিনা! সে বলল, মুর্শিদ তোমার যুদ্ধক্ষেত্রে আসা উচিত হয়নি।

সে তাকাল। সে বুঝতে পারল না, অজুবাবু এমন কেন বলছে।

অজু বলল, তোমাকে কিছুতেই সৈনিক মনে হয় না।

—কেন?

—সাধারণ মানুষের মতো, সৈনিকেরা তো এমন সহৃদয় হয় না।

—বলছেন কি অজুবাবু! আপনি কি মনে করেন যারা যুদ্ধক্ষেত্রে যায় তারা আলাদা জাতের মানুষ।

—আলাদা জাতের না হলেও, আমাদের মতো তারা নয়।

সে কেমন চোখ ভারি ভারি করে তাকাল। বলল, ওদেরও আপনাদের মতো খিদে তেষ্টা আছে। যদি পারতাম মিনারকে দেখাতে, তবে বুঝতে পারতেন। আমি কিছুই দেখাতে পারছি না।

অজু বলল, নীলু নেই, আমি খুব কিছু বুঝতে পারছি না। নীলু নেই, তুমি অনেক বেশি বুঝতে পারছ। মিনারকে এনে না দেখালেও চলবে। তোমার দুঃখটা আমার বুঝতে কষ্ট হয় না। তারপর কেমন ছেলেমানুষের মতো আবেগের গলায় বলল, কেন যে তবু আমরা এক সঙ্গে সবাই মিলেমিশে থাকতে পারছি না।

তারপরই সে আশ্চর্য হয়ে যায় এমন একটা শোকের সময় এত কথা বলে যাচ্ছে কি করে! এখনতো সবার চুপচাপ থেকে এই শোক দিবস উদযাপন করা উচিত। আসলে কি সে টের পেয়েছে, চুপচাপ থাকলে কেমন চারপাশটা নিঝুম হয়ে যায়। এত বেশি নিঝুম যে জোনাকি পোকা উড়ে গেলে তার ডানার শব্দ যেন ভেসে আসে। সে চুপচাপ থাকলে টের পায় কোথাও কোন শব্দ হচ্ছে না। কেবল বনজঙ্গল থেকে কীট পতঙ্গের আওয়াজ ভেসে আসছে। এমন কি বর্ষার জলে মাছেরা শব্দ করলে সে ঘরে বসে তা টের পায়। এমন একটা ভয়াবহ নিস্তব্ধতা সে কেন যে সহ্য করতে পারে না। এবং রাতে সে পাশের ঘরে একা যে কি করে থাকে! ইচ্ছা হল বলে, মুর্শিদ তুমি আমার সঙ্গে থাকো। তুমি না থাকলে রাতে আমার ভীষণ ভয় করবে।

এবং এ-ভাবে গভীর রাতে মনে হল, এ বাড়ির কেউ ঘুমোয় নি। ওরও ঘুম আসছিল না। কে বারান্দার দিকের জানালা বন্ধ করে দিয়েছে! সামনের ডিসপেনসারিতে জব্বার কাকা আছেন! তিনি ঘুমিয়েছেন কিনা বুঝতে পারছে না সে। কেয়া বোধ হয় ঘুমোয়নি। কেয়ার ঘরে সিঙবৌ শুয়েছে। ওর ভয় না থাকার কথা। চারপাশের সব আলো জব্বার কাকা জ্বালিয়ে রেখেছেন।

তিনি টের পেয়েছেন, আলো নিভিয়ে দিলে ভয়টা এ-বাড়ির বাড়বে। ওর ভিতরে ভিতরে মঞ্জুর জন্য কষ্ট হচ্ছিল। সে শুয়ে শুয়ে বুঝতে পারল মঞ্জু অনেকদিন ঘুমোতে পারবে না। মঞ্জু এক বিন্দু চোখের জল ফেলেনি। এটা ওর কেমন যেন স্বাভাবিক মনে হয়নি। কিংবা মঞ্জু কি ভেবে রেখেছে, সে পর পর কি করবে। সে কি ভেবে ফেলেছে, এ-ভাবে বেঁচে থেকে লাভ নেই। সে কি রাতে কিছু একটা করে ফেলতে পারে।

শুয়ে শুয়ে ওর এ-ভাবে কেন যে মাথাটা গরম হয়ে যাচ্ছে। মঞ্জুর মার কথা মনে এলে সে বুঝতে পারে, এ-পরিবারে, কোন পারিবারিক অসুখ ওর মা রেখে যায় নি তো। মঞ্জু ওর মতো যদি একটা কিছু করে ফেলে। এবং এ-সব ভাবলে তার কেমন তেষ্টা পেয়ে যায়। সে উঠে দেখল, মঞ্জু কখন ঠিক নিঃশব্দে জল রেখে গেছে। কেয়া এবং মঞ্জুকে কিছুই খাওয়ানো যায়নি। মুশিদও খেতে পারেনি। সামান্য মুখে দিয়ে সেও উঠে গেছে। ওর খিদে ভীষণ ছিল, সে আগুনের কাছে থাকেনি। এবং ভয়াবহ দৃশ্য দেখলে যেহেতু সে ভীষণ কষ্ট পায়, সে মঞ্জুকে নিয়ে দূরে বসে রয়েছে। খেতে তার সামান্য খারাপ লাগলেও, পেট-ভরার মতো খেয়েছে। এ-ভাবে সে দেখেছে, এ-বাড়ির সব চেয়ে দূরের মানুষ হয়ে গেছে সে। কেয়া, মুশিদ, জব্বার কাকা মঞ্জুর যত কাছের, সে তার চেয়ে অনেক কম। মঞ্জু এটা বুঝতে পারলে ভীষণ কষ্ট পাবে।

তারপরই ঝট করে সে দরজা দিয়ে বের হয়ে গেল। সামনের ঘরটায় দরজা ভেজানো। এবং যেমন অন্ধকার থাকে, তেমনি। সে দেখল কেয়ার ঘরের দরজা বন্ধ। কেয়া ভয় পেতে পারে বলে সিঙনো হয়তো দরজা বন্ধ করে শুয়েছে। মঞ্জুর ঘরটা আর একটু এগিয়ে গেলে। অন্ধকার ঘরে সে কেমন কিছুক্ষণ ভূতের মতো দাঁড়িয়ে থাকল। এ-ভাবে কেন যে সে উঠে এসেছে। ওর কি মনে হয়েছিল? এবং সঙ্গে সঙ্গে সে যেন মনে করতে

পারছে, আসলে সে উঠে এসেছে, মঞ্জু যদি কিছু একটা করে ফেলে। ওর সেই একটি ভয় ভেতরে, মঞ্জু যেমন সব সহ্য করতে পারে, সহসা সে কিছু আবার না জানিয়ে কিছু করেও ফেলতে পারে। কি দেখবে সে জানে না। মঞ্জুর ঘরে আলো নেই। দরজা পর্যন্ত খোলা। সে ঘর অন্ধকার করে শুয়ে আছে। একবার ভাবল, ডাকবে, মঞ্জু তুমি ঠিক আছতো! কিন্তু গলা ওর কাঠ। সে কেন যে ডাকতে পারছে না। সে কি যে ভাবছে ভিতরে ভিতরে! গোপনে এ-ভাবে মঞ্জুকে ডাকলে, সেই বা কি ভাববে। সে ভাবল ফিরে যাবে।

কিন্তু দরজার সামনে এসে আবার মনে হল, এ ভাবে ঘর অন্ধকার করে তো ওর শুয়ে থাকার কথা না। অন্তত সে অল্প আলো জ্বালিয়ে রাখতে পারত। যেমন জানালার ফাঁক দিয়ে কেয়ার ঘরে দেখা যাচ্ছে একটা ডিম আলো জ্বলছে। সে বুঝতে পারল, তার পা ঠিক চলছে না। কেমন চোরের মতো সে এই অন্ধকার ঘরে ঘোরাফেরা করছে, মঞ্জুকে ডাকতে পারছে না। বার বার দরজা থেকে ফিরে আসছে। এবং যেন অন্ধকারে হাত বাড়ালে দুটো পা ওর হাতে লাগবে। এ সব ভাবলে গা আরও ভীষণ শির শির করতে থাকল। সে বুঝি এখন চেঁচিয়ে উঠবে, ডাকবে সবাইকে, কেয়া, সিঙলৌ তাড়াতাড়ি ওঠো, মঞ্জু নিশ্চয় কিছু একটা করে ফেলেছে।

তখনই অন্ধকারে মঞ্জুব গলা পাওয়া গেল, কেমন দূরাগত ধ্বনির মতো, সে যেন অনেক দূর থেকে বলছে, অজু কিছু বলবে!

অজু বলল, আমি তোমাকে দেখতে পাচ্ছি না মঞ্জু।

—আমি তোমাকে দেখতে পাচ্ছি অজু!

যে বুঝতে পারল, এ ঘরে ওর ঘরের সামান্য আলো। কেয়ার জানালার আলো যে সামান্য অস্পষ্টতা রেখেছে, মঞ্জুর অন্ধকার ঘর থেকে তা স্পষ্ট না হলেও ছায়া ছায়া। আর এর ভিতর কোন

দীর্ঘ ছায়া ঘুরে বেড়ালে, যে অজু হবে, অন্য কেউ হবে না, মঞ্জুর বুঝতে এতটুকু অসুবিধা হয়নি। সে বলল, তুমি কোথায় ?

—আমি বসে আছি।

—আলো জ্বালাব ?

—তোমার মাথার কাছে ডানদিকে দ্যাখো।

সে ডানদিকে হাত বাড়িয়ে সুইচ ঠিক পেয়ে গেল। আলো জ্বাললে দেখল, সোফাতে মঞ্জু মাথা এলিয়ে বসে রয়েছে। চোখ বুজে আছে মঞ্জু। সে বুঝতে পারছে না সহসা আলো জ্বালায় এমন চোখ বুজে আছে, না আগেই সে, চোখ বুজে বসেছিল। সে সামনে দাঁড়িয়ে আছে। ওকে মঞ্জু পাশের সোফাতে বসতে বলতে পারত, কিন্তু কিছু বলছে না। এ-ঘরে অজু এ ভাবে দাঁড়িয়ে আছে, মঞ্জু যেন ভুলে গেছে। সে পাশে বসে ডাকল, মঞ্জু

-- বল। মঞ্জু চোখ খুলছে না।

— এ-ভাবে ভেঙ্গে পড়লে চলবে কেন। শুয়ে পড়

—তুমিতো এখনও ঘুমোও নি।

—শুয়েছিলাম। ঘুম এল না।

—তুমি ঘুমোতে পারছ না, আমাকে কি করে ঘুমোতে বলছ ·

অজু সত্যি আর কি জবাবে বলবে বুঝতে পারছে না। মঞ্জুর গলায় তেমনি সরু হার, হাতে চুড়ি, সে তেমনি সাদা রঙের শাড়ি পরেছে। পাড়টা হলুদ রঙের। জমিন সাদা মনে হলেও ঠিক সাদা নয় কেমন সবুজ রঙ শাড়ীতে রয়েছে যা সহজে ধরা যায় না। মঞ্জুর মুখ এত বেশী পবিত্রতায় ভরা যে সে বসে থাকতে পর্যন্ত সাহস পাচ্ছে না। বসে থাকলে সে একটা কিছু করে ফেলতে পারে। সে নিজের ওপর বিশ্বাস রাখতে পারছে না।

মঞ্জু বলল, ডিম আলোটা জ্বেলে দাও। চোখে বড় লাগছে।

—আমি উঠছি মঞ্জু। আলো নিভিয়ে দিচ্ছি। তুমি প্লিজ শোও। ঘুমোবার চেষ্টা কর।

—তুমি গিয়ে কি করবে ?

—ঘুমোবার চেষ্টা করব।

—ঘুম আসবে না। অনর্থক চেষ্টা করবে।

—তবু দেখা দরকার।

—তার চেয়ে আমার পাশে একটু বসো। তুমি পাশে বসে থাকলে আমার ভাল লাগবে।

অজু ডিম আলোটা জ্বালল না। সে আলো নিভিয়ে দিল। বলল, এখন কোন কথা শুনব না। তুমি না ঘুমালে কাল সকালে ঠিক চলে যাব।

কেমন বালিকার মতো মঞ্জুর অনুরোধ তুমি আমাকে এ ভাবে অন্ধকারে রেখে যেও না অজু। আমি তবে মরে যাব।

অজু বলল—কিন্তু ওর কেমন তোতলামিতে পেয়ে বসল। এবং ভিতরে ভীষণ শীত। এই অন্ধকারে দাঁড়িয়ে সে এমন শীতে কাঁপছে কেন। কপালের দু পাশের দুটো রগ দপদপ করে ফুটছে। সারা শরীরে জ্বরের মতো। সে আর কথা বলতে পারছে না।

মঞ্জু বলল, অজু পাশে বসো। প্লিজ।

অজু আলো জ্বালতে ভুলে গেল। অন্তত ডিম আলোটা জ্বেলে রাখা দরকার। এ ভাবে অন্ধকারে সে বসে থাকতে পারবে না। সে ত মঞ্জুর মতো তবে ভয়ে মরে যাবে, সে কি করবে এখন বুঝতে পারছে না, যেন সেই এক বিবর ঘাঁটিতে সে বসে রয়েছে, এবং মৃত্যুর মুখোমুখি, শেষ সময়, আর সে পৃথিবীতে মুহূর্ত মাত্র, তার সব শেষ হয়ে যাচ্ছে, সে পাগলের মতো দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ছটফট করতে থাকল।

তখন মঞ্জু বলছে, অজু তুমি আবার আমাকে আমাদের শৈশবে নিয়ে যাও। আমার সব কিছু সবাই জোরজার করে কেড়ে নিয়েছে, আমি কখনও অজু কারো কিছু কেড়ে নিতে পারিনি। আমার শৈশব আমার ভিতর তেমনি এখনও ঘুমিয়ে আছে।

অজু চুপচাপ বসে থাকল পাশে। ঘরে অন্ধকার। বাইরের সামান্য আলো ঘরে আসছে। মঞ্জু চোখ বুজেই কথা বলছে।

অস্পষ্ট ছায়ায় বোঝা যাচ্ছে, মঞ্জু চোখ আর খুলবে না। সে চুপচাপ। কথা বললেই সে মঞ্জুর কাছে ধরা পড়ে যাবে।

মঞ্জু বলল, অজু তুমি কথা বলছ না কেন ?

অজু বলল, আমি কথা বলতে পারছি না মঞ্জু। তুমি আমাকে আর কতো টর্চার করবে।

—অজু! কি বলছ! বলে কেমন নুয়ে পড়ল, যেন ওর গলায় কান্না এসে আটকে গেছে। ভীষণ অস্বস্তিতে মঞ্জু ছটফট করছে। অজু তাড়াতাড়ি ওর পাশে হাঁটু গেড়ে বসল। মাথার হাত দিয়ে বলল, লক্ষ্মী এভাবে ভেঙ্গে পড়ো না।

মঞ্জু কেমন তখন অজুকে, এবং অজু তখন কেমন মঞ্জুকে জড়িয়ে ধরে আশ্চর্য এক সুষমাব জগতে ক্রমে চলে যেতে যেতে ওরা দেখল, একটা সাদা ঘোড়া আর তার ওপর সেই স্বপ্নবৎ দুজন মানুষ, এবং শৈশবের খেলা। সব কিছু মিলে দুজনে পৃথিবীর সব চেয়ে পবিত্রতম অহঙ্কারের ভিতর ডুবে গেল। ফোটা পদ্মের গভীরে ফোঁটা ফোঁটা শিশিরেব মতো ওরা ক্রমে হারিয়ে গেল। নিজেরাও টের পেল না ওরা কি করে ফেলেছে। সবশেষে যখন অজু টের পেল, সে এটা কি করে ফেলেছে, সে উঠে দাঁড়িযে অনুশোচনায়, মঞ্জুর দিকে সে তাকাতে পারছে না। মঞ্জু কেমন উপুড় হয়ে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে। এবং সে বুঝতে পারছে এ-কান্না শৈশব থেকে মঞ্জু ভেতরে লুকিয়ে রেখেছে। সে আলো জ্বেলে ওর শিয়রে বসল। মাথায় হাত বুলিয়ে দিল ঠিক সন্তানের মতো, এবং তখনই বালিকার মতো কান্নায় ভেঙ্গে পড়ল মঞ্জু। সবাই ছুটে এল। কেয়া মুর্শিদ জব্বার কাকা। মঞ্জু বালিশে মুখ গুঁজে কাঁদছে। হাউ হাউ করে বালিকার মতো কেবল কাঁদছে। অজু ওর পাশে বসে। সবাইকে সে কিছু বলতে বারণ করছে। ওকে কাঁদতে দেওয়া হোক। ও এখন কাঁদুক, এমন সবাইকে বলছে যেন ইশারায়।

আসলে একান্না মঞ্জু সেই কবে থেকে পাষাণের মতো চেপে রেখেছিল। চারপাশে এত বেশি নিষ্ঠুরতার ভিতরও কোথায়

যেন এক অপার মায়া থেকে যায়, জীবন কিছুতেই ফুরোয় না। সে আপন প্রবাহে নিত্য বয়ে চলে। নানাভাবে আবার জীবনে ঐশ্বর্য ফিরে এলে দুঃখের দিনগুলোর কথা মনে থাকে না। আজ কতদিন পর কতকাল পর সেই যে ঐশ্বর্যের ভিতর মঞ্জু শৈশবে, হেঁটে বেড়াতো, সব তার যেন ফিরে এসেছে। মঞ্জু জানে সে দুঃখী মেয়ে। এত দুঃখের পর এ ঐশ্বর্য কতক্ষণ জীবনে সে জানে না অথবা বুঝি ভিতরে থেকে যায় এক আকুলতা। সব দুঃখ, সব নিষ্ঠুরতার নালিশ অজুর আদরের ভিতর অভিমান হয়ে ফুটে উঠছে। সে আজ কিছুতেই নিজেকে সামলাতে পারছে না। সে শুধু আজ কাঁদছে।